অগ্নিদিনের কথা



সতীশ পাকড়াশী

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ

এপ্রিল—১৯৪৭

দাম আড়াই টাকা

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক সুরেন দত্ত,
১২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। গণশক্তি প্রেসের পক্ষে
মুদ্রাকর কালীপদ চৌধুরী, ৮-ই, ডেকার্স লেন, কলিকাতা-১

১৯০৫-৬ সালের কথা। বাঙলা দেশে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তুমুল হয়ে উঠেছে সে-আন্দোলন। ঢাকা জেলার একটি গ্রাম্য হাই স্কুলের ছাত্রদের প্রাণেও তার ঢেউ-এর দোলা এসে লেগেছে। ১২-১৩ বছরের একটি ছোট্ট ছেলেও তাতে মেতে উঠেছে। সে বড়দের ফাইফরমাস খাটে, ভলান্‌টিয়ারি ক'রে বেড়ায়। এর বেশী কী-ই বা আর সে করতে পারে?

প্রকাশ্য আন্দোলনের দ্বারা বৃটিশ সরকারকে নোয়াতে না পারার ফলে যুবকদের প্রাণে যে-হতাশা এলো তা কাটিয়ে ওঠার জন্যে কলকাতায় গঠিত হলো গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান—অনুশীলন সমিতি। এবারে শুধু বঙ্গভঙ্গের রদ তারা চায় না, ভারতের স্বাধীনতাও কাম্য। তেমন কোনো প্রোগ্রামও তাদের নেই, জনগণের সঙ্গেও নেই কোনো যোগাযোগ, তবুও ভদ্রঘরের ছেলেরা প্রতিজ্ঞা নিয়েছে—তারা মারবে ও মরবে।

ঢাকাতেও অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হলো। আমাদের সেই ১২-১৩ বছরের ছেলেটিও যোগ দিল এই সমিতিতে। তারপরে, তাঁর বয়স কিছু বাড়ল, কাজের ভিতর দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন অনুশীলন সমিতির নেতাদের একজন। বাঙলার রাজনীতিক ক্ষেত্রে আজ তিনি —আমাদের শ্রদ্ধেয় কমরেড সতীশ পাকড়াশী—সুপরিচিত। ১৯০৫-৬ সালে তিনি কাজে নেমেছিলেন, আর আজ হচ্ছে ১৯৪৭ সাল। এই সুদীর্ঘ সময়ের ভিতরে একদিনের জন্যেও তিনি নিজের বৈপ্লবিক কর্মক্ষেত্র থেকে স'রে দাঁড়াননি। রিভলভার নিয়ে ধরা প'ড়ে তিনি জেল খেটেছেন সেই যুগে যে-যুগে কয়েদীদের গলায় লোহার হাঁসুলি, আর পায়ে লোহার মল পরতে হ'ত।

বছরের পর বছর তাঁকে গা-ঢাকা দিয়ে কাজ করতে হয়েছে, ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে নজরবন্দী হয়েও তাঁকে কাটাতে হয়েছে কয়েক বছর। ছাড়া পাওয়ার পরে আবার নজরবন্দী হয়েছেন,

মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় সাজা নিয়ে গিয়েছেন আন্দামানে, আবারও হয়েছেন নজরবন্দী। এইভাবে তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে রাজ-লাঞ্ছনার ঝড়ের পর ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু কোনো কিছুই দমাতে পারেনি তাঁকে, অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি তাঁর জন্যে নির্দ্দিষ্ট করা জায়গায়। তাঁকে দেখলে কিংবা তাঁর সাধারণ কথাবার্ত্তা থেকে নূতন পরিচিতেরা বুঝতেই পারেন না যে, চল্লিশ বছরেরও বেশী কাল ধ'রে তিনি বৈপ্লবিক কর্ম্ম-সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত ক'রে রেখেছেন। সাদাসিদে অল্পভাষী লোক তিনি।

"অগ্নিদিনের কথা" কমরেড সতীশ পাকড়াশীর "স্মৃতি-কথা"। অনাড়ম্বর ভাষায় তিনি তাঁর সন্ত্রাসবাদী জীবনের কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। স্মৃতি মানুষকে অনেক সময়ে প্রতারণা ক'রে থাকে। সেই দিক থেকে কোনো কোনো ঘটনার বিবৃতিতে সামান্য কিছু ভুল থাকা অসম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও এই পুস্তকখানা কেবলমাত্র কমরেড পাকড়াশীর স্মৃতি কথাই নয়, এখানা আমাদের দেশের রাজনীতিক সংগ্রামের একটি যুগের একটা দিকের ইতিহাসও বটে। সন্ত্রাসবাদী বাঙলার অনেক খ্যাতনামা বিপ্লবী কর্ম্মীদের মতো কমরেড সতীশ পাকড়াশীও কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছেন। বার্দ্ধক্যের সীমায় পৌছেও তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্ম্মঠ সভ্য। দীর্ঘ জীবনের রাজনীতিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তিনি বুঝেছেন যে, জনগণকে বাদ দিয়ে বিপ্লব হয় না এবং কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের একমাত্র বিপ্লবী পার্টি।

অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়েও কি ক'রে কাজে লেগে থাকতে হয় তা আমরা কমরেড পাকড়াশীর জীবন থেকে শিখতে পারি। এইজন্যেও রাজনীতিক কর্ম্মীদের এই পুস্তকখানা পড়া উচিত।

কলিকাতা
৩রা এপ্রিল, ১৯৪৭

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

সূচী

ভূমিকা

ঊষার রঙীন আলোর মতই একদিন বাঙলার বুকে জ্বলে ওঠে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম রক্তশিখা। শতাধিক বৎসরের পুঞ্জীভূত অত্যাচারের কঠোর আবরণ বিদীর্ণ ক'রে গর্জ্জে উঠেছিল বাঙালীর হাতের বোমা ও পিস্তল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ তখন বাঙালী যুবকের বীরপনার গর্ব্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। সারা ভারতবর্ষ বিস্ময়ে চেয়ে দেখে, 'ভীরু' বাঙালীর এই জীবন-অভিযান। কত যুবক স্বাধীনতা সংগ্রামের রোমাঞ্চে ও উদ্দীপনায় মরণের নেশায় মেতে ওঠে—কত যুবক সে-অনলে আত্মাহুতি দেয়; ফাঁসীতে, গুলিতে প্রাণ দেয়—দ্বীপান্তরে অন্ধকার কারাকক্ষের অসহনীয় নির্য্যাতনে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে; নিজেদের ত্যাগ, সাহস ও ঐকান্তিকতা দিয়েই দেশজননীর বন্ধন মোচন করবে এমনই ছিল তাদের দুর্জ্জয় সঙ্কল্প। যারা সে-দিন সাম্রাজ্যবাদী দানবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে নির্ব্বিচারে জীবন বিলিয়ে দিতে চেয়েছিল—যারা মৃত্যুর গর্জ্জন শুনেছিল সঙ্গীতের মত, তাদেরই সাথের সাথী হওয়ার জন্য আমিও কিশোর বয়সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। মরণ-অভিযানে বেরিয়েও মৃত্যুকে পাইনি। পথ চলতে চলতে পেয়েছি বিপ্লবের এক নূতন পরিচয়—জীবনের এক নূতন সাধনা—ক্রম-বিকাশমান মানবতার এক অভিনব সুন্দর পরিকল্পনা।

স্বাদেশিকতার রঙীন আলোকে যে-স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম, সংগ্রাম-পথের সাধনায় কতকাল পরে সে-স্বাধীনতার স্পষ্ট সংজ্ঞা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গণ-বিপ্লব ও 'কমিউনিজ্‌ম্‌' -এর মহান উচ্চ আদর্শ আমাদের বিপ্লব প্রেরণাকে সুস্পষ্ট, জীবন্ত এবং বাস্তব সত্য করে তুলেছে। নব গণতন্ত্রের নূতন লক্ষ্যে গণ-মানবের মুক্তি-সংগ্রামের 'দিন আগত ঐ'—অতীতে এমনটি হয়নি। কোটি কোটি দুর্গত জন-সমষ্টিকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত করার অপূর্ব্ব পরিকল্পনা পূর্ব্বে আমাদের চিন্তায় আসেনি। মরণ পথের ব্যর্থতা এনে দিয়েছে জীবন পথের নূতন সার্থকতা—বিপ্লবের নূতন রূপ—নূতনতর সংগ্রাম পদ্ধতি ;—মরণের উচ্চতর প্রেরণা।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে বার বার দগ্ধ হয়েছি—অজ্ঞাতবাস, কারাবাস ও দ্বীপান্তর বাসের দীর্ঘ যাতনা সয়েছি কিন্তু মরিনি। সাথীরা কেউ কেউ শত্রুর গুলিতে মরেছে—ফাঁসীতে মরেছে, কেউ বা জেলের নির্য্যাতনে মরেছে, আমি বেঁচে আছি। বেঁচে আছি বলেই অতীত জীবনের স্মৃতি এখানে একত্রে সমাবেশ করতে পারলাম। যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করে এসে আমার এ-তুচ্ছ জীবন-কাহিনী ভাবী ঐতিহাসিকের কিছুটা কাজে লাগতে পারে। অন্ধকার যুগে দুঃখের নিশীথে যারা জীবনের আলো জ্বালিয়ে জনগণের মুক্তি-পথের সন্ধান দিয়েছিল—যারা আত্ম-জীবন উৎসর্গ করে ভারতের জাতীয় জীবনের উষর ক্ষেত্রে নূতন আশার বারি সিঞ্চন করেছিল, যাদের কথা সবাই ভুলতে বসেছে, এই ছোট বইতে তাদেরই কথা আছে। তাদেরই জীবনাহুতিতে গড়া অতীত অগ্নিদিনের বিপ্লব সংগ্রামের কিছুটা আভাস দিতে চেষ্টা করেছি এখানে।

পঁয়ত্রিশ-ছ'ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে-বিপ্লবের সঙ্কল্প ও প্রেরণা নিয়ে কর্ম্মজীবনের আরম্ভ, আজো সে-সঙ্কল্প ও প্রেরণা তেমনি বলবৎ আছে কিন্তু বিপ্লবের লক্ষ্য ও নীতি-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে এর মধ্যে। ধন-ঐশ্বর্য্যলোভী প্রভুত্বকামী মধ্যবিত্তের বিপ্লব থেকে এবার দুর্গত শোষিত সর্ব্বহারা জন-সমষ্টির বিপ্লব পথের সন্ধান পেয়েছি। তাই পৃথিবীর সকল দেশের বিপ্লবী জনসমষ্টির সহযোগে আমরাও এগিয়ে যাব নব-গণতন্ত্রের মহান উচ্চতর বিপ্লবী সংগ্রাম সাধনায়।

টেরোরিজ্‌ম্ থেকে কমিউনিজ্‌ম্ বিংশ শতাব্দীর নূতন অবদান—ইতিহাসের স্বাভাবিক যুক্তিসঙ্গত পরিণতি; রুশিয়ায় তা ঘটেছে—চীনে তা ঘটেছে—ভারতেও তারই সুশৃঙ্খল দ্রুত পুনরাবর্ত্তন। এ অপরিহার্য্য—এ অবশ্যম্ভাবী। সঙ্কীর্ণ স্তর হতে উন্নত স্তরে বিপ্লবের যুক্তিসঙ্গত স্বাভাবিক গতি ও পরিণতি লাভই আমার জীবনের অভিজ্ঞতা, এই বইতে তা সংক্ষেপে বলতে চেষ্টা করেছি।

এ-বই লেখার জন্য যারা আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন তাঁদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না। তাঁরা হচ্ছেন কমরেড পি. সি. জোশী, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, নিখিল চক্রবর্ত্তী, নিরঞ্জন সেন, সাধনা বসু (রায় চৌধুরী).। চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা শিপ্রা সরকার আমার বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ করে আমাকে বিস্মিত ও কৃতজ্ঞ করে রেখেছে।

—লেখক

স্বদেশী আন্দোলনের দিনে

তখন বাঙলায় স্বদেশী আন্দোলনের বিপুল আলোড়ন চলেছে। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে চারিদিকে প্রতিরোধ-আন্দোলনের প্রবল উদ্দীপনা। আমি পাড়াগেঁয়ে স্কুলের ছাত্র। বয়স খুব কম। মনে পড়ে, সেখানেও জোয়ার চলেছে সভা-সমিতি, বক্তৃতা ও শোভাযাত্রার। জাতীয় আন্দোলনের বিপুল উচ্ছ্বাসের মাঝে খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে গেলাম। শোভাযাত্রায়, গান ও জাতীয় ধ্বনি করতে করতে মিটিং-এ যাওয়া, ভলান্টিয়ার হওয়া, দোকানে দোকানে বিলাতী লবণ বিক্রীর বিরুদ্ধে পিকেটিং করা, রাখী বন্ধন ইত্যাদিতে খুব স্ফূর্তি পেতে লাগলাম। মেলায় জলসত্র খুলে লোকজনকে জল পান করানো, ব্রহ্মপুত্র-স্নানে যাত্রীদের সাহায্য, রোগীর সেবা, মৃতের সৎকার—দলবদ্ধ হয়ে এ-সকল কাজে বেশ আনন্দ ছিল। নিয়মিত পড়াশুনা হয় না, রাত্রিতে বাড়ী ফিরতে দেরী হয়ে যায় বলে অভিভাবক তিরস্কার করেন; বলেন—"পড়াশোনা নাই, স্বদেশীতে পেট ভরবে?" চুপ করে সহ্য করি—এবং,

তারপরেও বাড়ী ফিবতে রাত্রি হয়, ভয়ে ভয়ে বাড়ী ঢুকি। অভিভাবক আমার সামনেই আলোচনা করেন—"স্কুলের ছেলেগুলির সাহসের প্রশংসা করতে হয়, পুলিসেব ধমকে একটুও ঘাবড়ায় না। প্রশেসান তো না করে ছাড়লোই না। সতীশও ছিল এই ছাত্রদলের শোভাযাত্রায়। পুলিসের সামনে সে-ই উঁচু গলায় বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিতে লাগল, পুলিসগুলো তাব দিকে কটমটিয়ে চাইল কিন্তু কিছু করলো না।" শুনে আমার বুক গর্ব্বে ফুলে উঠল।

একদিন আমাদের স্কুলেই এক সভার আয়োজন হ'ল। ভদ্রলোকের সভা। আমবা নেতাদের নির্দ্দেশ মতো রাস্তা থেকে কৃষকদের ডেকে এনে টুল পেতে বসালাম। তাদের হাতে কাস্তে, পবনে নেংটি। বেশ মনে পড়ছে তাদেব একটা অসোয়াস্তি বোধ করা ভাব। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য এইসব মুসলমান কৃষকদেব সভায় ডেকে এনে আদর করে বসানো হয়েছিল। ভলাণ্টিয়ার দলভুক্ত হ'য়ে 'চিনিসপুর' কালীবাড়ীতে সভায় গেলাম। শত শত লোক একসঙ্গে সভায় দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম—বঙ্গ-ভঙ্গ রদ না হওয়া অবধি আমরা প্রতিরোধ-আন্দোলন করে যাব, জীবন দিয়েও এর প্রতিবিধান করব। বিলাতী জিনিস বয়কট আর স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের প্রতিজ্ঞাও নেওয়া হ'ল। জমিদার, তালুকদার উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র সকলেই এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। আমিও ছাত্রদের সঙ্গে আনন্দে ওই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলাম। সে ১৯০৫-০৬ সালের কথা। বিশিষ্ট যুবক কর্ম্মীরা ঢাকা শহর থেকে এসে জানালেন, পুলিনবাবুব সঙ্গে কলক্যাতা থেকে পি, মিত্র এসেছেন। পি, মিত্র ব্যারিস্টার—স্বদেশী আন্দোলনে যুবকদের প্রধান নেতা। পি, মিত্র বলেন—"বিলাতী লবণ বা চিনির পিকেটিং করে কি হবে? তা দিয়ে স্বাধীনতা হবে? রাষ্ট্রবিপ্লব হবে? লাঠি খেলা, বন্দুক.

তরোয়াল চালানো শেখ, সমিতি গঠন কর।" শুনে মনটা উত্তেজিত হয়ে উঠল। গ্রামে "অনুশীলন সমিতি" গঠিত হয়েছিল। লাঠি খেলা, ড্রিল, কুচকাওয়াজ ইত্যাদিতে স্কুলের ছাত্ররা মেতে উঠেছিল। আমিও অনুশীলন সমিতির 'সাটির পাড়া' শাখায় যোগ দিলাম। ছাত্র-নেতারা এক নিভৃত কক্ষে আমাকে নিয়ে গিয়ে সমিতির 'আন্ত প্রতিজ্ঞা' পড়ালেন, আমি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে সমিতির সভ্য হলাম। ''সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধি—স্বাধীনতা না হওয়া পর্য্যন্ত এই সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না। সর্ব্বদা সমিতির পরিচালকের আদেশ মানিয়া চলিব",—ইত্যাদি বহু দফা প্রতিজ্ঞা ওই পত্রে আছে। আমাদের স্কুলের প্রায় অর্দ্ধেক ছাত্র অনুশীলন সমিতির সভ্য হয়ে গেল। আমি তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। স্কুলের উপরের শ্রেণীর ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ও অন্য দু'তিনজন ছাত্র সমিতির নেতা। নেতাদের আমি শ্রদ্ধা করতাম খুবই এবং তাঁদের নির্দ্দেশ আনন্দে পালনও করতাম। মন্ত্রগুপ্তির দিকে এই সময় আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—সমিতির গোপন কথা কারও কাছে প্রকাশ করা যায় না। শত্রুর চর আছে সর্ব্বত্র সুতরাং কথাবার্ত্তায় সংযত হতে হবে। এই শিক্ষা পেলাম। লাঠি খেলার সাঙ্কেতিক 'ফরমুলা' (সঙ্কেত শব্দ) অতি সংগোপনে ছোট্ট নোট বই-এ লিখে রাখতাম এবং স্কুলের ছুটির ঘণ্টায় সেগুলো মুখস্ত করতাম। অন্যান্য ছাত্র সভ্যগণও তাই করত। আমরা জানতাম লাঠিটা আসলে লাঠি নয়—তরোয়াল; আর বড় লাঠি হ'লো বেয়নেট, বন্দুক। তরোয়াল ও বন্দুকের লড়াই শেখার উদ্দেশ্যেই আইন বজায় রেখে লাঠি খেলার প্রবর্ত্তন করা। কিন্তু তা কারুর কাছে প্রকাশ করা নিষেধ ছিল। জঙ্গলাকীর্ণ আম-কাঁঠাল ও বাঁশবনের মাঝখানে ছিল আমাদের লাঠি খেলা ও কুচকাওয়াজের ফাঁকা জায়গা। প্রতি সন্ধ্যায় আমরা ওখানে গিয়ে জমায়েত হতাম। মনে হত, আমরা যেন আনন্দমঠের সন্তানদল;

পরাধীন ভারত-জননীর শৃঙ্খলমোচন কল্পে স্বাধীনতার সংগ্রাম সাধনায় রত। কলকাতায় নবযুগের অগ্নিময়ী বাণী নিয়ে এলো "যুগান্তর" পত্রিকা। আমাদের স্কুলেও ছাত্র-নেতারা সপ্তাহে সপ্তাহে "যুগান্তর" বিক্রী করত লোকের মনে কর্ম্মোদ্দীপনা জাগানোর জন্য। আমি মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেক সংখ্যাটি পড়ে ফাইল করে রাখতাম। ওইগুলিতে লেখা হ'ত মহাভারতের যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়-যুদ্ধ করার উপদেশ, কর্ম্মযোগের কথা, চণ্ডীর সুর-অসুর যুদ্ধের কথা, শিখ-রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়দের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কথা এবং মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবন কথা। গৌরবমণ্ডিত ভারতের বর্ত্তমান দাসত্বের সঙ্গে উক্ত বিষয় সমূহের এমন উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় তুলনা করা হ'ত যে, আমাদের সকল চিত্ত-মন মথিত হয়ে উঠত সংগ্রামের উদ্দীপনায়, রোমাণ্টিক কল্পনার আবেগে। "যুগান্তর" পত্রিকা পড়া, লাঠিখেলা ও কুচকাওয়াজ শিক্ষা, ভলাণ্টিয়ার সেজে শোভাযাত্রা করে সভায় যাওয়া এইগুলি ছিল আমাদের ছাত্রদের কাজ। এইসব কাজে আমি খুব উৎসাহ পেতাম। যেখানে দু-চারজন একত্রে বসে স্বদেশী বিষয়ে আলোচনা করত আমি আগ্রহভরে সেখানে বসে কথাবার্ত্তা শুনতাম। বাড়ীর অভিভাবক, গ্রামের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা এবং স্কুলের শিক্ষকগণ কেউই স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। কিন্তু তবু আমরা বেশী করে মেতে উঠি এটা আবার কেউ-ই পছন্দ করতেন না। তার জন্যে আমাকে বাবার কাছ থেকে এবং অন্যান্য গুরুজনদের কাছ থেকেও অনেক গালাগালি শুনতে হত। ১৯০৭ সালের শেষভাগে গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট 'এলেন সাহেব'-কে গুলি করার সংবাদ এল। গ্রামের যুবকগণ এই সংবাদে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। আমার মনেও আত্ম-বিশ্বাস এবং উদ্দীপনা সঞ্চারিত হল। শত শত,

যাত্রীর ভীড়ের মধ্যে এমন দুঃসাহসিক কাজ ক'রে যে-যুবকগণ নির্ব্বিঘ্নে সরে পড়ল—কে তারা? কি তাদের শক্তি!

রুশ-জাপান যুদ্ধে পাশ্চাত্য সম্রাট জারের পরাজয় এবং প্রাচ্য জাপানের বিজয়ে বাঙালীরা গর্ব্ব বোধ করেছিল। জাপানীদের ত্যাগ, সাহস, বীরপনা ও স্বদেশ হিতৈষণার অনেক চমকপ্রদ গল্প আমাদের স্বদেশী-সংগ্রামের ইন্ধন জুগিয়েছিল। এ যুদ্ধের কাহিনী পড়ে ও শুনে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার উৎসাহ আমাদের বেড়ে যায়। বিদেশ জাপান থেকে যেমন বিদ্রোহের উদ্দীপনা আসে, স্বদেশের মহারাষ্ট্র থেকেও তেমনি নবজীবনের প্রেরণা আসে। শিবাজীর স্বদেশের লোক বলে মহারাষ্ট্রীয়দের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম; মহারাষ্ট্রীয় নেতা তিলক সদলবলে কলকাতায় শিবাজী উৎসবে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ তেজোদীপ্ত উদ্দীপনাময় ভাষায় 'শিবাজী' কবিতা লিখে যুবক হৃদয়ে আনন্দ ও অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিলেন। শিবাজীর মাওলীসেনা, গেরিলা যুদ্ধ, প্রবল শক্তিমান ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ—এ-সবই আমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ায়ের উপাদানরূপে তখন আবার নূতন করে পেলাম। এর পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রীয় যুবকগণ গুপ্ত-সমিতি গঠন করে ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী হত্যা করেছে ও ফাঁসীতে জীবন দিয়েছে। মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙলার বিপ্লবী মৈত্রী-বন্ধন স্থাপিত হয় স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকে। রুশিয়ার সন্ত্রাসবাদী নিহিলিস্ট আন্দোলন অনুসরণ করার পরামর্শ আসে জাপানী প্রফেসার ওকাকুরার কাছ থেকে; লণ্ডনের ভারতীয়েরাও খবর পাঠাত, ইংরেজের কাছ থেকে কিছু পেতে চাইলে ঐ পন্থাই গ্রহণ কর। গোপনে গোপনে সর্ব্বত্র যুবকদের কাছে এ-সকল কথা পৌঁছে যেত।

প্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

১৯০৮ সালে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে ভাটা পড়ল। নরম ও গরম দলের বিরোধে সুরাট কংগ্রেস ভেঙে গেছে। মজঃফরপুর জজ সাহেবের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপের পর ক্ষুদিরাম ধরা পড়েছে, প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ার সময়েই রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেছে। আবার, যে-পুলিস কর্ম্মচারী তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই ইন্‌স্পেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় 'গুপ্ত ঘাতকে'র গুলিতে নিহত হ'ল। কলকাতা মানিকতলার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের বাগান বাড়ীতে বোমার কারখানা একদিন ধরা পড়ল। সেখানে বোমা ও বোমা তৈয়ারীর সরঞ্জামসহ অরবিন্দের ভাই বারীন ঘোষ, উপেন, উল্লাসকর, হেমচন্দ্র প্রভৃতি যুবকগণ গ্রেপ্তার হল। মফঃস্বলে অতিরঞ্জিত হয়ে সে-খবর এসে ছাত্র ও তরুণ মনে বীরপনার রোমান্স জাগিয়ে দিল। আমারও উৎসাহ আর ধরে না।

যুবক ক্ষুদিরামের ফাঁসি হল সর্ব্বপ্রথম। তারপর আলীপুর বোমার মামলায় রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করে কানাইলাল ও সত্যেন ফাঁসী যায়। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের প্রতি যথাযোগ্য শাস্তি-বিধানের সৎসাহস দেখিয়ে কানাই ও সত্যেন সে-সময় দেশের সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও

প্রশংসা লাভ করেছিল। তাদের এই অপূর্ব্ব সাহস ও বীরপনা আমাদের তরুণ চিত্তে দাগ কেটেছিল গভীর ক'রে। দেশের জন্য এমন আত্মত্যাগ মরণ-ভীতু জাতিকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'ল সরকারী নিষ্পেষণ—ধরপাকড়, খানাতল্লাস, কারাদণ্ড, ফাঁসী। অনুশীলন সমিতি ও অন্যান্য যুবক-সমিতিগুলি বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পর স্বদেশী আন্দোলনের হিড়িক দমে গেল সরকারী রুদ্রনীতির পেষণে।

সরকারী নিষ্পেষণে, নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে আন্দোলন একেবারে নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল। প্রকাশ্য আন্দোলন দমে গেল, কিন্তু গুপ্ত-সমিতির কার্য্য-কলাপ এক নূতন আন্দোলন ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। আমি স্কুলের এক বন্ধুর কাছ থেকে "যুগান্তর" নামে একটি ক্ষুদ্র ইংরেজী পুস্তিকা পেয়েছিলাম। তাতে লেখা আছে—"শ্বেত জাতির হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জ্জনেব সঙ্কল্প আমরা ছাড়ব না—টাকার ভাবনা নেই; পোস্ট-অফিস, ব্যাঙ্ক ও ট্রেজারী লুট করে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাবে। টাকা হলেই পিস্তল-রিভলভাব পাওয়া যাবে, বোমাও তৈরী করা যায়। যুবকগণ! দেশমায়েব পূজায় আত্মবলি দিতে বদ্ধপরিকর হও।" অতি গোপনে পুস্তিকাটি পড়ে লুকিয়ে রাখলাম। সে-দিন অপূর্ব্ব এক আনন্দে, উচ্ছ্বাসে, রোমান্সে মন ভরপুর হয়ে রইল।

হলে কি হয়, কাজের কোনই সুবিধা হচ্ছে না; স্কুলের যুবক-নেতারা কেউ ফেরার, কেউ বা জেলে। এদিকে গুপ্ত-সমিতির সঙ্গে কোনো সংযোগই করতে পারছি না। 'স্বাধীনতা' শীর্ষক একটি পুস্তিকার শহরে-বন্দরে গোপনে গোপনে বিতরণ হয়, আমিও মাঝে মাঝে একটি দুটি পেয়ে যাই, কিন্তু দলের সন্ধান পাই না—ব্যাকুলতা বাড়ে বই কমে না। 'স্বাধীনতা' পুস্তিকায় লেখা থাকে—"স্বাধীনতা-কামী

বীর যুবকগণ, আমাদের সন্ধান করে নেও।” কিন্তু কে জানে কোথায় থাকে তারা! কেবল খবরের কাগজে দেখি, পিস্তল-রিভলভারের সন্ধানে খানাতল্লাস, গ্রেপ্তার আর ষড়যন্ত্রের মামলা।

পত্রিকা পড়তাম খুব মনোযোগ সহকারে। স্বদেশ-প্রীতি থেকেই স্বদেশী খবর জানবার আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল, তাই নিয়মিত কাগজ পড়তাম। স্কুলের হেডমাস্টারের ইংরেজী দৈনিক ‘বন্দেমাতরং’ মাঝে মাঝে লুকিয়ে এনে পড়ে আবার রেখে আসতাম। গ্রামে দৈনিক কাগজ পাওয়া যেত না। স্বদেশী-ডাকাতি, গুলি, পুলিস ও বিশ্বাস-ঘাতকদের হত্যা, রাজনীতিক-ষড়যন্ত্র মামলা—এই সব সংবাদ পড়ে খুব উৎসাহ পেতাম। তাই খবরের কাগজের দিকে ঝোঁক পড়েছিল বেশী। জাতীয় আন্দোলনের অন্য কোনো খবর তখন ছিল না। প্রত্যক্ষ কাজকর্ম্মের সুযোগ না পেয়ে স্বদেশী সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানলাভের জন্য পড়াশোনায় মন দিলাম। সখারামের দেশের কথা, রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয় ও শিখ জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস, ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির কথা, বিবেকানন্দের বই, রবি ঠাকুরের কবিতা ও সাহিত্য—এই সব ধরনের বই দিয়ে লাইব্রেরী করা হল সাটিরপাড়া গ্রামে। বিবেকানন্দের বইগুলি তখন আমাদের কাছে ছিল খুবই আদৃত। জাতীয় ধর্ম্ম, সভ্যতা ও কৃষ্টিকে বাদ দিয়ে জাতির স্বাধীনতা নয়। এমন ধারণা তখন থেকেই মনে গড়ে উঠেছে। অতীত ভারতের গৌরবে আমরা নিজেদের গর্ব্বিত মনে করতাম। ভারতকে সেই অতীত গৌরবের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল সেদিন আমাদের কামনা। বিবেকানন্দের বই পড়ে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে উঠি। কিন্তু পশ্চিমের যন্ত্রপাতি ও শিল্পোৎপাদন প্রণালী স্বাধীন ভারতে আমাদের অনুকরণীয় বলে আমরা বিশ্বাস করতাম। কিন্তু রাষ্ট্র,

সমাজ, শিল্প-বাণিজ্য সব কিছুই ধর্ম্মের ভিত্তিতে স্থাপিত হবে—ধর্ম্ম ছাড়া আমাদের এদেশে কিছু হতে পারে না, মনে-প্রাণে তাই স্বীকার করে নিয়েছিলাম। পৌরাণিক সুরাসুর যুদ্ধ ও মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ থেকে সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা পেতাম।

স্কুলে, গ্রামে এবং বাড়ীতে সর্ব্বত্রই দেশের আর্থিক দুরবস্থার কথা নিয়ে আলোচনা হত। 'ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা'—এমনি পরাধীনতার দুর্গতির কথা মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে ঘরে। আমি তাই শুনেই ছাত্র-জীবনে বেড়ে উঠেছিলাম। তাঁতীদের আঙুল কেটে বিলাতী কোম্পানী দেশের তাঁত-শিল্প ধ্বংস করে দিয়েছে, কত জমিদার-তালুকদার নিঃস্ব হয়ে গেছে। দাদা ও দিদিমাদের খেদোক্তি শুনতাম—'কি দিন ছিল আর কি হল।' সুখ-ঐশ্বর্য্য, প্রচুর খাদ্য, স্বাস্থ্য যা ছিল সমস্তই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পরাধীনতার এই গ্লানি প্রথম জীবনে আমাকে স্বাধীনতার অভিযানে ইন্ধন জুগিয়েছিল।

১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ব অবধি জাতীয় আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। মিণ্টো-মর্লে রিফর্ম বা শাসন সংস্কার ও বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করার ফলে নরম দলের নেতারা খুশি হয়ে যান। একমাত্র যুবকদের গুপ্ত-সমিতিগুলি তখন দেশে যুবকসংগঠন চালিয়ে যাচ্ছে—তাদেরই অনুষ্ঠিত মাঝে মাঝে দু-একটি বড় হত্যাকাণ্ডের ফলে আমাদের গতানুগতিক জীবনে আশা ও বিশ্বাসের জোয়ার আসত। বস্তুত, এই দলের কর্ম্মীরাই দৃঢ় বিশ্বাসের বলে ভবিষ্যতের ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রছিল। তা'ছাড়া চারদিকে দেশের রাজনীতিক ভবিষ্যতের কল্পনা ম্লান হয়ে পড়েছিল এবং বর্ত্তমান ছিল আরও অবসাদ ও নিক্রিয়তায় আচ্ছন্ন। বিপ্লবীরা গোপনে ছাত্র ও যুবকদের মনে স্বাধীনতার কর্ম্ম-প্রেরণা জোগাত—সন্ত্রাসবাদী দুটি-একটি কাজের দ্বারা দেশের লোকের

মনে স্বাধীনতার উদ্দীপনা জোগাত—যুবক-চিত্তে সৃষ্টি করত উত্তেজনা। কলিকাতা হাইকোর্টে রিভলভারধারী বাঙালী যুবক পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সামসুল আলম ও সরকারী উকিল আশু বিশ্বাসকে হত্যা করে। তারা ছিল অতিরিক্ত রকমের খয়ের খাঁ এবং স্বদেশীওয়ালাদের উপর ক'রত অসম্ভব রকমের অন্যায় উৎপীড়ন। দু'জন বিপ্লবী বীরেন ও চারু হাসিমুখে ফাঁসী বরণ ক'রে জাতীয় জীবনের ভাটার মুখে দেশবাসীর মনে নূতন প্রেরণা ও নূতন আশার জোয়ার এনে দিল। মৃত্যুর বিনিময়ে তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল বাঙালীর জীবন। হাফ প্যাণ্ট, হাফ শার্ট পরা যুবকের দল বন্দুক-রিভলভার নিয়ে স্বদেশী ডাকাতি করত। সকলে জানতো—ডাকাতিতে টাকা সংগ্রহ ক'রে তা দিয়ে অস্ত্রসংগ্রহ করে, বোমা বানায় এবং বিপ্লবীদল চালায়। ধনীরা খেতাবের আশায় সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে সাহায্য করত। সরকারী কর্ম্মচারীদের ভেট দিত। জমিদাররা বিলাসে অর্থব্যয় করত। দেশের কাজে টাকা দেয় কে? স্বদেশী-ডাকাতি, পুলিস ও বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা, বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা বিতরণ, সর্ব্বোপরি গুপ্ত-সমিতি গঠন—এই সবই ছিল সে-দিনের জাতীয়-আন্দোলন। জনসাধারণ এ সবের সাফল্য দেখলে উৎফুল্ল হত—মনে মনে অনেকখানি আশা করত। কংগ্রেস তখন মডারেট নেতাদের বাৎসরিক অধিবেশন মাত্রে পরিণত হয়েছে—পূর্ব্বেও তাই ছিল। মাঝখানে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে কংগ্রেস একটা ব্যাপক জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র।

বিপ্লবী-সন্ত্রাসবাদের যাত্রাপথে

ক্রমাগত চেষ্টার ফলে ১৯১০ সালে ঢাকার গোপনদলের সংস্রবে আসতে পারলাম। পূর্ব্ব পরিচিতেরাই দেখাশুনা করে আমার মনোভাবের পরিচয় পেলেন। একজন নেতা ঢাকা গিয়ে রিপোর্ট দিয়েছিলেন: "ঐ অঞ্চলের সবাই হতাশ ও নিরুদ্যম হয়ে পড়েছে, সতীশ কিন্তু ঠিক আছে। তার উৎসাহ-আকাঙ্ক্ষা একটুও দমেনি, তাকে বিশ্বাস করে কাজে নেওয়া যেতে পারে।" মাঝে মাঝে আমার কাছে ফেরারী বিপ্লবীরা আসতেন—একটু-আধটু কাজের ভারও দিতেন। আমি সোৎসাহে তা পালন করতাম।

১৯১১ সালের মধ্যভাগে নির্দ্দেশ এলো এক গুরুতর কাজের। দলের নেতা নরেন সেন স্বয়ং নির্দ্দেশ দিলেন এবং আমিও সোৎসাহে তাঁর আদেশ গ্রহণ ক'রলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে, কোনো এক স্থানে তিনটি ·৪৫০ রিভলভার ও কতকগুলি কার্ত্তুজ আছে, সেখান থেকে সেগুলি আনতে হবে। সেগুলি আনতে গিয়ে আমি ধরা পড়লাম। হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিস আমাকে নারায়ণগঞ্জ জেলে পাঠিয়ে দিল। এই প্রথম জেল-যাত্রা। জেলে দেখলাম, কথায় কথায় কিল, লাঠির আঘাত, ইতর-ভদ্র সকলেরই এক অবস্থা। আমাকেও মিছেমিছি কয়েকটি বেতের ঘা খেতে হয়েছিল। একজন পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর আমাকে বুঝালেন

'আপনি বিশিষ্ট ভদ্র-পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আপনার একাজ শোভা পায় না। বলুন, কে আপনাকে রিভলভার আনতে পাঠিয়েছিল—তা হ'লেই আপনাকে ছেড়ে দেবো।' চুপ করে রইলাম। পুলিস অফিসার বলে চললেন, 'তিন তিনটা রিভলভার আর এতগুলি বুলেট পাওয়া যে কি সাংঘাতিক বুঝেনই—চাই কি আপনার ১০।১৫ বছর জেল হয়ে যেতে পারে।' বললাম—আমি কিছুই জানি না। এর পরে তিনি খুব শাসিয়ে চলে গেলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই ঢাকা এডিশনাল ম্যাজিস্টে্টের বিচারে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ হ'ল।

ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে প্রবেশ করলাম—সে এক সাক্ষাৎ যমালয়। জেলার টুলী সাহেব স্বয়ং যম। মনে আমার ভয়, কৌতূহল ও বিস্ময়। এ হচ্ছে ১৯১১ সালের কথা। জেলে তখন রাজবন্দীর কোনই মর্য্যাদা ছিল না। কয়েদীরা বুঝ্‌তই না রাজনীতিক অপরাধটা কি রকম অপরাধ। কর্ত্তৃপক্ষের জুলুম, অত্যাচার, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, তার উপর কঠোর খাটুনি তো ছিলই। জাঙিয়া, কুর্ত্তা পরে, গলায় হাঁসুলী ও কাঠের তকৃতি ঝুলিয়ে খাঁটি কয়েদী সাজলাম। জেল প্রেসে কাজ করতে দিয়েছিল, তার জন্য এক পায়ে একটি মোটা লোহার মল পরতে হ'ল। প্রতিদিন গলার হাঁসুলী, এক হাতের বালা ও এক পায়ের মল—এই লোহার অলঙ্কারগুলি মাটি দিয়ে ঘষে চকচকে করে রাখতে হ'ত—নইলে শাস্তি। লোহার থালা বাটি প্রতদিন খাওয়ার পর সকলে এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে পায়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হত। কয়েদী জীবনের এমনি অদ্ভুত ব্যবস্থাই ছিল তখনকার রেওয়াজ। প্রতিদিনই একজন দু'জনের ভাগ্যে বেত্রদণ্ড দাগা ছিল। লাথি, কিল, ঘুষি যে কত হ'ত তার সীমা পরিসীমা ছিল না। পশুর চেয়েও অধম হয়েছিল এখানকার মানুষের জীবন।

প্রথম কারাগারে গিয়ে কয়েক দিন আমাকে উঠান, ঘর ঝাড়ু দেওয়ার কাজ দেওয়া হয়—তারপরে জল তোলা, রাস্তা বাঁধা, দু'মণে বস্তা টানার কাজ—সবই চোর, বদমাস, খুনী, ডাকাতদের সঙ্গে মিশে করতে হয়েছিল। কষ্ট হলেও আমি হাসিমুখে ওদের সঙ্গে মিশে কাজ ক'রে যেতাম। তখন আমার বয়স মাত্র সতেরো বছর। ছোট ছেলে ব'লে কেউ কেউ স্নেহ করত—কাজে একটু আধটু সাহায্যও করত। কিন্তু সেপাইরা দেখলে আর রক্ষা নেই, যে সাহায্য নেয় এবং যে দেয় উভয়কেই খেতে হবে মার। রবিবার দিন ছুটি বটে কিন্তু আসলে খাটুনী আরো বেশী। কাপড় কাচা—ঘর পরিষ্কার করা, বস্তা টানা, গাঁইতি দিয়ে রাস্তার খোয়া উঠানো ইত্যাদি কাজে সারাদিন খাটতে হয়। মনে পড়ে, গরমের দিনের দুপুরের রোদে গাঁইতি ও শাবল নিয়ে জেলের ভেতরকার রাস্তাগুলির খোয়া ভেঙেছি। সেপাই প্রখর দৃষ্টি রাখতো—কাজ করছি কিনা।

প্রেসে সাধারণ কাজ পেয়েছিলাম। সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে হাজার হাজার কাগজে 'নাম্বারিং মেসিন' দিয়ে নম্বর মারতে হ'ত। , তাতে অনেক ঝঞ্ঝাট ছিল। তারপর কেরানীর কাজে বদলী করল; তাতে দায়িত্ব অনেক বেশী, কথায় কথায় কৈফিয়ৎ তলব করে। একদিন একেবারে বিনাদোষে শুধু কথার ওপর কথা কয়ে জবাব দিয়েছিলাম বলে চার রাত্রি হাতকড়ি ও চারদিন ফ্যান খাওয়ার শাস্তি-বিধান হ'ল। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা তখন ঢাকা জেলে ছিলেন, অনুশীলন সমিতির বিখ্যাত নেতা পুলিন দাসও সেই মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সেই জেলে ছিলেন। পুলিনবাবু সুকৌশলে একদিন কয়েক মিনিটের জন্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন এবং নানান উপদেশে আমাকে উৎসাহিত ক'রে গেলেন। এত বড় বিপ্লবী নেতার

সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি মনে মনে খুব গর্ব্ব বোধ করেছিলাম। তারপর ক্রমে ঐ ষড়যন্ত্র মামলার অনেকে আমার সঙ্গে চুপি চুপি দেখা করেছিলেন। একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, ‘আর কেন? এবার গিয়ে পড়াশুনায় মন দাও। এ-সব আন্দোলন করে আর কিছু হবে না।’ কথা শুনে সে-দিন আমি একেবারে দমে গিয়েছিলাম। রাত জেগে কেবল ভেবেছি, হায়! আমাদের সব আশা-ভরসাই কি বৃথা হবে? পরে আমি বুঝেছিলাম, ওই মামলার ৩০।৩২ জন বন্দীর মধ্যে অধিকাংশই মনমরা হয়ে পড়েছে। ওদের মধ্যে দলাদলিও শুরু হয়েছিল। সুদিনের বন্ধুরা দুর্দ্দিনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করত। পুলিনবাবুর লিখিত চিঠিপত্র, পার্টির নীতি-পদ্ধতি সংবলিত প্রবন্ধাদি আমি প্রেসের একজন কর্ম্মচারীর মারফত বাইরে পাঠিয়ে দিতাম। এ-কাজে আমার বেশ আনন্দ হত। আবার নিজের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সময় বুক দুড়দুড় করত। ধরা পড়লে আর রক্ষা নাই। ধোলাই (মার), বেত্রদণ্ড ও কারাদণ্ড সবই ভোগ করতে হত।

জেলে আমার বসন্ত হ'ল, গোটা উঠা মাত্র আমাকে জেলের প্রাঙ্গণে একটা বাগানের মধ্যে ক্যাম্পে শিকলে বেঁধে রাখে। একটা শক্ত খুঁটির চারদিকে অন্যান্য ন'জন চোর-ডাকাতের সঙ্গে আমাকেও এক পায়ে পাঁচ সের ওজনের মোটা লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হ'ল। জেল সেপাইরা দয়া করে দুটো কম্বলও দিয়েছিল বটে। কিন্তু ১০৩।৪ ডিগ্রী জ্বর—সর্ব্বাঙ্গে বসন্তের গোটা, এ-অবস্থায় জেলের কয়েদীদের খসখসে কম্বল যে কি পীড়াদায়ক, তা আজও ভুলিনি। তরুণ বয়সের একটি ভদ্র সন্তানের কাছে দুর্দ্দান্ত কয়েদীর এমনি ধারা সঙ্গ সে-দিন মনোকষ্টের কারণ হয়েছিল বৈ কি।

ডিসেম্বর মাসে অতি গোপনে খবর পাওয়া গেল যে, বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হয়ে গেছে আর সেই রাজকীয় ঘোষণার দিনেই বরিশালে পুলিস ইনস্পেক্টার মনোমোহন ঘোষকে গুলি ক'রে হত্যা করা হয়েছে। রাজনীতিক দলের দলন-কার্য্যে এই পুলিস কর্ম্মচারীটি ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। জেল-জীবনের সমস্ত গ্লানি কেটে গেল এই একটি মাত্র গুপ্ত-হত্যার খবরে। প্রেস কর্ম্মচারীরাও খুশি হয়েছিল। পুলিনবাবু বলেছিলেন, সৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত আন্দোলন কখনো মরে না। সত্যিই কি আমাদের আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠবে! কারা জীবনের দুঃসহ দুঃখের মধ্যেও একটা পরিপূর্ণ প্রীতির উৎস জেগেছিল মনে। বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হওয়ার সংবাদ আমাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। বৃটিশ শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিরাট সংকল্পের কাছে এ-সাফল্যটুকু আমলই দিইনি। কংগ্রেসী-নেতারা একে বিরাট জয় মনে করে ব্রিটিশ ন্যায়-পরায়ণতার তারিফ করেছিলেন।

সারাদিনের খাটুনির পর প্রতিদিন প্রেস থেকে ফিরে আসি। নিত্যকার সেই কাঁকর ভরা মোটা চাল, ডালের জল, আর ঘাস মিশানো তরকারী খেয়ে সার বেঁধে শুতে যাই ঘরে। সেপাই জোড়ায় জোড়ায় আমাদের সংখ্যা গুণে বেলা ৫টায় তালা বন্ধ করে আমাদের আটকে দিয়ে যায়। প্রতি মুহূর্ত্তের গ্লানি ভরা সন্ত্রস্ত জীবন নিয়ে কাটিয়ে দিলাম দীর্ঘ একটা বছর। সতেরো বৎসরের এক তরুণ বন্দীর পক্ষে প্রতিকূলতায় ঘেরা নিঃসঙ্গ-জীবনে একটা বৎসর দীর্ঘই বটে। কি বিষাদ-মাখা আনন্দেই না দিনগুলি কেটে ছিল। সাধারণ চোর-বদমাসের চেয়ে স্বদেশী কয়েদীর এখানে এক কাণাকড়িও মূল্য বেশী ছিল না। অপমান-লাঞ্ছনা নিরন্তর লেগেই ছিল: দুর্দ্দান্ত বদমাস কয়েদীদের মধ্যে আমি

ছিলাম একা স্বদেশী বন্দী। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ী গেলাম। গ্রামবাসীরা আমাকে একটা সাংঘাতিক রকমের ছেলে মনে করেছিল। কেউ কেউ বললেন, ছেলেটি বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির হলে কি হয়, ভেতরে ভেতরে বড় দুর্দ্দান্ত। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বললেন, গুপ্ত-সমিতির ছেলেরা এমনিই হয়; তারা যেমন শান্ত, সরল, পরোপকারী তেমনি আবার দুর্দ্ধর্ষ, নিজেদের লক্ষ্য পথে অটল অচল।

জেল খেটে এসে আমার স্বদেশ-প্রীতি যেন আরো বেড়ে গেল। পার্টির লোকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে গুপ্ত-সমিতির কাজে বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার সংকল্পই গ্রহণ করলাম। ১৯১২ সালের শীতকালে কারুকে কিছু না জানিয়ে ঢাকা চলে গেলাম।

মাদারীপুর মহকুমায় আমাকে কাজ করার জন্যে পাঠান হয়; পালং-এর অন্তর্গত ভড্ডা গ্রামে মধ্য ইংরেজী স্কুলের শিক্ষকতা করার কাজে ব্রতী হ'লাম। নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করেই আমাকে এখানে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। শিক্ষক রূপে ঐ অঞ্চলের সর্ব্বত্র ঘুরে দল গঠন করাই ছিল আমার কাজ। যুবকদের দেশের অবস্থা বুঝিয়ে সংগঠিত করা, নানাবিধ জনহিতকর কাজে লাগানো এবং সচ্চরিত্র সাহসী ছেলেদের সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপে আকৃষ্ট করাই তখনকার কর্ত্তব্য ছিল। প্রায় সর্ব্বত্রই মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর ছেলেরা দলের সংস্রবে আসতে লাগলো। প্রতিটি স্কুলে একটি ক'রে ছোট গ্রুপ সংগঠিত হ'ল। স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপনা জাগায় এমন সব বই সেখানে পড়া হ'ত—লাইব্রেরী, ক্লাব, ব্যায়ামের আখড়া করে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করত। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে ত্যাগ, পরোপকার ও স্বদেশ হিতৈষিতা ব্রতে দীক্ষা নিয়ে কাজ করার সংকল্প যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে তুলত। ধর্ম্ম ও রাজনীতি তখন অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

দল গঠনের আনুষঙ্গিক বিদ্রোহ ভাবোদ্দীপক মুদ্রিত পুস্তিকা স্কুলে ছাত্রাবাসে এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ স্থানে গোপনে ছড়ান হত। এই পুস্তিকাগুলি শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি করত। ভড্‌ডা গ্রাম থেকে বিপ্লবী সংগঠনের কাজে নানাস্থানে যেতে হত। ঢাকা কেন্দ্রের নির্দ্দেশে একবার একটা বিশেষ কাজে শালদ'-তে যাতায়াত করতে হয়। সে-সময় শালদ' গ্রামে একজন কুখ্যাত সি-আই-ডি পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসেন ; তার প্রতি পিস্তলের গুলি নিক্ষেপ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয় ; আমরা ফিরে আসি।

মাদারীপুর শহরে অন্য একটি দলও কাজ করত ; অনুশীলন সমিতির সঙ্গে এ দলের কোনো সংস্রব ছিল না ; বরং পরস্পরে রেষারেষি ছিল। ১৯১২ সালে ঢাকা ও পূর্ব্ব বঙ্গের বিপ্লবী-দলের ১৪।১৫টি পুলিস হত্যা, ডাঁকাতি ইত্যাদির কাজ সংঘটিত হয়। কয়েক স্থানে অস্ত্রাদিও ধরা পড়ে।

১৯১৩ সালের প্রথম ভাগে ঢাকার পার্টি-কেন্দ্রে আসি। এর কিছুদিন পূর্ব্বে ডিসেম্বর মাসে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের ভারতের নূতন রাজধানী দিল্লী প্রবেশকালে তাঁর উপর বোমা ছোঁড়া হয়। পুলিস তখন বাঙলার প্রত্যেকটি রাজনীতিক সন্দিগ্ধ ব্যক্তির খোঁজ খবর নিতে লাগলো। আমার নিজ বাড়ীতে, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে পুলিস আমার সম্বন্ধেও নানা প্রশ্ন করে সকলকে উত্যক্ত ক'রছিল। কেউ উত্তর দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখান হ'ত। পুলিসের জুলুম বেশী ছিল, পুলিসের ভীতিও ছিল বেশি। বাড়ী থেকে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর আমাকে খুঁজে বার করার জন্য পুলিস যেন উঠে পড়ে লেগে গেল। তখন আরো অনেক ছেলে আত্ম-গোপন ক'রে কাজ করত।

পুলিসের খোঁজাখুঁজি বেড়ে গিয়েছিল ব'লে আমাকে স্থানান্তরে

পাঠাবার বন্দোবস্ত হয়। তখন ঢাকায় ফেরারী বিপ্লবী কর্ম্মীদের এক ভাড়া করা বাসায় ছিলাম। ছিলাম সাত আট জন। চাল কম ছিল ব'লে প্রত্যেকেই কিছু কম কম ক'রে খেতাম। রান্না-বান্না, থালা-বাটি ধোয়া নিজেদেরই কাজ। পার্টির অবস্থা শোচনীয়; ঘর-বাড়ী ছাড়া কর্ম্মী ও গৃহস্থ কর্ম্মী মিলে সারা বাঙলায় একশ' জনের বেশী নাই। সমস্ত দেশ যেন অসাড়, রাজনীতিক চেতনা-লেশহীন। এমন সময়ে এক দুর্ঘটনা পার্টি-কর্ম্মীদের মনে আরো নৈরাশ্য এনে দিল। মৌলভী বাজারের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে হত্যা করতে গিয়ে হত্যাকারী যুবক নিজেই মারা যায়। চুপি চুপি তারের বেড়া ডিঙোবার সময় হাত থেকে বোমাটি পড়ে যাওয়াতে বোমা-নিক্ষেপকারী 'যোগেন্দ্র'র মাথা ও দেহ টুকরা টুকরা হয়ে যায়। দুটি গুলিভরা রিভলবার সহ তার খণ্ডিত দেহ পড়ে থাকে। খবর এলে একজন বলে উঠলেন, আমাদের এ-কর্ম্মপন্থা বুঝি ভগবানের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু এ দুরবস্থা অতিক্রম করে বিপ্লবীরা আবার উঠে দাঁড়াল এবং ক্রমে শক্তিশালী দল গঠন করে তুললো। দুর্দ্দান্ত বৃটিশসিংহ এ-দলের গতিরোধ করতে পারেনি। ক্ষুদ্র চারা গাছটিই অনুকুল অবস্থায় প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়। বাঙলার বিপ্লবী যুবকগণ অতি সামান্য অতি তুচ্ছ অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে উঠে দাঁড়িয়েছে। এমন এক সময় গেছে যখন শুধু বাইরের লোকই নয়, দলের কর্ম্মীরাও কেউ কেউ বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে টিকে থাকতে পারবে কিনা তা সন্দেহ করত।

ঢাকা থেকে নাটোরে যাই; রংপুর জেলায় ভিতরবন্দ থানায় কিছুদিন থাকতে হ'য়েছিল। পূর্ব্ব বঙ্গে বিপ্লবী যুবকদের যে-সংগঠন, যে-কর্ম্মোদ্দীপনা ও সাধারণ রাজনীতিক চেতনা দেখেছিলাম উত্তর বঙ্গে গিয়ে তার তেমন পরিচয় পাওয়া গেল না। অনুশীলন দলের নেতা শ্রদ্ধেয় 'মহারাজে'র (ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী) চিঠি পেয়ে কুড়িগ্রাম থেকে কলকাতা রওনা হলাম। ১৯১৩

সালের নভেম্বর মাসে একদিন অতি প্রত্যুষে কলকাতায় রাজাবাজারে একটি বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলাম। গেটে ঢুকতেই সশস্ত্র পুলিস আমাকে চ্যালেঞ্জ ক'রল। আমি দৌড় দিলাম—দু-তিনজন পুলিস আমার পেছনে ধাওয়া করল, আমি এক ছোট্ট গলিতে ঢুকে সরে পড়ি। অন্য এক বাসায় গিয়ে এ-খবর ব'ললাম। এক বন্ধু সংবাদ নিতে এসে রাস্তায় ভিড়ের মাঝখান থেকে শুনে এল যে, এ-বাড়ীতে বোমা পিস্তল সহ একদল যুবক ধরা পড়েছে। পুলিস এখানে বোমার কারখানার সন্ধান পেয়েছে। এদের নিয়েই রাজা-বাজার বোমার মামলা তৈরী হয়; এ-মামলায় ষড়যন্ত্রের সহায়করূপে অভিযুক্ত করার জন্য পুলিস আমার নামে ওয়ারেণ্ট বার করেছিল এবং জুনাইডাঙায় (রংপুর জেলা) আমার বাসস্থান খানাতল্লাশ ক'রে 'স্বাধীনতা' শীর্ষক রাজদ্রোহাত্মক পুস্তিকাখানি নিয়ে আসে। আমি তখন পুলিসের নাগালের বাইরে।

এই বৎসর কয়েকটি ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কলেজ স্কোয়ার পুকুরের সিঁড়িতে বসে একটি টিকটিকি (ডিটেক্‌টিভ) পুলিস সন্দিগ্ধ লোকদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। সবে মাত্র তখন সন্ধ্যা—চারদিক আলোকমালায় সজ্জিত। অসংখ্য লোক এই সময়টায় পুকুরের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। অকস্মাৎ পিস্তলের আওয়াজ হল, দেখা গেল গুপ্তচরের দেহ ধূলায় লুণ্ঠিত। রিভলভার হাতে বুক ফুলিয়ে হত্যাকারী যুবক বের হয়ে গেল। সান্ধ্যভ্রমণকারীরাও নীরবে সরে পড়ল। শুধু বিশ্বাস-ঘাতকের দেহটি মাটিতে পড়ে রইল। পরদিন সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ শহরে ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিম চৌধুরীকে বোমা ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। রানীগঞ্জ, ভদ্রেশ্বর ও মেদিনীপুরেও বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা এই ধরনের কাজের খুব তারিফ করত এবং তিন চার মাস এ-ধরনের কিছু খবর না পেলে হতাশ হয়ে পড়ত। সন্ত্রাসবাদী কাজে দেশের ছাত্র

ও যুবকগণ উৎসাহিত হত এবং এই ধরনের কাজের ভিতর দিয়েই স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হবে এই এরা মনে করত। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে, বিপ্লবী যুবকেরা কর্ম্মী, ত্যাগী, সাহসী ও প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষী; সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় ভিত্তি গুঁড়িয়ে দেওয়ার মত সাহস ও মনোবল একমাত্র এদেরই আছে

আমরা কয়েকজন কলকাতা বরাহনগরে বাসা ভাড়া করে থাকতাম; কলকাতার বাইরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান বলে ওখানে বাসা নেওয়া হয়। অনুশীলন সমিতির কেন্দ্র ঢাকায়—কলকাতায় তার প্রধান শাখা। এখানে বহু ছাত্র ও যুবক এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিস্ফোরক পদার্থ (Explosives) সংগ্রহ, পিস্তল-রিভলভার সংগ্রহ ও মেরামত, প্রেসে বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা ছাপানো, উত্তরভারতের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা কলকাতা থেকেই হয়। বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কর্ম্মীদের সঙ্গে সংযোগ রাখার পক্ষেও কলকাতা সুবিধাজনক স্থান। এখান থেকে প্যাকেট তৈরী করে শত শত বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা বিভিন্ন জেলায় পাঠান হয়; কথা থাকে একই নির্দ্দিষ্ট দিনে সর্ব্বত্র ঐ পুস্তিকা বিলি করা হবে। খবরের কাগজে বের হত—চট্টগ্রাম, ঢাকা, রংপুর, সিলেট, গৌহাটি, কলকাতা, পাটনা, দিল্লী ও লাহোর "স্বাধীন ভারত" বা "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া" এবং "স্বাধীনতা" (লিবার্টি) নামক বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা স্কুলে, কলেজে, মেসে, দেয়ালে গত রাত্রিতে বিলি করা হয়েছে। তার পরই চলে খানাতল্লাশ ও গ্রেপ্তারের হিড়িক। তারপর সব থেমে যায়। চার পাঁচমাস পর অকস্মাৎ আবার অন্য একটি পুস্তিকা বিলি হয়—আবার ধরপাকড়। এমনি ধারাই চলে।

তিন-চার জন ছাড়া কলকাতার প্রকাণ্ড রাজনীতিক আন্দোলনের নেতারা কেউই বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ রাখত না। ভীতিই তার প্রধান

কারণ। পশ্চিম বঙ্গের দু-একটি দল দুর্ব্বলভাবে সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে যেত। আমরা পূর্ব্ব বঙ্গ থেকে কলকাতার সম্বন্ধে খুব বড় ধারণা পোষণ করতাম। এখানে এসে দেখি, কলকাতায় রাজনীতিক জীবন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। অনুশীলন সমিতির ঘাঁটি পূর্ব্ব বঙ্গে; উত্তর বঙ্গের সর্ব্বত্র এবং আসামের স্থানে স্থানেও এ-দল কাজ করত। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, খুলনাতেও তখন এই সমিতির শাখা বিস্তার হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে কলকাতাই পার্টির প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে। কিন্তু অর্থ সংগ্রহের জন্য পূর্ব্ব বঙ্গের সুদখোর ধনী মহাজন ও পাট ব্যবসায়ীদের টাকা লুঠ করাই তখনো ভরসা। প্রতি জেলার জেলা-সংগঠক (District Organiser) বা 'পরিচালক' এবং বাঙলার বাইরে গিয়ে পরিচালকের কাজ করার জন্য পূর্ব্ব বঙ্গ থেকে, বিশেষ করে ঢাকা থেকেই পরিচালক যোগাতে হ'ত।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় যাঁরা বিপ্লবী সঙ্ঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করে' যশ অর্জ্জন করেছিলেন এবং আদর্শ স্থানীয় হয়েছিলেন, তাঁরা জেলে, দ্বীপান্তরে। বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস মাণিকতলা বোমার মামলায় দণ্ডিত: পুলিন দাস ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় ও নরেন সেন বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত। অরবিন্দ দেশত্যাগী। ছোট ছোট গ্রুপ-নেতারাও বন্দী। নেতাদের অনুপস্থিতিতে কিন্তু দলের কাজ বন্ধ হয়নি; অজ্ঞাত অখ্যাত যুবক কর্ম্মীরা কাজের ভিতর দিয়ে জ্ঞাত ও খ্যাত নেতা হয়ে উঠেছে,— দলের বিপ্লবী ধারা বজায় রেখেছে। গোপন দলের নেতার খ্যাতি তখনকার দিনে দলের লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯১৪ সালের প্রথমভাগে পশ্চিমাঞ্চল থেকে দীর্ঘকায় এক বলিষ্ঠ বাঙালী যুবক এলেন আমাদের নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে; তিনি বিখ্যাত রাসবিহারী বসু। তিনিই উত্তর ভারতের বিপ্লবী দলের নেতা। দিল্লীতে বড় লাট সাহেবের

উপর বোমা নিক্ষেপের পর তিনি গা-ঢাকা দিয়েছেন। তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট আছে। পুরস্কার ঘোষণাও আছে। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট। চেহারায়, কথাবার্ত্তায়, বুদ্ধি-কৌশল ও চাতুর্য্যে তিনি বড়দরের বিপ্লবী নেতা হওয়ার যোগ্য তাতে কোনো সন্দেহ নাই। চন্দননগরের বিপ্লবী দলের সঙ্গে তিনি আমাদের দলের যোগ স্থাপন করে গেলেন। বেনারস, দিল্লী ও লাহোরের সঙ্গে যোগসূত্রও স্থাপিত হয়। রাসবিহারী নির্ব্বিঘ্নে লাহোর ফিরে গেলেন অথচ গ্রেপ্তারের পুরস্কার ঘোষণায় তাঁর ফটো শহরে, বাজারে, রেল-স্টেশনে সর্ব্বত্র টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অতঃপর নাটোর, দীঘাপাতিয়া, পাটুলী, পুটিয়া হয়ে কলকাতা থেকে রাজসাহী যাই। প্রত্যেক স্থানেই একটি ক'রে যুবকদল ছিল যারা ইংরাজ-রাজত্ব উচ্ছেদের কামনা নিয়ে কাজ করত। রাজসাহী জেলার চার্জ নিয়ে থাকার কোনো আশ্রয়স্থান ছিল না। কলেজের হোস্টেল ও মেসে 'গেস্ট' হয়ে ক'দিনই বা চলে। পুলিসের সন্দেহে পড়ার আশঙ্কাও আছে। অবশেষে ছবি বাঁধার দোকান খোলার জন্য পূর্ব্ব বঙ্গ থেকে একজনকে আনা হয়; দোকানদারীর আবরণে পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে থাকার উপায় করা হ'ল এ-ভাবে। প্রতি জেলাতেই জেলার ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের থাকার একটা সুব্যবস্থা করে নেওয়ার প্রয়োজন হত। বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়ার মত সাহসী ও সহানুভূতিশীল লোক খুব কমই ছিল। কলেজের ছাত্র ও অন্যান্য বন্ধুরা নিয়মিত সাহায্য দিয়ে আমাদের দু'জনের খোরাকী জোগাত।

রাজাবাজার বোমার মামলায় আমার নামে ওয়ারেণ্ট বের হওয়া অবধি আমাকে নাম পরিবর্ত্তন করে নিতে হয়। কিছুদিন পর দিনাজপুর গিয়ে সে-নামও বদলাতে হল। আমাকে কেন্দ্র স্থান থেকে দিনাজপুরের কার্য্যভার দিয়ে পাঠান হ'ল।

দিনাজপুর শহরে একজন উকীলের অর্থসাহায্যে আমাদের খোরাকী ও অন্যান্য সাধারণ খরচ চলে যেত। দু'জনের মাসে ২৫৲ টাকাতেই চলে। তিনি সন্ত্রাসবাদীদলের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। নাটোরেও একজন বড় উকীল আমাদের থাকা-খাওয়ার সাহায্য করতেন অকুণ্ঠিত চিত্তে। পূর্ব্ব বঙ্গে এরকম সাহায্য ও আশ্রয় বেশীই পাওয়া যেত।

১৯১৪ সালের মধ্যভাগে কয়েকটি হত্যাকাণ্ড হয়। চাটগাঁ ও ঢাকায় দু'জন গুপ্তচর গুলিতে নিহত হয়।

আই-বি ইন্‌স্পেক্টার নৃপেন ঘোষ স্বদেশীদের পিছনে লাগার ওস্তাদ। একদিন সন্ধ্যায় চিৎপুর ট্রামে শোভাবাজারের মোড়ে যেই ট্রাম থেকে নেমেছেন, অমনি কয়েকজন যুবক রিভলভার উঁচিয়ে ইন্‌স্পেক্টারকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছোঁড়ে; তিনি ধরাশায়ী হন। একটি পুলিস গার্ড পশ্চাদনুসরণ করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরে। উজ্জ্বল গ্যাসের আলোকে অসংখ্য লোক অবাক হ'য়ে এ-দৃশ্য দেখে। কয়েকজন পুলিস আসার পথে সোরগোল শুনে এক যুবককে দৌড়ে ধরে ফেলে। তার হাতে ছিল রিভলভার। হাইকোর্ট সেসনে জুরীর বিচারে কলেজের ছাত্র উপরোক্ত আসামী নির্ম্মল রায় জুরীদের মতে নির্দ্দোষ ব'লে সাব্যস্ত হয়।

জজ সাহেব পুনর্বিচারের আদেশ দেন,—এবারও জুরীরা আসামীকে নির্দ্দোষ বলে। তৃতীয়বার বিচার হওয়ার কথা হয়। দেশশুদ্ধ লোক চঞ্চল ও অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগলো—ছেলেটাকে ফাঁসীতে লটকাবার জন্য তারা ব্যগ্র। পরে সরকারী হুকুম আসে যে, নির্ম্মলের বিরুদ্ধে মামলা উঠিয়ে নেওয়া হবে। ব্যারিস্টার নর্টন সাহেবের জেরায় নির্ম্মলের মামলার ইতিবৃত্ত তখন সমগ্র বাঙলার লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করেছিল।

১৯১৩ সাল অবধি আমাদের ভবিষ্যতে বিশ্বাস করার মত আশাপ্রদ অবস্থা তেমন কিছুই ছিল না। তবু আমরা অনেক অভাব, দুঃখকষ্টের

ভিতর দিয়ে অম্লানচিত্তে কাজ করে যেতাম। অর্থাভাব, আশ্রয়াভাব তো ছিলই—দেশের লোকের চেতনা ও মনোবলেরও অভাব ছিল প্রচুর। ফলে লোকের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যেত খুবই কম। টেররিস্ট দলের কাজের প্রতি শিক্ষিত জনসাধারণের প্রশংসার ভাব ছিল, কিন্তু তা সক্রিয় প্রশংসা নয়। কর্ম্মীদের অসীম ত্যাগ, ধৈর্য্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা অবলম্বন করে চলতে হত। কর্ম্মাদর্শের প্রতি একান্ত অনুরাগ থাকায়, স্বদেশের স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত আমরা, পরমানন্দে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। কোন দুঃখকেই দুঃখ বলে মনে করিনি।

শুধু সেদ্ধ ভাত খেয়ে বা একটি রুটি কিনে খেয়ে কতদিন কাটিয়ে দিয়েছি। শুধু একটি কম্বল সম্বল করে শীতের রাতে রেল-স্টীমারে যাতায়াত করেছি। উত্তর বঙ্গের শীতে স্যাঁত্ স্যাঁতে একতলা ঘরে কতকাল যাপন করেছি। শীত-কাপড় বলে কোনো বস্তু আমরা ব্যবহার করিনি। অবশ্য বাঙালীর ব্যবহৃত সাধারণ একটা মোটা চাদর ফেরারী বা ঘর-ছাড়া বিপ্লবীরা প্রায় সকলেই ব্যবহার করত। এ-সব অভাবের পীড়ন ব্যক্তিগতভাবে আমাকে পীড়িত করেনি। কারণ, নিজ বাড়ীতে থাকাকালেও এর চেয়ে বেশী আরামে ছিলাম না; সম্মানী ব্রাহ্মণ বংশের মর্য্যাদাবোধটা ঠিক ছিল, কিন্তু আর্থিক অবস্থার দিক দিয়ে আমরা ছিলাম নিঃস্ব। আমরা ছোটবেলায় দেশে ম্যালেরিয়া রোগ দেখিনি। যাই হোক উত্তর বঙ্গ তখন ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। আমি এ অঞ্চলে কাজ করতে এসে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। কুইনিন খেতে খেতে আমার সমস্ত কিছুই যেন তেতো হয়ে গিয়েছিল। দুপুর রোদে পথ চলতে চলতে জ্বর এল—পথের ধারে একটা বাবলা গাছের তলায় জ্বর গায়ে শুয়ে পড়লাম; শীতে সর্ব্বাঙ্গে কম্পন—কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্বর বেড়ে উঠে—তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে পড়ি। নিকটেই গর্ত্তের মধ্যে

শুকিয়ে যাওয়া বর্ষার জলের শেষটুকু উপভোগ্য স্থান হয়েছিল যত রাজ্যের ব্যাঙের। তৃষ্ণার জ্বালা সইতে না পেরে উঠে গিয়ে দু'হাতে অঞ্জলীভরে সেই জল পান করে এসে আবার শুয়ে পড়লাম। বেলা শেষ হয়ে আসে আর জ্বরও সেরে যায়। দুটো কুইনিন পীল গিলে আবার উঠে গন্তব্যস্থানাভিমুখে রওনা হলাম। কোনোদিন হয়ত একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে একদিনের জন্য গেছি, এমন সময় জ্বর এসে পড়েছে—একদিনের স্থানে সাতদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছে; নিজেও যন্ত্রণা ভোগ করি, অপরকেও দুঃখ-যন্ত্রণা দিই। এমনি করেই কত মাস, বৎসরাবধি চলে গিয়েছে। ম্যালেরিয়ায় দেহ ভেঙে দিয়েছে বটে—তবে মন ভাঙতে পারেনি। মন ছিল স্বাধীনতা সংকল্পের ইস্পাতে গড়া। সাধারণ গৃহস্থ যেখানে মুষড়ে পড়ে, বিপ্লবী সেখানে আদর্শের উদ্দীপনায় মাথা উঁচু ক'রে রাখে। ম্যালেরিয়া কিছুতেই সারছে না দেখে উত্তর বঙ্গের ভারপ্রাপ্ত নেতাকে লিখেছিলাম:

'দাদা, স্বাস্থ্য আর টিকছে না, কি করি বলুন তো?'

উত্তরে লিখেছিলেন: "কিছুই করার নেই। অসুখের প্রতিকার চিকিৎসা ও কতগুলি স্বাস্থ্যনীতি পালন করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। ইংরেজেরা কোন্ সুদূর দেশ থেকে এসে আসামের জঙ্গলে বাণিজ্য বিস্তার করছে—কত দুর্গম দেশে প্রবেশ করে লুঠের ব্যবসা চালাচ্ছে। মরে মরেও এশিয়া, আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবিস্তার করতে তারা কুণ্ঠিত হয়নি। তোমরা কিনা পূর্ব্ব বঙ্গের বাইরে বিপ্লব প্রচারে যেতে ভয় পাও। এখানকার স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে তবু এখানে থাকতে হবে—কাজ করতে হবে; রোগের সঙ্গে লড়াই করে করেই দাঁড়াতে অভ্যাস করতে হবে। পূর্ব্বে যারা এসেছে প্রায় সবাই ভগ্ন-স্বাস্থ্য নিয়ে ফিরে গেছে। সকলেই এসে ম্যালেরিয়া হলেই পালাতে চায়—

তবে এখানে থাকবে কে? বিপ্লবী-সংগঠনের বিস্তার করবে কে? বাঙলায় আসামে বিপ্লবী চেতনা জাগাবে কে? কালাজ্বরের ভয়ে কেউ আসাম অঞ্চলে যেতে চায় না। সকল রকম প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই বিপ্লবী-দলের ভিত্তি শক্ত করতে হবে।" চিঠি পেয়ে আমি বিস্মিত হলাম কিন্তু উদ্দীনপনাও পেলাম খুব।

জেদ করলাম,—এখানে তো থাকবই—স্বাস্থ্যও ভাল করে তুলতে হবে। এরপরও আমি অনেকদিন উত্তর বঙ্গে ছিলাম। ম্যালেরিয়াও ছেড়ে গিয়েছিল। কুইনিন সর্ব্বদাই পকেটে নিয়ে ঘুরতাম এবং খাওয়ার নিয়ম মেনে চলতাম।

বাঙলা দেশের বহু বিপ্লবী যুবক বর্দ্ধমানের বন্যায় রিলিফের কাজ করতে গিয়েছিল। আমারও যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়। সেখানে শত শত নরনারী গৃহহারা, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, জলে দাঁড়িয়ে। কার না ইচ্ছা হয় সেখানে গিয়ে আর্ত্তের সেবা করতে,—বিশেষত, তখন আমরা বিবেকানন্দের সেবা-ধর্ম্মের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত। দলের নির্দ্দেশ এল—'সবাই গেলে চলবে কেন?' ফলে আমি কুড়িগ্রাম মহকুমার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বর্দ্ধমানে চাঁদা সংগ্রহ করে পাঠাতে লাগলাম।

অর্থাভাব লেগেই ছিল। নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন খুবই সামান্য। ডাল ভাত বা সেদ্ধ ভাত হলেই খুশি, কখনো কখনো মাছের ঝোল। সকাল বেলা দু-এক পয়সার মুড়ি অথবা ছাতু দিয়ে জল খাওয়া। চা-বিড়ি-সিগারেটের কোনো বালাই ছিল না—পানও না। কলকাতায় মুড়ি ও বেগুনী, কখনো বা মুড়ি-মুড়কি আমাদের প্রাতরাশ ছিল। জন প্রতি দু'পয়সা হিসাবে খরচ। বিকালে জলখাবার খাওয়ার মত অর্থ সংস্থান ছিল না। টাকা হাতে থাকলেও আমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত এক পয়সাও ব্যয় করতাম না এবং কোনো রকম বিলাসিতার ধারেও

যেতাম না। দিনাজপুর থাকা কালে দু'দিন কাটারীভোগ চালের ভাত রেঁধে খাওয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি। যুক্তি ছিল, শুধু সেদ্ধ ভাত খেতে গেলে মাঝে মাঝে সরু চাল খাওয়া দরকার।

ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাওয়ায় পুরী ভুবনেশ্বর যাই হাওয়া বাদলাতে। আমাদের শ্রদ্ধেয় "মহারাজের" অসুখ হওয়ায় ডাক্তার তাঁকে কিছুদিনের জন্য হাওয়া পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। তারই সঙ্গে থাকার জন্য এবং নিজের স্বাস্থ্যও ভাল করার জন্য পুরী গিয়ে কিছুদিন ছিলাম। উড়িয্যার ছাত্রদের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা বলেও 'স্বদেশী' কাজের দিকে তখন তা'দের আকৃষ্ট করা যায়নি।

মসার পিস্তল

কলকাতার বন্দুক ব্যবসায়ী রডা কোম্পানীর মসার পিস্তলগুলি অপূর্ব্ব কৌশলে হস্তগত করা বাঙলার বিপ্লবের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রডা কোম্পানী বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী ক'রে এখানে কারবার করত। সময়টা ছিল ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসের শেষভাগ। কোম্পানীর একটি বাঙালী কর্ম্মচারী এক চালান অস্ত্র নিয়ে আসেন। বাকা ৫০টা মসার পিস্তল ও ৪৬ হাজার রাউণ্ড বুলেট হাওড়া স্টেশন থেকে উধাও হয়ে যায়। যে বাঙালী বাবুটি স্টেশন থেকে মাল ডেলিভারী নিতে গিয়েছিলেন তিনি আ'র ফিরলেন না। বৌবাজারের অলি-গলি খুঁজে পুলিস হাজার হাজার বুলেট পেয়ে গেল, কিন্তু অনেক ধর-পাকড় খানাতল্লাশ করে একটি পিস্তলও বের করতে পারেনি। জার্মানীর তৈরী মসার অতি শক্তিশালী পিস্তল,—এগুলি পেয়ে বাঙালী বিপ্লবীরা দুর্দ্ধর্ষ সাহসী হয়ে উঠেছিল। কারুকার্য্য খচিত মসৃণ সুন্দর যন্ত্রটির যে এত ধ্বংসকারী ক্ষমতা আছে না জান্‌লে তা বুঝবার উপায় নেই। যে কাঠের ফ্রেমে পুরে এই পিস্তল কোমরে বেঁধে রাখা যায়, দরকার মত সেই ফ্রেম খুলে পিস্তলের বাঁটে লাগিয়ে আবার তাকে মসার রাইফেল বন্দুকরূপে কাঁধে তুলে ধরা যায়। বিভিন্ন দলের মধ্যে ৫০টি মসার পিস্তল বিতরণ করা হয়। বিপিন গাঙ্গুলীর দল এ-অস্ত্র

সংগ্রহ করে। প্রায় প্রত্যেকটি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে এই পিস্তল ব্যবহৃত হয়েছিল। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার সম্পর্কিত রিপোর্টে বলা হয় যে, ৫০টা মসার পিস্তল বাঙলা গভর্নমেণ্টকে প্রায় অচল করে তুলেছিল।

১৯১৪ সালের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর শুনা গেল যে, শিখ রক্তে বজবজের গঙ্গাজল রঞ্জিত হয়ে গেছে। কানাডা ও আমেরিকা থেকে "গদর পার্টি"র দেওয়া অস্ত্র নিয়ে শিখরা ফিরে আসছিল দেশে বিদ্রোহ করার উদ্দীপনায়। বজবজে "কোমাগাতা মারু" স্টীমার পৌছতেই তারা শুনল যে, তাদের বন্দী করা হবে। তৎক্ষণাৎ স্টীমারের উপর থেকেই স্বাধীনতাকামী শিখ বীরগণ সশস্ত্র পুলিসের উপর গুলি চালাল। শিখরা যুদ্ধ করতে করতে নীচে নেমে কলকাতা অভিমুখে মার্চ করতে চেষ্টা করে। উভয় পক্ষেই হতাহত হয়। পুলিস কমিশনার হ্যালিডে সাহেব আহত হন। ২০।২৫ জন শিখ নিহত হয়। আহত শিখরা কেউ কেউ রক্তাক্ত দেহে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ও পুলিসের গুলিতে জীবন দেয়। শিখ দলের নেতা বাবা গুরুদিৎ সিং এবং আরো অনেকে পালিয়ে যায়। বাকী ৬০।৭০ জনকে বন্দী করে পাঞ্জাব পাঠিয়ে দেয়। "ওয়া গুরুজী কি ফতে," "হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিতে দিতে বন্দীরা কলকাতা থেকে লাহোরে যায়।

বোমার টুক্‌রায় আহত

নবেম্বর মাসে এক জবরদস্ত শত্রুকে নিধন করতে গিয়ে আমরা নিজেরাই আহত হই। দু'টি বোমা ছোঁড়া হয়—একটি বৈঠকখানা ঘরে। দেহরক্ষী হেড কনেস্টবল গুলিভরা পিস্তল হাতে নিয়েই দাঁড়িয়েছিল দুয়ারের সম্মুখে,—মরল কিন্তু সে-ই আগে। বিপুল শব্দে বোমা ফাটল—ঘরের আসবাবপত্র সব টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে গেল, ইলেকট্রিক আলো চুরমার হয়ে গেল—সমস্ত বাড়ী কেঁপে উঠল। বৈঠকখানার ভিতর তিন জন আহত অবস্থায় অজ্ঞান—উপরতলা থেকে মরণের আর্ত্তনাদ উঠল। যাকে উদ্দেশ্য করে বোমা নিক্ষিপ্ত হল তিনি মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে চেয়ার ছেড়ে উঠেছেন—সিঁড়িতে দোতলায় উঠবার পথে জ্যান্ত অবস্থায় স্বামীকে দেখেই স্ত্রী নাকি ছুটে এসে কেঁদে বললেন, 'ওগো এবার চাকরী ছাড়। কাজ নেই আমাদের বড় চাকরীর গৌরবে।' আমরা আহত দেহে ছুটে যাই। সম্মুখে আশে পাশে বহুলোক রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। তাদের জিজ্ঞাসা : "হ্যাঁগা এ কিসের শব্দ? তোমরা দৌড়াচ্ছ কেন?" দ্রুতপদে এগুতে এগুতে বলি, "দেখতে যাই কোথায় কি হল।" হ্যারিসন রোডের উপর উঠতেই কে বলে উঠ্‌ল, "ও আর কিছু নয়। জার্মানী বোমা মেরেছে নিশ্চয়।" কেউ কেউ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছে। দেখে বলে—"এখানে নয়, ডায়মণ্ডহারবারে কিছু ঘটেছে—এ তারই শব্দ।"

আমার হাতে পায়ে বুকে ছিটকে-আসা বোমার টুক্‌রোর ক্ষত ও রক্ত ; জামাকাপড়েও রক্তের চিহ্ন। হ্যারিসন রোডের উজ্জল আলোকে রাস্তা পার হতে পারছি না। এখন যাই কেমন করে। হাতে আছে রিভলভার। তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়া দরকার। বোমার বিপুল আওয়াজে রাস্তায় বহুলোক দাঁড়িয়ে গেছে। লোক যত বাড়তে লাগ্‌ল ততই সুযোগ বেশী বুঝলাম। ভিড়ের মধ্যে রাস্তা পার হয়ে গলির ভিতরে গিয়ে পড়লাম। একটা বাড়ীর অন্ধকার বারান্দায় বসে পায়ে হাত দিয়েই অকস্মাৎ শিউরে উঠ্‌লাম। হাত পা যেন অবসবোধ হ'ল। যেখান থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে সেখানে আঙুল ঢুকিয়ে দেখি প্রায় সমস্ত আঙ্গুল দু'টোই ভিতরে চলে গেল। এতক্ষণ উত্তেজনায় বুঝতেও পারিনি যে, এত বড় আঘাত লেগেছে। সেখানেই অবসন্ন দেহে এলিয়ে পড়লাম। গায়ের গরম চাদর ছিঁড়ে পায়ের উপর চেপে ধরলাম—চাদর ভিজে গেল। রক্ত বন্ধ হয় না। পাশ দিয়েই একটা রিক্‌সা যাচ্ছিল, ডেকে বল্লাম, "ভাই, আমাকে নিয়ে যাও, টাকার জন্যে ভেবো না, তোমাকে খুশি করে দেব।" রিক্‌সাওয়ালা ব'লল, "আপকা ক্যায়া হুয়া বাবু।" উত্তর দিই, "রাস্তায় একটা হোঁচট খেয়েছি।" নিকটবর্ত্তী আড্ডায় গিয়ে পৌছলাম। অন্য বন্ধুরাও তখন পৌছে গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল, রক্ত বন্ধ করে ছাত্র-ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শুইয়ে দিল।

পরদিন আমাকে বেশ পরিপাটি ভদ্র পোশাকে সজ্জিত করে ব্যাণ্ডেজের উপর পায়ে গরম মোজা পরিয়ে অসুস্থ ব্যক্তির মত ধরাধরি করে গাড়ীতে উঠিয়ে রাজসাহী নিয়ে যাওয়া হয়। টিকটিকি (ডিটেক্‌টিভ) পুলিস স্টেশনে তাদের ডিউটিতে ছিল। রাজসাহী সাইন্স কলেজ হোস্টেলে এক ছাত্রের ভাই হয়ে বিছানায় শু'লাম। পায়ের ব্যথা বেড়ে

গিয়েছিল। সরকারী এসিস্ট্যাণ্ট সার্জনকে 'কল' দেওয়ায় তিনি এসে দেখেই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। ডাক্তারকে বিশ্বাস-যোগ্য গল্প তৈরী করে বুঝান হয়েছিল : নিজের তাড়াতাড়ির গরজে চল্‌তি ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে খোয়াভরা রাস্তায় পড়ে গিয়ে পা কেটে যায়। বন্ধুরা আমাকে হাসপাতালে পাঠাতে নারাজ—যদি সমস্ত ফাঁস হয়ে যায়। ডাক্তারও হাসপাতালে না নিয়ে কিছু করতে অনিচ্ছুক। অবশেষে ঠিক হল, সকালে ডাক্তার আসার সময় হাসপাতালে নিয়ে যাবে, ডাক্তার দেখার পরই নিয়ে আসবে। ডাক্তার কিছু সন্দেহ করে পুলিসে খবর দেওয়ার যাতে সুযোগ না পায় তার জন্যে এই রকম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। এসিস্ট্যাণ্ট সার্জন ক্ষতস্থান দেখে বললেন, এতো খোয়ার আঘাত মনে হয় না, পোড়া লোহার টুক্‌রা ও পোড়া ছাইয়ের মত কি যেন বেরুচ্ছে। ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। আমি তখন জ্ঞান হারিয়েছিলাম। এক মাসেরও অধিক কাল অচল হয়ে ছিলাম। আঘাত সেরে উঠার পর আবার কাজে লেগে গেলাম। অন্যান্য আহত বন্ধুরাও তখন সেরে উঠেছে।

অস্ত্র সংগ্রহের কথা

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব অবধি বাঙলার ছোট বড় বিপ্লবী দলগুলি ধীর ও মন্থর গতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। অস্ত্রের অভাবই তাদের সকল উদ্যম সকল প্ল্যান ব্যর্থ করে দিত। ফরাসী চন্দননগর থেকে কিছু পিস্তল-রিভলভার পাওয়ার সুযোগ ছিল। বিদেশ থেকে চোরা-কারবারীরা দুটো চারটে রিভলভার এনে ডবল দামে বিক্রী করে। গুণ্ডাদের কাছ থেকেও ২।৪টা আনা হত। সরকারী কর্ম্মচারীদের বাড়ী থেকে মাঝে মাঝে এক-একটা চুরী করার ব্যবস্থাও হ'ত। এভাবে সংগৃহীত কয়েকটি মাত্র অস্ত্রই বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে কাজ (action) করা হত। এই সামান্যমাত্র অস্ত্র সম্বল নিয়ে সাহস, আক্রমণ-কৌশল ও লোকবল থাকা সত্ত্বেও কোনো বিপ্লবীদলই বড় রকম প্রতিরোধের সম্মুখীন হ'তে পারেনি। রাউলাট কমিটির রিপোর্টে লেখা হয়েছে: "যথেষ্ট অস্ত্র সরবরাহ হলে বাংলা দেশে ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হত।" * প্রচুর অস্ত্র পাওয়া গেলে অনেকগুলি খণ্ডযুদ্ধ করা সম্ভব হত।

গোপনে কেনা, চুরি করে সংগ্রহ করা অথবা ডাকাতিতে কেড়ে আনা ছাড়া বন্দুক পাওয়ার অন্য উপায় ছিল না। দেশী মিস্ত্রীরা কেউ কেউ পিস্তল-রিভলভার ও বন্দুক নমুনা দেখে তৈরী করতেও

সিডিশন কমিটির রিপোর্ট, ১৯১৮, পৃষ্ঠা ৯২

পারত বটে, তবে সে-সব বেশী কাজের হয়নি। মিস্ত্রীরা এমন দুঃসাহস করতও না। লক্ষ্যভেদ শিক্ষার জন্য (টারগেট প্র্যাকটিস) অনুশীলন সমিতি কয়েকটি স্থান ঠিক করেছিল। স্বাধীন পার্ব্বত্য ত্রিপুরার অন্তর্গত "বিলনিয়া" তার মধ্যে প্রধান।

রডা কোম্পানীর মসার পিস্তলগুলি বাঙলায় তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল —শুধু ৫০ টিতেই এই।

বোমা ও ডিনামাইট দিয়েও সন্ত্রাসবাদীরা দেশে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সর্ব্ব প্রথম হেমচন্দ্র দাস ফ্রান্স থেকে বোমা তৈরী শিক্ষা করে আসেন। চন্দননগরে বোমা প্রস্তুতের কারখানা ছিল। এখান থেকেই নানা স্থানে বোমা সরবরাহ করা হয়। কলকাতা রাজাবাজারেও বোমার কারখানা ধরা পড়ে। বোমা তৈরীব ফরমূলা নিয়ে বিভিন্ন দল বোমা প্রস্তুতের চেষ্টা করে। কোনো কোনো গুপ্ত-কারখানায় Nitro Explosives, Hand-book of Modern Explosives ইত্যাদি বিস্ফোরক প্রস্তুত প্রণালীর বই পাওয়া গেছে। *

সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপ শুধু আমলাতন্ত্রের আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্যই নয়। দেশের লোকের মনে জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এ-উদ্দেশ্যের সফলতা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে-যুগে। জাতীয় ও বিপ্লবী সাহিত্য স্বদেশ-প্রেম এবং কর্ম্মোদ্দীপনা জাগাবার শাণিত অস্ত্র রূপে ব্যবহৃত হত। স্বদেশী-অন্দোলনের সময় থেকে অনেক জীবনী, ইতিহাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গান, অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহিত্য রচিত হয়ে দেশবাসীকে নব-চেতনায় ও নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তুলেছে।

* সিডিশন কমিটির রিপোর্ট (রাউলাট), ১৯১৮

যুদ্ধ ও বিদ্রোহ ঘোষণার প্রচেষ্টা

(১৯১৫)

১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে ইওরোপের রাষ্ট্রগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল। জার্মানীর আক্রমণে দিনের পর দিন বৃটেন ও ফ্রান্সের পরাজয়ের খবর এসে আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণকে 'ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত করে তুলেছিল। বড় বড় মেল-স্টীমারগুলি ভারতে আসার পথে ভূমধ্যসাগরে জার্মান টর্পেডোর আঘাতে ডুবে মরত। ভারত মহাসাগরে জার্মান ডুবো জাহাজের দৌরাত্ম্য বেড়েই চললো। শোনা গেল, ডায়মণ্ড হারবার এবং পুরীতেও টর্পেডোর আঘাত। ইংলণ্ডের সাগরোপকূলে জার্মানী বোমা ফেলে গেল। সেই প্রথম এক দেশের বোমারু বিমান অন্য দেশে গিয়ে বোমা ফেলে এল। আমাদের দেশ-জোড়া চাঞ্চল্য আর কানাকানি। এবার আর ইংরেজ রাজত্ব থাকবে না—জনসাধারণের মনে এমনি ধারণা হ'ল। আমরাও ব্যস্ত। এক ধনীর বাড়ীর অর্থ লুঠের সম্পর্কে আমাকে অনতিবিলম্বে ময়মনসিংহ যেতে হয়; তখন প্রচুর অর্থের দরকার। ঢাকা ও কলকাতা হয়ে রাজসাহী ফিরে যাই। মফঃস্বলের সর্ব্বত্র লোকের এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, ইংরাজ আর এ-দেশে থাকবে না। আমার ঠাকুরদা' ঢাকার প্রবীন উকীল আনন্দ পাকড়াশী বলেছিলেন, ইংরাজ দিন দিন দুর্ব্বল

হয়ে যাচ্ছে—এবার তোমরা কিছু চেষ্টা করলে সহজেই সাফল্য লাভ করতে পার। অন্য একজন উকীল বলেছিলেন, মাহেন্দ্রক্ষণ বয়ে যাচ্ছে, এ-সময় আপনারা নীরব কেন? আমরা যে ভিতরে ভিতরে কিছু করার চেষ্টায় আছি তা তখন প্রকাশ কবা যায় না। আমাকে মালদহ জেলার বিপ্লবী-সংগঠনের ভার দেওযা হয় পূর্ব্বেই। সেখানে নাকি তখন একজন বিচক্ষণ পরিচালকের দবকাব ছিল। বাজসাহী কলেজ ছেড়ে মালদহে যাই। মহানন্দার তীরে বসে ছাত্র ও যুবকদের সঙ্গে সমাজ, বাষ্ট্র, স্বাধীনতা ও সংগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা হত; প্রতিদিন যুবকদেব কাজে অগ্রসর হওয়ায় জন্যে উদ্দীপনা যোগাতাম। মালদহ জাতীয় বিদ্যালয়েব ভাল ভাল ছেলেগুলিই আমাদের দলে ছিল। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে বলাবলি করতেন—ওঁবা জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় শিল্প উন্নতির প্রচেষ্টাকেই প্রকৃত দেশেব কাজ মনে করেন। জাতীয় স্বাধীনতা তাদের কাছে গোণ হয়ে যায়। মালদহ জেলায় কাজ করার সময় অনেক নূতন ছেলেকে দলে আনা হয়। কাজ ভালই চল্‌ছিল, এমনি সময় এল কলকাতা যাওয়ার আহ্বান।

চঞ্চল ও কৌতূহলী মন নিয়ে রওনা হলাম। কলকাতার নেতারা চুপি চুপি বলে দিলেন, 'শীঘ্রই ভারতের এক প্রান্ত থেকে আব প্রান্ত অবধি বিদ্রোহের আগুণ জ্বলে উঠবে—প্রস্তুত হয়ে থাকুন।' ... 'কতকগুলি খবর সংগ্রহ ক'রে অবিলম্বে লোক মারফত এখানে পাঠিয়ে দিন।'—

সমগ্র জেলায় কটি লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক রিভলভার আছে; কোথায় আছে? কটি বন্দুক রিভলভার এ মাসের মধ্যে ছিনিয়ে আনা সম্ভব হবে; কটি থানা? কোন্ থানায় কটি রাইফেল্? কতজন বিপ্লবীর পক্ষে পুলিস লাইন ও ট্রেজারী দখল করা সম্ভব; রেল লাইন ছাড়া যাতায়াতের কি ব্যবস্থা আছে? বিদ্রোহে সাঁওতালদের সহযোগিতা পাওয়া

সম্ভব কিনা ইত্যাদি বহু রকমের সংবাদ সংগৃহীত হ'ল। বিভিন্ন জেলার চিঠিপত্র নিয়ে কলকাতা থেকে রওনা হ'লাম। রাজসাহী, কুচবিহার, দিনাজপুর ও কাটিহার হয়ে মালদহে ফিরে এলাম।

ঢাকা থেকে লাহোর অবধি বিদ্রোহের বিপুল আয়োজনে নেতারা ব্যস্ত। ঢাকা সশস্ত্র সেনা বাহিনীতে তখন শিখ সৈন্য ছিল; লাহোরের শিখ ষড়যন্ত্রকারী সেনারা ঢাকার শিখদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য পরিচয়-পত্র পাঠিয়ে দেয়। ঢাকার বিপ্লবী নেতা ঐ চিঠি নিয়ে শিখ সেনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওদের নেতৃস্থানীয় দু-জন সমস্ত খবর শুনে বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠে। ময়মনসিংহ ও রাজসাহী স্কুলের জঙ্গলে যুবকেরা সন্ধ্যার পর কুচকাওয়াজ অভ্যাস করত। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার রণ-কৌশল শেখার জন্য বিপ্লবী যুবকেরা তখন "বর্ত্তমান রণনীতি", সখারামের "গেরিল্লা যুদ্ধ প্রণালী", "Quick training for war" ইত্যাদি পুস্তক পড়ায় মনোযোগী হয়ে উঠেছিল। বন্দুক চুরির হিড়িক পড়ে যায় জেলায় জেলায়। পাছে গভর্নমেণ্ট সব বন্দুক হস্তগত ক'রে ফেলে এ-আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি কাজ সারার নির্দ্দেশ এসেছিল। সর্ব্বত্র গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, এবার আর ম্যাট্রিকুলেশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কোনো পরীক্ষাই হবে না। যুদ্ধের সময় এ-গুজব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে খুব সাফল্যজনক হয়।

সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ১৯১৫ সালে সত্যি সত্যিই ভারতে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের দুঃসময়কে ভারতের সুসময় মনে করা স্বাধীনতাপ্রয়াসী বিপ্লবীদের পক্ষে স্বাভাবিক। জার্মান গভর্নমেণ্ট বৃটিশ শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য সর্ব্বত্রই বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাচ্ছিল। টাকা, অস্ত্র ও সামরিক অফিসার দিয়ে সাহায্য করছিল। ভারতের বিপ্লবীদেরও জার্মান গভর্নমেণ্ট সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

পাঞ্জাবের হরদয়াল ও অন্যান্য শিখ বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠিত আমেরিকার "গদর পার্টি"র সঙ্গে বাঙালী বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল। জার্মানীতে ভারতীয় বিপ্লব কমিটি গঠিত হয়: ডাঃ ভূপেন দত্ত, প্রফেসার বরকতুল্লা, ডাঃ মনসুর, ডাঃ হাফিজ, ওবেদুল্লা সিন্ধী, বীরেন চ্যাটার্জী প্রভৃতি অনেকেই তখন বৃটিশের শত্রুপক্ষের সাহায্য নিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহের চেষ্টা করেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ নানাদেশ ঘুরে ঐ একই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করেন। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে রাসবিহারী বসু জাপানে গিয়ে বাঙলার বিপ্লবী-দলের সঙ্গে যোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। ভারতের কংগ্রেসী নেতারা এ-বিদ্রোহ প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। বিধিসঙ্গত পন্থা ছেড়ে সংগ্রামাত্মক পথের উঁচু পর্য্যায়ে তাঁরা তখনো উঠতে পারেনি, রাজনীতিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিতেরা যুদ্ধের সময় বিপ্লবী-দলের ওপর অনেকখানি ভরসা করেছিলেন।

বিদ্রোহ প্রচেষ্টার আসল খবর আমরা তখন বেশী জানতাম না; পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাঙালী বিপ্লবী-দলের উপরই বাঙলায় বিদ্রোহের একমাত্র ভরসা, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের মত বাঙলায় সেনা-বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল না।

আমেরিকায় পাঞ্জাবীরা যুদ্ধের আগে থেকেই "গদর পার্টি" নামে ভারতে বিদ্রোহ করার উদ্দেশ্যে পার্টি গঠন করে। যুদ্ধের সময় জার্মানী ও সুইডেনে ভারতীয় বিপ্লব কমিটি স্থাপিত হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরই আমেরিকা থেকে বিদ্রোহে সাহায্য পাওয়ার সংবাদ নিয়ে লোক আসে। গদর পার্টি জার্মানীর সাহায্যে আমেরিকা থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের পথে ভারতে অস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিল। হাজার হাজার শিখ ও প্রবাসী ভারতীয় বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতে

ফিরে আস্‌ছিল ত্রিশ হাজার রাইফেল, দু'হাজার পিস্তল, হাত বোমা (grenade) ও বিস্ফোরক পদার্থ, লক্ষ লক্ষ কার্তুজ ও বুলেট ইত্যাদি জাহাজে প্রেরিত হবে বলে নাকি খবর এসেছিল। লক্ষাধিক টাকাও আসার কথা। পর পর ৪।৫ খানা অস্ত্রবোঝাই জাহাজ বঙ্গোপসাগরের তীরে বিশেষ বিশেষ স্থানে অস্ত্র নামিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমেরিকা থেকে পাঠান হয়েছিল। জার্মানীর প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র কিন্তু ভারতে এসে পৌঁছায়নি; পথেই শত্রুর হাতে পড়ে যায়।

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী উত্তর ভারতে ও বাঙলায় বিদ্রোহ ঘোষণা করার তারিখ নির্দ্ধারিত হয়েছিল। রাসবিহারী বসুর প্রেরিত এই খবর বেনারসের নেতা শচীন সান্যাল বাঙলায় পাঠিয়ে দেন। বাঙলায় তখন অনুশীলন দলের নেতা ছিলেন "গিরিজা বাবু"। রাসবিহারী পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বাঙলার বিপ্লবী নেতাদের আসন্ন বিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তোলার জন্য এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য মৃত্যু পণ করে সংগ্রাম করতে বলেন। বাঙলার বিপ্লবীরা সংবাদের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হয়ে বসেছিল। কিন্তু কোনো সংবাদ এসে পৌঁছল না। লাহোরে নাকি বিদ্রোহের সংবাদ প্রকাশ হ'য়ে গিয়েছিল। বোমা, অস্ত্র, ঘোষণা-পত্র ও পতাকাসহ বহু বিপ্লবী ধরা পড়ে যায়।

আমেরিকা থেকে পুনরায় অস্ত্রের জাহাজ পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। অপর একদল বিপ্লবী ১৯১৫ সালের জুন মাসে সুন্দরবনের নদীতে নৌকা নিয়ে দিনের পর দিন জার্মান জাহাজের প্রতীক্ষায় বঙ্গোপসাগরের পানে তাকিয়েছিল। তারা জানত না যে, তাদেরই প্রত্যাশিত জাহাজ জাভায় ধরা পড়ে গেছে। এদের বিদ্রোহের প্ল্যান ছিল এই রকম: কলকাতার দল নরেন ভট্টাচার্য্য ও বিপিন গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করবে। যতীন মুখার্জী মাদ্রাজ রেলপথ ও ভোলানাথ

চ্যাটার্জী বি. এন. রেলওয়ে ধ্বংস করে দেবে। সতীশ চক্রবর্ত্তী ই. আই. রেলওয়ের অজয় সেতু উড়িয়ে দেবে। যাদুগোপাল মুখার্জী ও অতুল ঘোষ সুন্দরবনের নদীতে জার্মান জাহাজ থেকে অস্ত্র ডেলিভারী নেবে।* এ-বিদ্রোহ প্রচেষ্টা চলেছিল যতীন মুখার্জীর অধিনায়কত্বে।

বিদ্রোহের পরিকল্পিত কার্য্যসূচী কল্পনাতেই রয়ে গেল। তখন ধারণা ছিল যে, একবার বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেলে গরীব জনসাধারণ বিদ্রোহে যোগ দেবে। বাস্তবে তা হ'ত বলে এখন আর মনে হয় না। সাময়িক অরাজকতা সৃষ্টি করা অবশ্য অসম্ভব ছিল না। অনেক কল্পিত আশা ও বিশ্বাস নিয়েই আমরা দাসত্বের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য মেতে উঠেছিলাম। "রণনীতি" বই পড়ে তাড়াতাড়ি গেরিলা যোদ্ধা হওয়ার ইচ্ছাও অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত "প্রজাতান্ত্রিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র" (Federal Republic of India) ঘোষণা দ্বারা বিদ্রোহ আরম্ভ করা স্থির হয়েছিল।

সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলেও, একটা ব্যর্থ সংগ্রামেরও প্রয়োজন ছিল: আমাদের আত্মদানে জাতি আরো বেশী সচেতন হত, আত্ম-বিশ্বাসী হত। প্রথম প্রচেষ্টার ব্যর্থতা দ্বিতীয় প্রচেষ্টাকে সহজ, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করত। জাতির কাছে দেশবাসীর কাছে আমরা মরণের কারণকে বড় ক'রে প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে পারতাম, দেশের জন্য রক্তদানের জীবন্ত এক আদর্শ রেখে যেতে পারতাম। আজ অতীত স্মৃতি-কথা লিখতে বসে এ-কথা বল্‌ছি না; তখনই আমরা এই ধরনের আলোচনা করেছি। এই ছিল আমাদের সেদিনের দুরন্ত আশা, বুকভরা সান্ত্বনা। কেবল জল্পনা-কল্পনা, আলোচনা ও উদ্যোগ-আয়োজনেই বিদ্রোহের

* রাউলাট কমিটির রিপোর্ট—১২২ পৃঃ

অবসান হয়ে গেল। সংগ্রামের উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য যেমন নবজীবনের সাড়া এনেছিল, কিছু না হওয়ায় তেমনি নৈরাশ্য ও অবসাদে ডুবিয়ে দিল আমাদের সকলকে। সত্যিই সেদিন মহান মৃত্যুর রঙীন এক নেশা আমাদের পাগল করে তুলেছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই গোপনে বিতরিত "স্বাধীনতা" পুস্তিকায় কয়েক লাইন পৌরাণিক কবিতা উদ্ধৃত করে যুবকদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা হয়:

"না হইতে মাগো বোধন তোমার,
ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট।
জাগো মা রণচণ্ডী জাগো মা আমার,
আবার পূজিব তব চরণতট।"

সকল কাজেই মহড়া দরকার হয়। আমাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধেরও এই হ'ল মহড়া। আমাদের এবারকার ব্যর্থতা একটা মহড়া মাত্র; আবার এতে ভবিষ্যৎ সাফল্যও সূচনা করে। সেদিন আমাদের আশা ও উৎসাহভঙ্গের এইটুকু ছিল সামান্য সান্ত্বনা।

আঘাত দেওয়ার পূর্ব্বে শত্রুর আঘাতে আমরা কাবু হয়ে পড়ি। এর পর কয়েক মাসের মধ্যেই আয়র্লণ্ডে ঈস্টার বিদ্রোহ হয়। আয়রিশ বিদ্রোহীরা সাফল্যজনকভাবে ডাবলিন বিদ্রোহ ক'রে বৃটিশ শত্রুকে আঘাত দিতে সক্ষম হয়।

বিদ্রোহ আয়োজনে টাকা চাই

টাকা না হলে সব প্ল্যান অচল। স্বাধীনতা সংগ্রামের আয়োজনের জন্য প্রাথমিক খরচের টাকা চাই। কে দেবে টাকা? যাদের ধন আছে ব্যয় করে না অথবা সৎ কাজে ব্যয় করে না, তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে দেশের কল্যাণে সে-ধন ব্যয়িত হবে। আয়র্লণ্ডের বিপ্লবীরাও তা করেছে; রুশিয়ার বিপ্লবীরাও তা ক'রেছে। অতীত ইতিহাস থেকে এসব নজির বার করা হয়েছিল সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের সন্দেহ অপনোদনের জন্য। কেউ কেউ গোপনে অর্থ সাহায্য করত কিন্তু তা অতি সামান্য। ফেব্রুয়ারী মাসে গার্ডেন রীচ বার্ড এণ্ড কোং এর মিলের টাকা নিয়ে যাচ্ছিল; একদল যুবক ট্যাক্সি গাড়ী থেকে পিস্তল উঁচিয়ে আঠারো হাজার টাকা নিয়ে কলকাতা শহরে চলে আসে। কয়েকদিন পর বেলেঘাটার এক চালের মহাজনের ২০,০০০৲ টাকা নিয়ে যুবকেরা ট্যাক্সি গাড়ীতেই সরে পড়ে। যুদ্ধের সময় ট্যাক্সি-ডাকাতি নূতন উপদ্রব হয়ে দেখা দিল কলকাতায়।

রংপুরেও একটি বড় ডাকাতি হয়। ব্যাপারটি ঘটে নাটোর মহকুমায় এক গ্রামে এক ধনী মহাজনের বাড়ীতে। লগ্নী কারবারে মহাজনের বিপুল ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হ'য়েছিল; গরীবদের সর্ব্বস্বান্ত ক'রে সুদ আদায় ক'রে বলে অখ্যাতিও তার অনেক। স্বদেশী-ডাকাতদল ভাবে, এ-বাড়ীর টাকা

লুটে নিলে গ্রামের লোক সুখীই হবে। এমন কুলোকের সাহায্যে কেউ আসবে না। কিন্তু সাবধানের মার নাই; যদি পল্লীবাসীরা এসে বাড়ী ঘেরাও করে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৩৫ জন যুবককে একত্র ক'রে হাফ-প্যাণ্ট ও কোর্ত্তা পরিয়ে মসার পিস্তল-রিভলভারে সজ্জিত ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়। এ-আক্রমণেরও পন্থা এবং কৌশল আছে। জনবহুল পল্লীতে গ্রামের মাঝখানে মহাজনের বাড়ীর আশেপাশে অসংখ্য মুসলমান কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বাসিন্দা আছে। প্রবেশ করার কৌশল বিবেচনা ক'রে নিতে হবে পূর্ব্বেই। গ্রামের ম্যাপ, বাড়ীতে ঢুকবার অলিগলি, ঝোপ-জঙ্গল, খাল, রাস্তা ইত্যাদির ঠিক ঠিক তথ্য জানা চাই। থানা, টেলিগ্রাফ অফিস, রেল-স্টেশন কতদূর, কখন গাড়ী পাওয়া যায় ইত্যাদি। আক্রমণের নিয়ম হল, যারা আক্রমণ ক'রে ফিরে যাবে তারা একেবারে খালি হাতে যাবে, টাকা, অস্ত্র কিছুই সঙ্গে নেবে না। পূর্ব্বেই অস্ত্রাদি ও টাকা বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন বিশ্বাসী বন্ধুর কাছে রেখে যেতে হবে। মাল ডেলিভারী নেওয়ার জন্য এই কাজের পরক্ষণেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে লোক অপেক্ষা করবে। টেলিগ্রাফ তার কাটার দরকার হলে তার কাটতে যাবে কয়েকজন। নৌকোয় যাতায়াত করার প্রয়োজন হলে নদীপথের রাস্তা জানা দরকার। শুধু একটি রাস্তা নয়; নদী, খাল-বিল দিয়ে যত দিকে বেরিয়ে যাওয়ার যত রাস্তা আছে সব জানা চাই। নৌকো বেয়ে নিয়ে যাওয়ার মত দলের লোক বাছাই ক'রে আনতে হয়। আক্রমণের ক্ষেত্রে অনেক রকম কাজ আছে; প্রত্যেকটি কর্ম্মীর ঝোঁক, আগ্রহ ও যোগ্যতা বুঝে তাকে সেই কাজে লাগাতে হবে। এমনি ধারা আরো বহুদিক আছে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর যার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হয়। শান্ত, স্থির, ধীর লোকের দ্বারা কাজ ভাল হয়; সাহসী কিন্তু চঞ্চল লোক সব ভণ্ডুল করে দেয়। সকল দিক বিবেচনা ক'রে

কাজ করে বলেই পুলিস অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতিক-হত্যা ও ডাকাতির কোনো কিনারা করতে পারেনি। বিউগ্‌ল্‌ বাজিয়ে বাজিয়ে তালে তালে কুচকাওয়াজ ক'রে যুবকগণ ঐ ধনী-মহাজনের বাড়ীতে যায়। মহাজনের পেয়াদা-পাইকরা গ্রামের একদল লোককে উত্তেজিত ক'রে ডাকাত ধরতে আসে।

একজন একটি ছোট্ট বক্তৃতা দিয়ে উত্তেজিত গ্রামের জনসাধারণকে শান্ত ক'রে দিল। স্বদেশীওয়ালাদের কাণ্ড বুঝে অনেকে নিঃশব্দে সরে পড়ল। যারা তারপরও লাঠি, ইট, শড়কী ছুঁড়ে মারছিল তা'দের মধ্যে দু'জন সামান্য জখম হতেই বাকী সকলে সরে পড়ল। বিউগ্‌ল্‌ বাজিয়ে জাতীয় ধ্বনি দিয়ে আমরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। এখানে ২৫,০০০ টাকা পাওয়া যায়।

ব্যর্থতার পর

যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহের আয়োজনে কর্ম্মতৎপরতা দেখা দিয়েছিল। বিদ্রোহ-চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হল। তারপর বাঙলার বিপ্লবী-সমিতিগুলি বে-পরোয়া সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ আরম্ভ ক'রে দেয়। একদিকে সরকারী দমননীতি, অন্যদিকে মুক্তিপ্রয়াসীর সন্ত্রাসবাদ নীতি পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে। কংগ্রেস তখন নিষ্ক্রিয়। প্রেসিডেণ্ট কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোষণা করেছেন: এখনো আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করার সময় আসেনি। কোনো কোনো নেতা সৈন্য-সংগ্রহ করার কাজে গভর্নমেণ্টকে তখন সাহায্যও ক'রছেন।

১৯১৫ সনের মার্চ মাসে ভারতরক্ষা আইন পাশ হয়। এই আইনে রক্ষণের নামে ভক্ষণের বিধান দেওয়া হ'ল। কত খানাতল্লাশ, গ্রেপ্তার, অত্যাচার, নির্য্যাতন, বিশেষ দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিলোপ ঘটেছে এই ভারতরক্ষা আইনের বলে।

আই. বি. পুলিস ইন্‌স্পেক্টার সুরেশ ব্যানার্জী একদিন সকাল বেলা হেদুয়ার মোড়ে ট্রামে উঠ্‌বার সময় বিপ্লবীর গুলিতে প্রাণ হারায়। মসজিদবাড়ী স্ট্রীটে এক বাড়ীতে পুলিস কর্ম্মচারীদের বৈঠকে গুলি চলে। পুলিস কর্ম্মচারীরা দৌড়িয়ে উপরতলায় যাওয়ার সময় যুবকগণ পিছু ধাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজন হত ও ২।৩ জন আহত হয়।

ময়মনসিংহে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যতীন ঘোষ মসার পিস্তলের গুলিতে নিহত হন। কলেজ স্ট্রীটে মেডিক্যাল কলেজের সামনে টিকটিকি (ডিটেক্‌টিভ) পুলিসের দারোগা মধুসূদন ভট্টাচার্য্যকে বেলা ১০টার সময় যুবকগণ হত্যা করে। ফুটপাথের চল্‌তি পথিকদের চোখের ওপর তারা নির্ব্বিঘ্নে কাজ সেরে চলে গেল।

বাঙলার আই, বি, বিভাগের বড়কর্ত্তা বসন্ত চ্যাটার্জীকে হত্যা করার চেষ্টা হয় প্রথমবার ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে, দ্বিতীয়বার কলকাতা মুসলমান পাড়া লেনে, তৃতীয়বার ভবানীপুরে। তৃতীয়বারে নামজাদা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সত্যি সত্যিই সর্ব্বাঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। আগে পাছে সশস্ত্র, সতর্ক প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়েও শেষ পর্য্যন্ত জীবনরক্ষা হ'ল না। লোকে বল্‌ত, বিপ্লবী-দলের ছেলেগুলি কি যাদু জানে? কেউ তাদের রোষ থেকে রক্ষা পায় না। বিকাল বেলা কলকাতার রাস্তায় কত লোক,—পাশেই একটা ফাঁকা জায়গায় ছেলেরা ফুটবল খেল্‌ছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং পিস্তল হাতে সতর্ক,—তাঁর রক্ষীদের হাতেও অস্ত্র। তবু তিনজনেই বিপ্লবীর গুলিতে প্রাণ হারাল। পূর্ব্বে তাঁকে লক্ষ্য করে দুটো বোমা ছোঁড়া হয়। তাতে তাঁর দেহরক্ষী ও আত্মীয় ১ জন মারা যায়। তারও পূর্ব্বে ঢাকায় গুলি করার ফলে তাঁর অনুচর মারা পড়ে, তিনি নিজে রক্ষা পান। এবার আর রেহাই পেলেন না। এই সম্পর্কে বাঙলার লাট বলেছিলেন, তিন-তিনবার চেষ্টা করে দুর্দ্ধর্ষ এনার্কিস্টরা একজন রাজকর্ম্মচারীকে হত্যা ক'রে যে একরোখামীর পরিচয় দিল তার যথোপযুক্ত প্রতিবিধান আবশ্যক। এরপর থেকে বিপুল উদ্যমে পুলিস জুলুম চলতে থাকে, অসংখ্য যুবক বন্দী হয়, অসংখ্য নিরীহ লোক পুলিসের টানা-হেঁচড়ায় লাঞ্ছনা ভোগ করে। অসংখ্য যুবককে মারধর, নির্য্যাতন ক'রে কথা আদায় করা হয়।

কঠোর নির্য্যাতনেও বিপ্লবীরা দমেনি। যুদ্ধের সময় ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সরকারী সাক্ষী, বহু আই. বি. পুলিস, গুপ্তচর কলকাতা ও মফস্বলে হতাহত হয়।

জোর করে ধনীলোকের অর্থ ছিনিয়ে নিয়ে বিপ্লবী-সমিতি সংগঠন এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য ক্রয় করা একটা সাধারণ নিয়মে দাঁড়িয়ে যায়। কলকাতার বুকের ওপর কিছুদিন পর পরই 'মোটর-ডাকাতি' হতে থাকে। পুলিস বিশেষ ব্যবস্থা করেও মোটর আরোহী স্বদেশী ডাকাতদের ধরতে পারেনি। সুচিন্তিত কার্য্যকরী প্ল্যান, উপস্থিতবুদ্ধি, গতির ক্ষিপ্রতা এবং ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার কৌশল তাদের ছিল। কলকাতার কর্পোরেশন স্ট্রীট, নদীয়ার শিবপুর ও প্রাগপুর, ত্রিপুরার হরিপুর ও করতালা, ময়মনসিংহের চন্দ্রকোণা, রংপুরের কুরুল (১৯১৫), ত্রিপুরায় গণ্ডোরা ও নাটঘর; ফরিদপুরের ধানুকটী; ময়মনসিংহের শইলদ (১৯১৬); ঢাকার আবদুল্লাপুর (১৯১৭) ইত্যাদির ডাকাতিগুলি উল্লেখ-যোগ্য। ১৯১৬ সালে ত্রিপুরা জেলায় "ললিতেশ্বর" ডাকাতিতে রাজসাহী কলেজের ছাত্র প্রবোধ ভট্টাচার্য্য মারা যায়। হাফ শার্ট, হাফ্ প্যাণ্ট পরিহিত গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ যুবকটিকে লোকে সাহেব ব'লে মনে করেছিল। কলকাতার বুকের ওপর যখন ক্রমাগত রাজনীতিক খুন-ডাকাতি হচ্ছিল—যখন বিদেশের যুদ্ধ আর স্বদেশের সন্ত্রাসবাদের উপর লোকের আশা-ভরসা, তখন জার্মানীর দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হ'ল—কলকাতায় অরাজকতা চল্‌ছে।

বিদ্রোহের চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যাওয়ার পর রাসবিহারী বসু দেশ ছেড়ে জাপানে পালিয়ে যান। শচীন সান্ন্যাল ও গিরিজাবাবু বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন। ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী প্রমুখ নেতারা বাঙলার বাইরে গিয়ে আত্মগোপন করে কাটান। অনুশীলন পার্টির

সর্ব্বজনপ্রিয় নেতা ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী উদ্যোগ পর্ব্বের প্রথমেই বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলায় দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামান জেলে প্রেরিত হন।

বিপ্লবী-বীর যতীন মুখোপাধ্যায়

যতীন মুখোপাধ্যায়ের অনুসন্ধানে বাঙলার পুলিস বালেশ্বর যায়; বিদ্রোহের প্রয়োজনে তিনি সে-অঞ্চলে তখন অবস্থান করছিলেন।

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ময়ূরভঞ্জ স্টেটের জঙ্গলে একদল বাঙালী যুবকের সঙ্গে মিলিটারী পুলিসের সংঘর্ষ হয়। পাঁচজন পিস্তল নিয়ে বহুক্ষণ অবধি প্রতিপক্ষকে হয়রাণ করে। পরে তারা পুলিস বাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। তারপরও চলে উভয় পক্ষে গুলি। অনেকে হতাহত হয়। বিদ্রোহী দলের নেতা যতীন মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহকর্ম্মী চিত্তপ্রিয় রায় বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে শত্রুর গুলিতে জীবন বিসর্জ্জন করেন (৯ই সেপ্টেম্বর)। অপর তিন জন আহত হয়ে বন্দী হয়,—দু'জনের ফাঁসী হয়, একজন আন্দামানে পাগল হয়ে পাগলা গারদে মারা যায়। দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনের জন্য পাঁচটি অমূল্য জীবনের এমনি ক'রে অবসান হল। একদল সশস্ত্র যুবক নিয়ে বিপ্লবী বীর যতীন মুখোপাধ্যায়ই বাঙলায় প্রথম সংগ্রাম করেন সশস্ত্র পুলিসের বিরুদ্ধে। বিপ্লবী নেতা যতীন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু দেশের কর্ম্ম-প্রাণ যুবকদের কাছে জীবনের সাড়া নিয়ে আসে। অপর একনেতা নরেন ভট্টাচার্য্য জাভা থেকে আমেরিকায় পালিয়ে যান। বিপিন গাঙ্গুলী আগরপাড়া ডাকাতিতে রিভলভার সহ ধরা পড়েন।

মালদহ

মালদহে মহানন্দার তীরে এখনো বেড়াই—রাজনীতির কথা আলোচনা করি। জেলার সর্ব্বত্র ছাত্রদের স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে সংঘবদ্ধ করাই আমার কাজ। মালদহে সন্ত্রাসবাদমূলক হাঙ্গামা ছিল না বলে ওখানে অস্ত্র রাখার গুদাম করা হয়। বাইরে থেকে এনে বিশ্বস্ত ও সাহসী ছেলেদের বাড়ীতে এইসব "জিনিস" রাখা হত। পিস্তল, রিভলভার, কার্ত্তুজ ইত্যাদিকে আমরা 'জিনিস', বলতাম। মসার পিস্তল দেখে একটি ছেলে একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সুন্দর কারুকার্য্য খচিত আয়নার মত স্বচ্ছ, মসৃণ ও ঝক্ঝকে এ অপূর্ব্ব জিনিসটি কি? এরই নাম মসার পিস্তল শুনে যুবকটি বিস্মিত হয়েছিল এবং বলেছিল, এমন সুন্দর জিনিস এত বড় ধ্বংসকর হতে পারে কি? মালদহ জেলার বিপ্লবী-সংগঠন তখন উত্তর বঙ্গে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। এ-সংগঠনের কাজে জেলার সর্ব্বত্র ঘুরতে হয়েছিল—কাটিহার, রাজমহল, পাকুড়, বহরমপুর প্রভৃতি পাশ্ববর্ত্তী স্থানেও যাই। যুবক বন্ধুদের নিয়ে কখনো কখনো গৌড় পাণ্ডুয়ার অতীত ধ্বংসাবশেষ দেখতে যেতাম। আলালের জমিদার পুত্রের সঙ্গে একবার হাতী চড়ে পাণ্ডুয়ায় যাই। আমার সঙ্গে ছিল মসার পিস্তল। মনে পড়ছে এই পিস্তল দেখে সে ব'লেছিল, এ পিস্তলে কোনই কাজ হবে না। আমি খাপের ভেতর থেকে পিস্তলটি বার ক'রে তার বাঁটের হুকের সঙ্গে খাপটি লাগিয়ে যখন মসার রাইফেল ক'রে কাঁধে তুলে নিলাম, তখন সে অবাক হ'য়ে গিয়েছিল। পরে এই ছেলেটি মালদহ জেলার স্কুলের হেডমাস্টারকে হত্যা করার অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। হেডমাস্টার বাবুকে পুলিসের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করা হত। তিনি আই. বি. পুলিসের সঙ্গে পরামর্শ করে স্কুল-

পরিচালনা করতেন, স্কুলের ছেলেদের পকেট ও বই-পত্র তল্লাশ করতেন। প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে এমন একটি ছাত্রের পকেট থেকে তিনি "Tilak's Speeches" (তিলকের বক্তৃতাবলী) নামক একটি বই পান। হেডমাস্টার বাবু ছাত্রটিকে ১০ ঘা বেত্র দণ্ডের আদেশ দেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে ছাত্রটিকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করার সুপারিশ করেন। হোস্টেলে কড়াকড়ির আর অবধি ছিল না; ছাত্রদের উপর নজর রাখার জন্য হেডমাস্টার বাবু তাঁর নিজস্ব ছাত্র-গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে কুমিল্লা জেলা স্কুলের হেডমাস্টারকে অনুরূপ কারণে হত্যা করা হয়। মালদহ স্কুলে বা জেলায় ছাত্রদের কোনো সংঘ-সমিতি ছিল না। শহরে কোনো রাজনীতিক সংগঠন ছিল না। বৈধ উপায়ে কোনো আন্দোলন ক'রে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন করার কোনো পন্থা না থাকায় সন্ত্রাসবাদ স্বাভাবিকভাবে আত্ম-প্রকাশ করে। পশ্চিম মালদহের বাচামারী, ন'ঘরিয়া, রতুয়া প্রভৃতি স্থানে ছোট ছোট গুপ্ত-সমিতি ছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের আধা বাঙলা আধা হিন্দি ভাষার মিশ্রিত কথা শুনতে বেশ কৌতুক হত। সাধারণ লোকের কোনো রাজনীতিক চেতনা ছিল না।

বরিশাল

ক'লকাতা থেকে আমাকে বরিশাল জেলার এক পল্লীগ্রামের মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার জন্য পাঠানো হয়। উত্তর সাবাজপুর ও ইদিলপুরে দল-গঠনের কাজ তার আনুষঙ্গিক। কয়েকমাসের মধ্যেই পুলিস গোপনে আমার নামধাম খোঁজ করে গেল। আমার কানেও সে গোপন খবর এল। তখন আর সেখানে থাকা সমীচীন মনে করিনি। গুপ্ত-সমিতির আমি গোপন-কর্ম্মী—ফেরারী আসামী। আমার নাম-ঠিকানা

সবই কল্পিত। চলে গেলাম বরিশাল শহরে। সেখানে তখন কোনো ভারপ্রাপ্ত লোক নাই ; জেলার কার্য্য পরিচালনভার আমার উপরই এসে পড়ে। কলেজের অগ্রণী ছাত্রদের মধ্যে আমাদের প্রভাব ছিল। কোনো কোনো গ্রামের গৃহস্থ ভদ্রলোক ও ছাত্রদল আমাদের সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মালদহ অপেক্ষা এখানে জনসাধারণের রাজনীতিক চেতনা বেশী,—ছাত্র ও যুবকদের স্বদেশ-প্রেম ছিল গভীর, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা উন্নততর। এখানে 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' দুটি দলেরই অস্তিত্ব ছিল। বরিশালে ছিল তখন ধর্ম্মাশ্রমের প্রাবল্য। যুবকরা কোনো না কোনো ধর্ম্মাশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেবা-শুশ্রূষা করে। বিপ্লবী যুবকগণও মঠ, আশ্রম বা রামকৃষ্ণমিশন অবলম্বন ক'রে সেবা-সমিতি পরিচালন করত। ব্যায়ামচর্চ্চা ও বিবেকানন্দের বই পড়ায় ছেলেদের ঝোঁক ছিল খুব। অশ্বিনী দত্ত ও জগদীশ মুখার্জী তখন ওখানকার আদর্শ ব্যক্তি। গুপ্তসমিতি ছাড়া কোনো প্রকাশ্য রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। শিক্ষিত জনসাধারণের মনে মধ্য-যুগীয় চিন্তাধারা প্রভাব বিস্তার করেছিল ; স্বাধীনতা ছিল সবারই কাম্য।

বরিশাল জেলা থেকে আমি মাদারীপুর, বাগেরহাট ও খুলনায় সংগঠন বিস্তার করতে যাই। বরিশাল জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে যুবক দল গঠন করেছি, বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা বিতরণের ব্যবস্থা করেছি, অস্ত্রাদিও কোনো কোনো স্থানে লুকিয়ে রেখেছি কিন্তু সবই গোপনে, লোক চক্ষুর অন্তরালে করতে হয়েছে। পুলিস আমার কোনো হদিস পায়নি। শব্দ যোজনা ও সাঙ্কেতিক কথা দিয়ে কোড (code) তৈরী ক'রে চিঠি-পত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। এতে পুলিসের পক্ষে ধরা কঠিন। নিতান্ত গো-বেচারী অথচ বিশ্বাসী লোকের নামে চিঠি আনাবার

ব্যবস্থা করা হত। ছাত্র ও যুবকগণ গুপ্ত-সমিতির সংস্পর্শে আসার জন্য ও গুপ্ত-সমিতির কাজ করার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করত। আমরা যেখানে গিয়েছি সেখানেই যুবকগণ আমাদের সাদরে গ্রহণ করেছে এবং তারই ফলে আমাদের কাজের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা হ'ত। ১৯১৭ সালের প্রথম ভাগে বরিশাল ছেড়ে কলকাতায় যাই। সরকারী নিষ্পেষণ নীতির প্রয়োগে আমরা ব্যতিবস্ত হয়ে উঠি। কলকাতায় যুবকদের বাসা ভাড়া পাওয়া কঠিন হয়ে উঠল। শেষ পর্য্যন্ত বরিশাল থেকে একটি ভদ্র-পরিবার আনিয়ে বাসা করান হয়—আমরা তাদের সঙ্গে তাদের বাড়ীতে থাকতাম। বিনায়ক রাও কাপলে নামক এক মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবী যুবকও সেখানে আমাদের সঙ্গে ছিল। পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশের বিদ্রোহের আয়োজনে তার খুব উৎসাহ ছিল। পশ্চিমাঞ্চল থেকে নিরাপত্তার জন্য তাকে বাঙলায় আনা হয়।

উল্টাডিঙ্গীর বাসায় বসে বসে প্রায়ই আমরা নানারকম রাজনীতিক আলোচনা করতাম—সমাজতন্ত্র ভাল কি নৈরাজ্যতন্ত্র (এনার্কিজম) ভাল। বাকুনিনের মত শুনে নৈরাজ্যতন্ত্রই আমার ভাল লাগে। কোনো শাসক-শক্তি ও শাসন-যন্ত্র থাকবে না এমন সমাজ-ব্যবস্থাই আদর্শ বলে মনে হয়েছিল। একজন নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী বললেন, "স্বাধীনতাই নাই, এখন তন্ত্র দিয়ে কি হবে?" মার্কসের নাম তখনো শুনিনি।

দেশ স্বাধীন হলে আমরা কি করব এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হত, বিপ্লব জয়ের পর আমরা জাতীয় গবর্নমেণ্টের সেনাবিভাগে প্রবেশ ক'রে দেশ-রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করব। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর লোকের দুঃখকষ্ট যে আর থাকবেই না সে-সম্বন্ধে আমরা কোনই সন্দেহ পোষণ করতাম না। পাশ্চাত্যদেশের মত কল-কারখানা ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হলে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। ধনীর ধন-সম্পদ ন্যায্যভাবে বিতরণ

করার ধারণা আমাদের ছিল; আমরা এটা ভারতের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। স্বদেশী যুগে বিপ্লবীনেতা অরবিন্দ ঘোষ পাশ্চাত্য ধনতন্ত্র-বাদের বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি লিখেছেন। পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আমরা ঘৃণা করতাম। বলতাম, স্বাধীন ভারতে এমনটি হবে না।

গৌহাটির পাহাড়ে লড়াই

১৯১৭ সালে সরকারী নিষ্পেষণ চরমে উঠেছে। হাজার হাজার যুবক ভারতরক্ষা আইনে আটক ও নির্ব্বাসিত ; শত শত যুবক কারাগারে, দ্বীপান্তরে। দৈনিক খানাতল্লাশ ও গ্রেপ্তার,—ফেরারীর সন্ধানে যথা-তথা পুলিসের হানা। বিপ্লবীদের দূর-আত্মীয়-স্বজনও জুলুম, অত্যাচার, ভীতির কবল থেকে রক্ষা পায় না। আমার আত্মীয়-স্বজনও আমার জন্য লাঞ্ছিত হতে লাগল, যদিও আমি প্রায় চার বৎসর বাড়ীছাড়া, আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্ক বর্জ্জিত। একবার আমার নিজ গ্রাম মাধবদীর কাছে কোনও গ্রামে স্বদেশী ডাকাতি হয়। ঢাকা ও নরসিংদীর পুলিস আমার বাড়ী তন্ন তন্ন ক'রে তল্লাশ করে—ঘরের জিনিসপত্র ভেঙে চুরে সবকিছু তছ্‌নছ্‌ করে দেয় এবং ইতর ভাষায় আমার বাবা ও অন্যান্য সকলকে গালাগালি করে। গ্রামের ভদ্রলোকদেরও পুলিস অপমান করে। তখন আমি দেশছাড়া। উত্তর বঙ্গে থাকি। দেশের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখি না।

পুলিসের গুপ্তচর পথে-ঘাটে, মেসে, স্কুল-কলেজে, ছাত্রাবাসে—সর্ব্বত্র। ছাত্র, শিক্ষক, রাস্তার মোড়ের পান-বিড়িওয়ালা, জংসন স্টেশনের হোটেলওয়ালা টাকা খেয়ে পুলিসকে সংবাদ দেয়। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের জোর কমে আসছে ভারতরক্ষা আইনের কঠোর

প্রয়োগে। হ্রাস পেয়েছে ভীরু স্বভাবের ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির নৈতিক শক্তি।

এমন সঙ্কটকালে পুরানো বিপ্লবী কর্ম্মীদের বাঙলায় থাকা আর চলে না; তাই আসামের গৌহাটিতে থাকার একটা আড্ডা করা হয়। অনুশীলন দলের সব সেরা কর্ম্মীরা ওখানে থেকে বাঙলায় আন্দোলন ও সংগঠন পরিচালিত করতেন। ডিসেম্বর মাসে আমি সেখানে যাই। সোজা পথে না গিয়ে হাওড়া থেকে মোকামাঘাট, মুঙ্গের, কাটিহার হয়ে লালমনির হাট জংসন দিয়ে আমীনগাঁয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে গৌহাটিতে পৌঁছি।

গৌহাটিতে আমরা ভাগ হয়ে ছিলাম দুটি বাড়ীতে; আমরা যে একই দলের লোক অন্যে যাতে তা বুঝ্‌তে না পারে সেদিকে আমরা সতর্ক ছিলাম। আসামের বিভিন্ন জেলায় কিছু কিছু সংগঠনের চেষ্টাও হয়। বিশেষ বিশেষ কর্ম্মীকে বাঙলাদেশ থেকে ডেকে এনে পরামর্শ আলোচনা হ্ত। ওখানে আমরা সাধারণ ব্যবসায়ী রূপে বাস করতাম। স্বহস্তে রান্না করে খাওয়া-দাওয়া করি। প্রত্যেকে আমরা দুটি ক'রে কম্বল ব্যবহার করি। একটি পেতে শোয়া অপরটি গায়ে দেওয়ার জন্য। আসামের দারুন শীতে অবশ্য এ মোটেই পর্য্যাপ্ত ছিল না। কিন্তু আমরা তাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। বিপ্লবীর আরাম সাজে না। কম্বল, গেঞ্জী, শার্ট ও একটি আলোয়ান আমাদের পোশাক; মাথার তলে একটি বালিশও ছিল না। তা ছাড়া পান, বিড়ি, সিগারেট বা চা-পানের কোনো বালাই ছিল না। বিপ্লবী-জীবন আরাম-উপভোগের জীবন নয়। রাণা প্রতাপের ঘাসের রুটি খেয়ে মরু-প্রান্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের দৃষ্টান্ত আমাদের মনে গাঁথা ছিল। অতি সাধারণ ভাবে দিন অতিবাহিত করতে আমাদের কোনো কষ্ট হত না। এমন

অনেক দিন গেছে যখন দুবেলা পেট ভরে খাওয়া জুটেনি—আবার পকেটে টাকা থাকা সত্বেও খরচ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সকালে বা বিকালে জলখাবার কিনে খাইনি। গৌহাটিতে অভাবের সময় আমরা কোনো কোনোদিন সস্তা কমলালেবুর রস খেয়ে কাটিয়েছি।

পুলিসের আক্রমণ আশঙ্কায় প্রতি রাত্রিতে আমরা পালা করে পাহারা দিতাম। কাঠের বাড়ীর দোতালায় বাসা। সেদিন রাত্রিতে আমার পাহারা দেবার পালা। পাঁচ-ছ' জন বন্ধু গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে মসার পিস্তলটি হাতে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। খুব শীত। ঘণ্টাখানেক স্থির হয়ে বসে আছি। কত কথা মনে আসে। মনটা ভারাক্রান্ত। জেল খেটে এসে আজ প্রায় পাঁচ বৎসর অবধি এই ছন্ন-ছাড়া জীবন। থাকার কোনো ঠিকানা নেই—কাপড়-জামাও নিজস্ব বলে কিছু নেই, বিছানা নেই। কত জায়গায় ঘুরলাম, কত নাম-ধাম পরিবর্ত্তন করলাম; শিক্ষক, গৃহশিক্ষক, কম্পাউণ্ডার, দোকানদার, ব্যবসায়ী, নৌকোর মুসলমান মাঝি ইত্যাদি কত না বিভিন্নরূপে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে রয়েছি—শুধু একটি মাত্র উদ্দেশ্য—'দেশের স্বাধীনতা।' ভারী ভাল লাগে এ জীবন! আনন্দ মঠের 'সন্তান'দলের মত বিদ্রোহীর দল, বাড়ী-ঘর, স্ত্রী-পুত্র ও স্বজনবর্গ—সব ছেড়ে আসা অপূর্ব্ব এ জীবন। কাজ—কেবল কাজ। রোদ-বৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে যায়—শীত-গ্রীষ্ম দেহের উপর দিয়ে যায়। দিনগুলি ফর্ত্তিতেই কাটে। জীবনে অসাধ নাই, ভয় নাই মরণেরও।

শিবাজীর মাউলী সেনা, রাণা প্রতাপের রাজপুত সেনা, গুরু গোবিন্দের শিখ সেনা এমনিভাবে সর্ব্বত্যাগী হয়েই স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল। ইওরোপেও কার্ব্বনারী দল, জেকোবিন দল, সিনফিন ও

নিহিলিস্টরা দেশের কল্যাণের জন্য অসীম বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে। আমাদের চেষ্টাই বা সফল হবে না কেন? এও ঠিক যে, আমাদের অনেক সহকর্ম্মী আজ কারাগারে দ্বীপান্তরে। ইংরাজ আমাদের সংগঠন দুর্ব্বল করে দিয়েছে—লোকবল, অর্থবল এবং অস্ত্রবল, সব আমরা প্রায় হারাতে বসেছি। তবু তো এটা ধ্রুব সত্য যে, মহৎ উদ্দেশ্য কখনো ব্যর্থ হয় না, সত্য পথের সাধনা কখনো বিফল হয় না। শেষ জয় আমাদের হবেই। ভাবছিলাম এইসব কথাই। দৃষ্টিটা ঠিক ছিল বাইরের দিকে। আমার চিন্তার স্রোত রুদ্ধ হয়ে গেল একটা ব্যাপারে। অকস্মাৎ একটা লোক দ্রুতগতিতে অন্ধকার পথ দিয়ে হেঁটে গেল—টর্চের আলোটা মুহূর্ত্তের জন্য জানালার ওপর—আমার চোখের ওপর ফেলে গেল। কে এই লোকটা? রাত্রির সাধারণ কোনো পথিক না আর কিছু! পিস্তলটা সজোরে চেপে ধরি। নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি। নিদ্রিত বন্ধুদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস শোনা যাচ্ছে। আরো একটা কালো মানুষ যেন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেল—তারপর আরো একটি। ভীষণ শীতের মধ্যেও শরীরের জমাট-রক্ত গরম হয়ে উঠে। আমার চোখের পলক আর পড়ে না। ঘোড়ায় আঙুল বসিয়ে পিস্তলটি জানালার দিকে উঁচিয়ে ধরি। সব চুপচাপ। উঠে গিয়ে এক নিদ্রিত বন্ধুর কপালে হাত বুলাতেই সে জেগে গেল। চকিতে মাথার তলা থেকে রিভালভারটা টেনে নিল বজ্রমুষ্টিতে। আস্তে আস্তে বলি, 'পর পর তিনটা লোককে সন্দেহজনকভাবে যেতে দেখলাম্—আপনারা ঠিক থাকুন; কি জানি কি হয়।' হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'স্বপ্ন দেখেননি তো?' আমি হেসেই জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ স্বপ্নই বটে তবে জেগে—চোখ চেয়ে।' দারুন শীতের মধ্যে আরাম ছেড়ে তারা উঠে দাঁড়াল যে যার হাতিয়ার নিয়ে। রাত্রি প্রভাত হ'তে আর বিলম্ব নেই কিন্তু

কুয়াশার আঁধারে সব ঢাকা। অকস্মাৎ দূরে বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ শোনা গেল।

নিকটবর্ত্তী আর একটি বাড়ীতে অন্য কয়েকজন বন্ধু বাস করেন, আক্রমণটা তাদের উপর। অনতিবিলম্বেই এ বাড়ীও যে পুলিস ঘেরাও করবে তা নিঃসন্দেহ। আমরা তখনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়াই স্থির করি। ভোর হয়-হয়—কুয়াশাচ্ছন্ন পথে দশ হাত দূরের লোকটিও দৃষ্টির অন্তরালে। অসমিয়া পুলিস বন্দুক কাঁধে অন্য বাড়ীটি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সকাল হলেই বাড়ীতে প্রবেশ করার ইচ্ছা। তারা বোধ হয় ভেবেছিল, বাঙালী সন্ত্রাসবাদীরা একটু ঘুমিয়ে নিক, পরে ধীরে সুস্থে তাদের বন্দী করা যাবে। যুবকগণ কিন্তু তাদের শেষ রাত্রির প্রহরীর কাছ থেকে পুলিসের আগমনবার্ত্তা জেনে যায়। বাইরে সশস্ত্র পুলিস-বেষ্টনী,—ভিতরে ৭।৮ জন ভয়ঙ্কর বিপ্লবী, —যাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা আছে। চুপে চুপে তারা সাহসের সঙ্গে বেরিয়ে পড়াই স্থির করল। তখনো প্রভাতের আলো রাত্রির মলিনতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি—ঘন কুয়াশার মাঝে তারা সকলে অকস্মাৎ একযোগে পিস্তল ফায়ার ক'রে দ্রুত-গতিতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কুয়াশার মাঝে এই আকস্মিক অভিযানে পুলিস প্রথমটা হকচকিয়ে যায়—ছত্রভঙ্গ হয়ে একটু দূরে হটে যায়। পরক্ষণেই ফিরে এগিয়ে এসে আন্দাজে বন্দুক ছুঁড়তে শুরু করে দিল। বিপ্লবীরা তখন দূরে কুয়াশার অন্তরালে। একটি যুবকের পায়ে গুলি লাগায় সে পড়ে যায়, পরক্ষণেই আবার উঠে কামাখ্যা পাহাড়ে ছুটে যায়। পরে সেখানেই গ্রেপ্তার হয়।

গৌহাটির নিকটবর্ত্তী জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে দু'বাড়ীর যুবকদল মিলিত হয়েছে। আজ আমরা ঘরছাড়া। সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি। শহরের

পথে, ব্রহ্মপুত্রের ধারে এবং পাহাড়ের গায়ে অনুসন্ধানরত সশস্ত্র পুলিস বাহিনী। গৌহাটি, আমীনগাঁও, কামাখ্যা, পাণ্ডুঘাট রেলস্টেশনেও পুলিসের সতর্ক পাহারা। রেলযাত্রীদের লাঞ্ছনার আর অবধি নাই। এ অবস্থার মধ্যেও নামজাদা এক বিপ্লবী গৌহাটি স্টেশন থেকে কলকাতার দিকে রওনা হন। তাঁর বয়স, বিশাল সুন্দর দেহাবয়ব এবং গৌরবর্ণ কান্তি দেখে তাঁকে ছন্ন-ছাড়া বিদ্রোহীদেরই একজন মনে করা কঠিন ছিল। তিনি প্রথম শ্রেণীর প্যাসেঞ্জার হয়ে পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে চলে যান।

আমি ও অপর একজন বন্ধুসহ ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে দূরবর্ত্তী এক ছোট স্টেশনে হেঁটে গিয়ে গাড়ীতে উঠি।

হেঁটে যাওয়ার সময় পথে পথে লোকের গল্প শুনি,—'কলকাতার বহু বাঙালী যুবক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এখানে আত্মগোপন করে ছিল, আজ তারা দুর্জ্জয় সাহসের সঙ্গে পুলিসের ওপরে গুলি ছুঁড়ে চলে গেছে। কে জানে কত লোক মরেছে। স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গে কেউ পারে না।' উভয় পক্ষের গুলির শব্দে গৌহাটি শহর চঞ্চল ও সন্ত্রস্ত। নানা রকম গুজবে শহর সরগরম।

বিকাল বেলা একজন অল্পবয়স্ক যুবককে সাধারণ গো-বেচারী সাজিয়ে খাবার আনার জন্য পাহাড় থেকে শহরে পাঠানো হয়েছিল। সে খাবার নিয়ে যখন ফিরলো তখন বেলা শেষ। সকলেই ক্ষুধার্ত্ত। খাবার মুখে দেবে এমন সময় পাহাড়ের ঢালু গা থেকে বন্দুকের আওয়াজ হ'ল। যুবকগণ চেয়ে দেখে, নীচে পশ্চিম দিকে অসংখ্য পুলিস—সোনালী সূর্য্যকিরণে তাদের কাঁধের উপর বেয়নেট ঝক্‌মক্ করছে। খাওয়া আর হ'ল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে যে যার অস্ত্র নিয়ে উঠে দাঁড়াল। যুবকগণ উপরে, পুলিস নীচে। উপর থেকে যুবকগণ ক্রমাগত পাথর

ছুঁড়ে মারে,—নীচে থেকে পুলিস রাইফেল ফায়ার করে। মাঝখানে বহু গাছ-পাথরের ব্যারিকেড। যুবকগণ ধরাধরি করে একটি প্রকাণ্ড পাথর নীচের দিকে ঠেলে ফেলে দিল। পুলিস এবার সরে গিয়ে পাহাড়ী-গাছের আড়ালে আত্মরক্ষা করে। এর পর পুলিস নিজেদের অসুবিধা বুঝে উপরে উঠতে সাহস পেল না। কিন্তু ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। ক্রমে সন্ধ্যাব গাঢ় অন্ধকার নেমে এল; বিপ্লবীরা ধীরে নিঃশব্দে পাহাড়ের গা ঘেঁষে নীচে উপত্যকায় নেমে গেল। আবার চড়াই। উপায় নাই; এগুতেই হবে। আজ আর এখানে থাকা চলে না। চলে যেতে হবে দূরে—শত্রুর এলাকার বাইরে। সারা দিন উপবাস। এই শীতের রাতে অচেনা দুর্গম পথে তাদের যাত্রা। সারা রাত চড়াই উৎরাই পার হয়ে মনে হ'ল—অনেক দূর এসে পড়েছে। পূর্ব্বাকাশ ফরসা দেখা যায়। এবার নিরাপদে খাওয়া ও বিশ্রাম করা যাবে। তরুণ যুবক নলিনী বলেছিল—'মনে পড়ে পুণা পাহাড়ে মাউলী সৈন্যের কথা—প্রবলপ্রতাপ মোগল বাদশার বিরুদ্ধে শিবাজীর অভ্যুত্থান—পাহাড়ে পাহাড়ে গেরিলা যুদ্ধ।' অন্য এক যুবক উত্তরে দু'লাইন কবিতা আউড়ে ছিল :

'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন
আসিবে সেদিন আসিবে...

ভোরবেলায় পাহাড়ের ওপাশ দিয়ে তুমুল শব্দ করে রেলগাড়ী চলে গেল। বিদ্রোহী যুবকগণ বিস্মিত ও চিন্তিত। সারা রাত হেঁটে তারা বেশী দূর এগোয়নি—অদূরেই গৌহাটি শহর। সারাদিন এখানে চুপ ক'রে থাকাই স্থির হ'ল; আবার রাত না এলে কোনো দিকে যাওয়ার উপায় নেই। সারাদিন শুয়ে, বসে ও ঘুমিয়ে কাটল। মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপরে উঠে পুলিসের গতিবিধি লক্ষ্য করে। দুপুরে গত

কালের সঞ্চিত খাদ্য যেটুকু ছিল তা সকলে ভাগ ক'রে খেয়ে নেয়। নিকটবর্ত্তী ঝরণা থেকে অঞ্জলী ভরে জল পান ক'রে তারা তৃষ্ণা নিবারণ করে। অকস্মাৎ অপরাহ্ন বেলায় পাহাড়ের উপরিভাগে পুলিসের আবির্ভাব,—সংখ্যায় ৩০।৩৫ জন—কারুর হাতে বন্দুক, কারুর হাতে রেগুলেশন লাঠি। এসেই তারা গুলি চালায়। আমাদের যুবকগণ বড় একটি পাথরখণ্ডের আড়াল থেকে প্রত্যুত্তর দিল—কিন্তু তাদের পিস্তলের গুলি পুলিসের কাছে পৌছয় না। অবস্থা সঙ্কটজনক। উপত্যকা পেরিয়ে অন্য একটি পাহাড়ের উপরে উঠে দাঁড়ানোর সংকল্প ক'রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। পরক্ষণেই একজন চেঁচিয়ে উঠল: 'ও, ওদিকেও তো পুলিস,—ওই যে রোদে ওদের কাঁধের উপর বেয়নেটগুলো ঝক্‌মক্ করছে।'

হ্যাঁ, পুলিস তো বটে! ...

নিরুপায় হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লড়া-ই সকলের মত। ধীরে ধীরে ফায়ার করতে করতে পুলিস ও সার্জেণ্টের দল পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমে আসছে নীচে—বিদ্রোহীদের কাছে। কখনো চীৎকার করে বলছে, "Hands up!"..."Surrender!" এদিক থেকে মাঝে মাঝে ত্ব'-একটি পিস্তলের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো উত্তর নেই। ক্রমে পুলিস আরও কাছে এসে পড়ে। যুবকরা বড় বড় পাথর টুকরো ছুঁড়ে মারতে তখন উদ্যত। অকস্মাৎ একটি গুলি এসে যুবকদলের নেতার পা ভেঙে দিয়ে গেল। তিনি সেখানেই পড়ে গেলেন। বিদ্রোহীদের গুলি প্রায় নিঃশেষ। গেল ত্বদিনের ক্রমাগত গুলি চালনায় বুলেট ফুরিয়ে গেছে। আজ কিছুক্ষণ পর পর একটি ত্বটি গুলি চালিয়ে প্রায় ত্ব'ঘণ্টা অবধি প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে টিকে আছে। পুলিসদল এতক্ষণ কাছে আসতে সাহস পায়নি। এখন তারা এদের ত্বর্ব্বলতা বুঝতে পেরেছে—অসমিয়া পুলিস তাই নির্ভয়ে এগিয়ে আসছে—বড় বড় লাঠি উঁচিয়ে আসছে তারা। এদিকে পাথর

ছুঁড়ে মারে, ওরা চালায় লাঠি। ক্রমে আরো কাছাকাছি—উভয় পক্ষে শুরু হ'ল মারামারি ধ্বস্তাধ্বস্তি। পুলিসের লাঠির ঘা পড়ে যুবকদের ওপর—যুবকরা পিস্তলের বাঁট দিয়ে পুলিসকে আঘাত হানে। পিস্তল কেড়ে নিয়ে তু'তিন জনকে যখন হাতকড়ী দিয়ে বন্দী করেছে, বাকী চারজন তখনও গাছের ডাল ও পাথরটুকরো নিয়ে মারামারি করছে, তাদের সর্ব্বাঙ্গে রক্ত—আঘাতের চিহ্ন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ—পাহাড় নিস্তব্ধ—যুবকদের হাতে হাতকড়ী। আহত যুবকদের নেতা প্রখর দৃষ্টিতে কলকাতার পুলিস কর্ম্মচারীর দিকে তাকিয়ে আছে; বন্দী বন্ধুদের দিকে সকরুণ দৃষ্টি। মারামারি ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে যে তুর্জন সরে পড়েছিল তা কারুর খেয়াল হয়নি। একজন পুলিস বলে উঠল তুজন ওদিকে ভেগে গেছে। তখনই একদল পুলিস ছুট দিল তাদের ধরার জন্মে। চারদিকে খোঁজাখুঁজি কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ। মারামারির হট্টগোলে তারা বন্ধুদের ইঙ্গিতে সরে পড়েছে।

বিপ্লবী নলিনী বাগচীর জীবনাহুতি

নলিনী বাগচী ও প্রবোধ দাসগুপ্ত—তুটি যুবক চড়াই উতরাই অতিক্রম করে পাহাড়ে বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দ্রুত গতিতে অনেক দূর চলে গেল। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় এক ঝোপের মাঝে বিশ্রামের জন্য তারা বসেছিল। এতক্ষণ তারা ছুটে চলেছে—কেবলই চলেছে। পিছনপানে ফিরে তাকায়নি। এবার বিশ্রাম। সারাদিনের শ্রান্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা তাদের তুর্ব্বল করে ফেলেছিল। দেহ তাদের এলিয়ে পড়ে ওখানকার ঐ রুক্ষ পত্রশয্যায়। অল্পক্ষণেই তারা গভীর নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ে। ভোরে ঘুম থেকে জেগে উভয়েই সমস্ত মাথায় তীব্র বেদনা অনুভব করে। এক রকম বিষাক্ত পোকা রাত্রিতে ছুটবার সময় তাদের

মাথায় কামড়ে ধরেছিল—পোকাগুলি তখনও মাথায় কামড় দিয়েই ছিল। কিছুতেই টেনে বার করতে না পেরে ছুরি দিয়ে একজন অপরের মাথা থেকে পোকাগুলো কেটে ফেলে দেয়। গাছের শিকড় ধরে উপরে উঠবার সময় তাদের হাত পা ও বুক ছড়ে যায়—সর্ব্বাঙ্গে রক্তের দাগ—হাতের তালু থেকে একটু একটু রক্ত তখনও চুইয়ে বের হচ্ছিল। তারা অবসন্ন।

কিন্তু বসে থাকার সময় নেই। এখানেও বিপদ ঘটতে পারে। দূরে —আরো দূরে যেতে হবে। তারা রেললাইন ধরে চলে। দুদিকে পাহাড়। পা আর চলে না। শরীর অবশ। কিছু দূর গিয়ে এক পল্লীর সন্ধান পাওয়া গেল। নলিনী নিজেদের অসমিয়া ব'লে পরিচয় দিয়ে অসমিয়া ভাষায় কথা বলে কিছু চিড়া গুড় সংগ্রহ করে ও জলে ভিজিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খায়। খেতে খেতে সেখানে গল্প শুনল যে, গৌহাটিতে ভীষণ খুনোখুনি চলেছে। বাঙালী স্বদেশীওয়ালারা কলকাতা থেকে এখানে এসেছে সাহেবদের খুন করতে। উভয় পক্ষেই গুলি চলেছে—হতাহত হয়েছে। আসামের শান্তি নষ্ট করলে ওই ছেলেগুলো। একজন বললে, না রে—ওরা আমাদের সকলের ভালোর জন্যই এ-কাজে ব্রতী হয়েছে।—নলিনী ও তার সাথী সোজা পথ ছেড়ে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী পথ ধরে চ'লল। সারাদিন হেঁটে রাত্রিতে আবার পাহাড়ে আশ্রয়। প্রকাণ্ড গাছের তলায় একটা পাথরের নীচে ওরা নিদ্রামগ্ন। রাত দুপুরে বাঘের ডাক শুনে বিভ্রান্ত হয়ে জেগে উঠেই রিভলভার দুটি হাতে নিয়ে উভয়ে উঠে দাঁড়াল। এ অস্ত্রে বাঘ মরে না—তা তারা জানে। তবু নির্ব্বিরোধে বাঘের মুখে যেতে নারাজ। কিছু না দেখে চুপি চুপি গাছে উঠে পড়ে। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। গাছে উঠে এলে বাঘের মাথা লক্ষ্য করে দুজনে দুটো গুলি ছুঁড়বে এমনই সঙ্কল্প। বে-কায়দায় পড়ে বাঘ ফিরেও যেতে

পারে। আবার বাঘের ডাক। তাদের বুক কাঁপে। পুলিসের হাত এড়িয়ে এসে মরতে হবে কি শেষে বাঘের মুখে—ভাবে তারা। নলিনী একটু হাসে, প্রবোধ চুপ করতে বলে। বাঘ কি জানি কেন সরে পড়ল। দূরে গর্জ্জন শোনা গেল। বাকী রাতটুকু তাদের গাছেই কাটল। তৃতীয় দিন ভোরে উঠেই আবার চলা শুরু হ'ল। একটা রেল স্টেশনে পশ্চিমা কুলিদের কাছে ছাতু পাওয়া গেল। তাই দিয়ে সেদিনের ক্ষুধা মিটান হ'ল। চেহারা এবং পোশাক কুলীদের মতই হয়ে গিয়েছিল, তাই কুলীরা নিঃসন্দেহে তাদের ছাতু খেতে দেয়। খাওয়ার পর আবার রেল-লাইন ধরে সমুখ পানে চলা। ওটা লামডিং জংসন পৌছবার রাস্তা। স্নান নাই কদিন ধরে—শীতের প্রকোপে প্রয়োজনও কম। পেটে ভাত নেই—ঘুমও তেমন নেই। যেতেই হবে,—চলতেই হবে চড়াই উতরাই বেয়ে। গৌহাটি থেকে যতদূর যাওয়া যায় ততই নিরাপদ। রাত্রে একটা রেল স্টেশনের কাছে তারা পাহাড়ে শুয়ে কাটায়। পুলিসের আগমনের আশঙ্কা এখনো যায়নি—রেল-লাইন ছেড়ে অজানা অচেনা পাহাড়ী পথে নিবিড় জঙ্গলে ঢোকারও কোনো সার্থকতা নেই, সেখানে হয়ত বাঘের মুখে কিংবা কোনো পাহাড়ী জাতির হাতে পড়তে হবে—হয়ত খাদ্যাভাবে মরতে হবে। ক্রমাগত পাঁচদিন চলার পর শীতে অনাহারে অনিদ্রায় কাবু হয়ে দুজনে এক রেল স্টেশনে এসে লামডিং-এর টিকিট কিনে গাড়ীতে উঠে বসে। প্রবোধ কারও সঙ্গে কথা বলে না—নলিনীই অসমিয়া ভাষায় নিজেদের অসমিয়া পরিচয় দিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে খাতির জমায়। পথে সন্দেহের কারণ উপস্থিত হলে ঐ যাত্রীদের সঙ্গেই নেমে গ্রামের পথে হাঁটতে থাকবে। লামডিং স্টেশন থেকে শ্রীহট্ট ও বাঙলা দেশের উপর দিয়ে কাটিহার হয়ে তারা বিহার প্রদেশে চলে যায়। বাঙলায় চলেছে তখন পুলিসের উৎপাত। তাই এখানে কোথাও নামা

তারা নিরাপদ মনে করেনি। নলিনী বিহারে বিহারী সেজে খোট্টা হয়ে গিয়েছিল—পরনে মোটা কাপড়, মাথায় টিকি, হাতে লোটা-কম্বল। পশ্চিমা দেহাতী কথা। মজঃফরপুরে কিছুদিন থাকে। ওখানকার কলেজের সিন্ধুদেশবাসী অধ্যাপক 'কৃপালনী'* নলিনীকে স্নেহ করেন—সাহায্যও করেন। পুলিসের সন্দেহ পড়ে নবাগত এই যুবকের প্রতি। নলিনী পশ্চিমা খোট্টার মত কলকাতায় এল। প্রবোধ পূর্ব্বেই বাঙলা দেশে এসে ধরা পড়ে যায়।

আমি তখন গৌহাটি থেকে বিভিন্ন পথে-বিপথে ঘুরে কলকাতায় ফিরে এসেছি। আমার কাছে খবর এল, বিহার থেকে কে একজন এসেছে, দেখা করতে চায়। অসুস্থ হয়ে লোকটি গড়ের মাঠে শুয়ে আছে। আমি খবর শুনে বিস্মিত। মেসের একটি ছাত্রবন্ধু বল্‌ল: 'ওর বসন্ত হয়েছে, মেসে আনতে সাহস পাচ্ছি না। তাই আপনার কাছে এলাম। এখন কি করা যায়।' তৎক্ষণাৎ গড়ের মাঠে ছুট্‌লাম। মনুমেণ্টের নীচে কম্বল মুড়ি দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে একটা লোক পড়ে আছে—যেন একটা কুলি।

নলিনী বিহার থেকে যে ছেলেটিকে সঙ্গে করে এনেছিল সে আমাকে বল্‌ল, এই সেই 'খোকা'। নলিনীকে আমরা 'খোকা' নামে ডাকতাম। আমি ডাক দিতেই সে জড়িত কণ্ঠে বল্‌ল, 'আমি নলিনী।' বড় কষ্ট হ'ল তার এ-অবস্থা দেখে। সর্ব্বাঙ্গে তার বসন্তের গোটা, গায়ে হাত দিয়ে জ্বরের উত্তাপ খুব বেশী মনে হ'ল। বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, রিভলভারটি হাতের মুঠোতেই নিবদ্ধ। আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি: একে

*আচার্য্য কৃপালনী—এখন নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট, গান্ধীজীর অহিংস নীতির একান্ত অনুরক্ত।

নিয়ে যাই কোথায়! গৌহাটি ফেরতা এই ফেরারী যুবককে বাঁচাতেই হবে পুলিসের হাত থেকে আর যমের হাত থেকে। এখনি এখান থেকে সরে পড়া দরকার। এ-জায়গা নিরাপদ নয়। দিকে দিকে গুপ্তচরের আনাগোনা। অনন্যোপায় হয়ে ওকে আমার গোপন বাসায় নিয়ে যাওয়াই স্থির ক'রলাম।

একতলায় ছোট্ট একটি ঘরে আমি থাকি। বাড়ীওয়ালাকে বলেছি, 'চাকরী করি আর ছেলে পড়াই।' বসন্তের রোগী নলিনীকে এখানে এনে ওঠালাম: মনটা ভারি উদ্বিগ্ন; বাড়ীওয়ালা টের পেলে এখনি বিদায় করে দেবে। তখন যাই কোথায়? নলিনীর এ-রোগ কঠিন। প্রতিদিন কাগজে বসন্ত রোগীর মৃত্যু সংবাদ পাচ্ছি। নলিনীর মত একনিষ্ঠ স্বদেশ প্রেমিক ছেলের এই দুরারোগ্য ব্যাধি আমাকে আকুল করে তোলে। মনে মনে ভাবি, নলিনী গৌহাটিতে পুলিসের বিরুদ্ধে লড়ায়ে মরল না—শেষে কিনা বসন্ত রোগে মারা যাবে? নলিনী বহরমপুর কলেজে পড়ত। আই. এস. সি. পরীক্ষায় পাশ করে ২০৲ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পায়। বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম করার কি দুর্জ্জয় আকাঙ্খা ছিল তার মনে। আজ পার্টি দুর্ব্বল, সরকারী নিষ্পেষণে বাঙলার প্রায় দু'হাজার কর্ম্মী জেলে, অন্তরীণে। আমরা সাফল্যজনক কিছু করতে পারিনি বলে জনমতও আমাদের সমর্থন করে না। টাকার অভাবে নলিনীকে ভালভাবে রাখার ব্যবস্থা করতে পারছি না। চারিদিকে গুপ্তচর; সন্দেহ হলেই গ্রেপ্তার। যেমন ক'রে হোক নলিনীকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কার্ব্বলিক তেল কিনে এনে নলিনীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করে দিতাম। ক্রমশ চোখে-মুখে, মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে গোটা উঠে গেল। কথা বন্ধ হ'ল, গলার ভিতরেও গোটা। একা আমিই তার শুশ্রূষা করি। বিপ্লবীদের গোপন আড্ডা

আর কারুকেই দেখানো চলে না ; গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে একটু সন্দেহ হলেই সার্জেণ্ট ও পুলিস এসে হাজির হয়। কলকাতায় তখন এ ব্যাপার নিত্য-নৈমিত্তিক। কত নিরীহ নির্দোষ লোক লাঞ্ছনা ভোগ করে। প্রতিবাদ ক'রলে লাথি। খবরের কাগজে বা নেতাদের বক্তৃতায় পুলিসী জুলুমের প্রতিবাদ খুব কমই হ'ত, যেটুকু হ'ত তাও ভারতরক্ষা আইনের কবলে পড়ে বিনষ্ট হ'ত। যাক্, নলিনীকে নিয়ে চিন্তার আর অবধি রইল না, নলিনী বুঝি আর বাঁচে না। বার বার শুধু আক্ষেপ ভরে এইটেই ভাবি, ও গৌহাটিতে পুলিসের গুলিতে মরলো না কেন। যাই হোক, দিন দশেক পর নলিনীর অবস্থা ভালর দিকে এলো, ওর মুখ দিয়ে কথা বের হ'ল। ও চোখ মেলে চাইল। ম্লান হাসি হেসে বললো, আমার জন্ত আপনার খুব কষ্ট করতে হচ্ছে, না ?

নলিনী বেঁচে উঠলো। সেদিন আমার কি আনন্দ। বিছানায় বসেই সে আমার রান্না করা ভাত খায় আর একটু গল্প-গুজব করে। তারিণী মজুমদার পূর্ব্ব বঙ্গের নানা জায়গা ঘুরে আবার কলকাতায় ফিরে এসেছে। জানা গেল, যুবকদের নিয়ে দল গঠন অর্থাৎ দলে দলে নূতন ছেলে সংগ্রহ করার কাজ চল্‌ছে। দিন দু'য়েক পর ভবানীপুর ও আলীপুর ঘুরে সন্ধ্যাবেলা এক বন্ধুর দেখা পাওয়ার আশায় ইডেন গার্ডেনে ঢুকলাম। ইডেন গার্ডেন থেকে বেরিয়ে হাইকোর্টের সামনের রাস্তায় পৌছানোমাত্র চার পাঁচ জন ভদ্রবেশধারী লোক হঠাৎ আমার গলা, হাত ও কোমর চেপে ধরল। দেখি তাদের তিনজনের হাতে তিনটি রিভলভার। আমার দম আটকে আসছিল। আমাকে টানা-হেঁচড়া করে আর জঘন্ত ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে গাড়ীতে ওঠাল। আমার সাথীটিকেও তারা এক নিমেষে চেপে ধরলে। ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি বন্দী হলাম। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পরিচয়ে আত্মগোপন করে পাঁচ বৎসর কাজ করার

পর ভারতরক্ষা আইনে বন্দী হ'লাম। নলিনীর কাছে আর ফিরে যাওয়া হ'ল না।

নলিনী ভাল হওয়ার পর পূর্ব্ব বঙ্গের সংগঠন-কার্য্য পরিচালনার ভার তার হাতে দিয়ে তাকে ঢাকা অঞ্চলে পাঠানো হয়। জুন মাসে ঢাকা কলতা বাজারের এক বাসায়—বিপ্লবীদের এক গোপন আবাসে পুলিসের সঙ্গে লড়ায়ে সর্ব্বাঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে নলিনী প্রাণ হারায়।

শেষ রাত্রিতে পুলিস সে-বাড়ীতে হানা দেয়। ভোর হওয়া মাত্র নলিনী ও তার সাথী তারিণী মজুমদার দুয়ার খুলেই একটি হাবিলদারের দিকে গুলি নিক্ষেপ ক'রে দ্রুত বের হওয়ার চেষ্টা করে। হাবিলদার ধরাশায়ী হয়; তৎক্ষণাৎ চারিদিক থেকে পুলিসদল অসংখ্য গুলি বিদ্ধ করে তারিণীর জীবনান্ত করে দেয়। এ সময় ঘরের ভেতর থেকে জানালা দিয়ে নলিনী আই. বি. ইনস্পেক্টরকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছোঁড়ে, ইনস্পেক্টর বাবু আহত হয়ে পড়ে যান। কিছুক্ষণ উভয় পক্ষ থেকে গুলি চলে—শেষ অবধি পুলিস রাইফেল ফায়ার ক'রে কাঠের দুয়ার ভেঙ্গে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভিতরে ঢোকে। নলিনী তখন সর্ব্বাঙ্গে গুলি বিদ্ধ হয়ে অবশ হয়ে পড়েছে। হাতের মুঠোয় আছে মসার পিস্তল কিন্তু চালাবার শক্তি নাই—পুলিস ধরাধরি ক'রে তাকে গাড়ীতে তুলে নিলে। হাসপাতালে যখন অর্দ্ধচেতন অবস্থায় নলিনীর জীবনের শেষ মুহূর্ত্তগুলি কাটছিল তখন আই. বি. পুলিস কর্ম্মচারী প্রশ্নের উপর প্রশ্ন ক'রে তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে—'বল, নাম কি? কোথায় বাড়ী' ইত্যাদি। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত নলিনী উত্তর দিয়েছিল :—'আমাকে বিরক্ত করবেন না, শান্তিতে মরতে দিন।' কয়েক মিনিট পরেই নলিনীর জীবনান্ত ঘটে। বীর শহীদ নলিনী মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেও আত্ম-প্রকাশের এতটুকু আকাঙ্খা করেনি। গুপ্ত-সমিতির গোপন কাজের মাঝে নিজেকে জাহির করার এতটুকু কামনা না ক'রেই

নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গেল স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে। ঢাকা কলতা বাজারে পুলিসের সঙ্গে লড়াইয়ে যে দু'জন যুবক-নেতা জীবন দিলেন তাঁরাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ শহীদ।

নিষ্পেষিত বিপ্লবীর সংগ্রাম সাধনা

১৯১৭ সালের শেষ ভাগে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যখন মন্দীভূত, তখনো যুবকগণ হাল ছাড়েনি। সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মত দৃঢ়তা, মনোবল এবং বিশ্বাস তাদের ছিল। জনসাধারণের দুঃখ, অসন্তোষই তাদের মনের দৃঢ়তাকে পুষ্ট করে তোলে। একদিকে সরকারী শোষণ, অত্যাচার, দুর্নীতি—অপরদিকে জনগণের দুর্ব্বলতা, স্বার্থপরতা, কুসংস্কার সমাজে প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল বলেই ক্রুদ্ধ এক প্রতিকার-স্পৃহা তেজস্বী যুবকগণের চিত্ত অধিকার করে; বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে জীবন দেওয়া ও জীবন নেওয়ার উদ্দীপনা জোগায়। সম্প্রতি তারিণী ও নলিনীর বীরত্বব্যঞ্জক সংগ্রাম, পুলিসের গুলিতে জীবন দান যুবকদের বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামে উত্তেজিত করে তোলে। উত্তেজনাকে কার্য্যকরী রূপ দেওয়ার মতো কোনো শক্তিই তখন তাদের ছিল না। অস্ত্র নাই, টাকা নাই, সর্ব্বোপরি সংগঠনও নাই; পুরানো ও নূতন নেতারা সকলেই জেলে; তারিণী, নলিনীর নেতৃত্বে যে-সংগঠন শক্তিশালী হয়ে উঠত তাদের মৃত্যুতে সে-সংগঠন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। ক্রমাগত অত্যাচারে নিষ্পেষণে বাঙলায় পুলিসী শাসন কায়েম হয়, বিপ্লবী-সংগঠনের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই লাল দত্তের জীবন দানে যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ভিত্তি পত্তন হয় সাম্রাজ্যবাদী

পুলিসের গুলিতে নিহত তারিণী, নলিনীর বীরত্বব্যঞ্জক লড়াইয়ে ১৯১৮ সালে সে-সংগ্রামের প্রথম পর্ব্ব শেষ হল। এই দশ বৎসরে বিপ্লবী আদর্শ সাধনার কত আশা, কত কল্পনা, কত আয়োজন বাঙলার প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বিপ্লবী দল সংগঠনের কত না চেষ্টা বাঙলার জেলায় জেলায়, শহরে-গ্রামে, স্কুলে-কলেজে, বাঙলার আনাচে-কানাচে শিক্ষিত যুবকদের মনে জাতীয়তা, স্বাদেশীকতা ও সক্রিয় বিরোধিতা জাগিয়েছে। কত অগ্রণী কর্ম্মীর দল ধরা পড়েছে, আবার নূতন কর্ম্মীরা এগিয়ে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে, কত যুবক গুলিতে ফাঁসীতে মরেছে, কারাগারে জীবন দিয়েছে। তারই ফলে, কত শত নূতন যুবক এক মহান মৃত্যুর নূতন উদ্দীপনা পেয়েছে। কত বার দল ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে, আবার নূতন করে দানা বেঁধে উঠেছে। এমনি করেই বিপ্লবীদের সকল চেষ্টা বারে বারে ভেঙে গেছে সত্যি, আবার ধূলি শয্যা থেকে দাঁড়িয়েছে মাথা উঁচু ক'রে। তারা দমেনি, সামনে চলার পথ ভুলেনি—মুক্তি পথের সন্ধান ছাড়েনি। ভাঙা দলকে আবার গড়ে তুলেছে আরো শক্ত করে।

এই দশ বৎসরের ইতিহাস বাঙালী যুবকের স্বাধীনতা-সংগ্রামের রক্ত রঞ্জিত ইতিহাস। গণশক্তি হতচেতন, শিক্ষিতেরা ভীরুতায়, ঈর্ষায় ও স্বার্থপরতায় মগ্ন। তারই মধ্যে তেজস্বী ত্যাগী চরিত্রবান ছেলেদের বেছে বেছে বিপ্লবী দলভুক্ত করা হ'ত—দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন যুবকদের সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপে নিযুক্ত করা হ'ত। দল গঠন ও দলের বিস্তারের জন্য সকল রকম সঙ্ঘ-সমিতি, আশ্রম ও প্রতিষ্ঠানের ভেতর কর্ম্মীরা যোগ দিতেন। আখড়া, পাঠাগার, সেবা-সমিতি ও স্কুল-কলেজ ছাত্র-সমিতি গঠন করে যুবকদের ঐক্যবদ্ধ এবং সমষ্টিগত ভাবে কাজ করার ব্যবস্থা ছিল। কিছু কিছু উকীল, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি জনপ্রিয় ব্যক্তিরা

যুবকদের কাজের সহায়তা করতেন। এই সকল প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্মীদের পিছনে সব সময়ে পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি লেগেই ছিল। বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য ধরপাকড় ও খানাতল্লাশ প্রায়ই হ'ত। তবু জাতীয় ভাব উদ্দীপনার ও সক্রিয় ভাবে স্বাধীনতার পথে এগোবার সত্যিকার প্রচেষ্টা ছিল এখানে —এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপের প্রতি লোকের সহানুভূতি ছিল, সত্যিকার স্বাধীনতার পূজারী বলে একমাত্র আস্থা ছিল এদেরই উপর।

কেউ কেউ বিপ্লবী-দলের কর্ম্মীদের অর্থ সাহায্য করতেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি সামান্য। বিপ্লবী-সঙ্ঘ পরিচালন, গৃহহীন সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা মুদ্রণ ও প্রকাশ, পিস্তল-রিভলভার ও বিস্ফোরক দ্রব্য কেনা ইত্যাদি নানাবিধ ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য প্রচুর অর্থ আবশ্যক হ'ত। যুদ্ধের সময় পুলিসের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বার বার দলের সংহতি ভেঙে পড়েছে, ভাঙা দল আবার গড়ে তোলার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়েছে। যুদ্ধের শেষ ভাগে যখন নিষ্পেষণের প্রকোপে আমরা আর দাঁড়াতে পারছিলাম না, তখন বিক্রমপুরে এক দুঃসাহসিক ডাকাতির আয়োজন করা হয়। আর্থিক প্রয়োজন মিটানো এবং যুবক চিত্তে রাজনৈতিক উদ্দীপনা জাগানো এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই কাজটি করা হয়।

শক্তি দেখিয়ে ধনীর পাপার্জিত ধন কেড়ে আনার উদ্দেশ্যে ঢাকার ছেলেরা আবদুল্লাপুরের এক ধনীর বাড়ীতে যাত্রাগানের সময় জোর ক'রে টাকা ও অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে আনার প্ল্যান করে। গান তখন জমে উঠেছে। অকস্মাৎ এক সময় পরিচ্ছন্ন সার্ট ও হাফপ্যাণ্ট পরা পোষাকে সুশ্রী সবল যুবকের দল পিস্তল-রিভলভার উঁচিয়ে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকের আওয়াজ—'বিউগল্'এর ধ্বনি। দলের নেতা

হুকুম দিল: কেউ এক পা নড়বেন না, যে যেখানে আছেন, সেখানেই বসে থাকুন। শ্রোতৃবর্গ ত্রস্ত, ভীত ও চঞ্চল; হতভম্ব হয়ে রইল। এমনি সময় বাড়ীর মালিকের চিৎকার শুনা গেল: আমার সব নিয়ে গেলরে—সব নিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ পর পর তিন-চারটি পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ হ'ল। চাঞ্চল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখে নেতা উঁচু গলায় বলে উঠে: "সকলেই শুয়ে পড়ুন—যে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে তারই মাথায় গুলি লাগবে।" মালিকের বন্দুকটি তখন তাদের দখলে এসে পড়েছে। যাত্রা গানের আসর থেকে একজন বলে উঠে: "এরা সব স্বদেশী ডাকাতের দল।" ডাকাত সর্দার চেঁচিয়ে বলে: "এ-বাড়ীর টাকা যায় তো আপনাদের ক্ষতি কি? আপনারা তো কেউ এ-বাড়ী থেকে কোনো সাহায্য পান না। আমরা এ-টাকা নিয়ে সদ্‌ব্যয় করব—দেশের স্বাধীনতার কাজে ব্যয় করব।" আধ ঘণ্টা পর আবার বিউগ্‌ল্ বেজে উঠল। ডাকাতদের কাজ শেষ। প্রায় ৩২০০০ হাজার টাকা তারা পেয়েছে। বিউগ্‌লের ধ্বনি হওয়া মাত্র যুবকের দল যার যার জায়গা ছেড়ে এক লাইন হয়ে দাঁড়াল। যাত্রা গানের সহস্রাধিক দর্শক কৌতূহলী দৃষ্টিতে বিউগ্‌লের তালে তালে স্বদেশী ডাকাতের কুচকাওয়াজ লক্ষ্য ক'রছে। সংখ্যায় তারা ত্রিশ জনেরও বেশী হবে। টাকা ও অলঙ্কারগুলি তাদের থলিতে ঝুলছে। এ-বাড়ীর বন্দুকটিও তারা কাঁধে তুলে নিয়েছে। টেলিগ্রামের তার পূর্ব্বেই কেটে দেওয়া হয়েছিল। পরে যখন সকলে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দূরাগত বিউগ্‌লের ধ্বনি অনুসরণ করে ডাকাত ধরতে ছুটল তখন তারা দূরে খরস্রোতা নদী-প্রবাহে নৌকো ভাসিয়ে দিয়েছে; বিউগ্‌লের আওয়াজ থেমে গেছে। এ-ডাকাতি ভাবপ্রবণ বাঙালীর মনে উদ্দীপনা জাগিয়েছিল; সাধারণ আলাপ-আলোচনায় শিক্ষিত বাঙালীরা এই ধরনের ডাকাতির জন্য

কখনো ঘৃণা প্রকাশ করেনি। ছাত্র ও যুবকগণ এ ঘটনায় বরং উৎসাহিতই হয়, বিপ্লবী-দলের শক্তিতে বিশ্বাসবান হয়ে উঠে। বৃটিশের শাসন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে মনে করে আনন্দ পায়।

কার্য্য-পদ্ধতি

যুদ্ধের সময় বাঙলার সর্ব্বত্র সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ তীব্র ও প্রসারিত হয়ে পড়ে। ১৯১৬ সালে প্রায় তিনশ' যুবক ঘর-বাড়ী ছেড়ে গুপ্ত-সমিতির কাজে বার হয়ে পড়ে। তার মধ্যে দু-শ'ই হবে অনুশীলন পার্টির ছেলে। অর্থ-সংগ্রহের জন্য সরকারী টাকা বা অত্যাচারী ধনীর টাকা লুণ্ঠন, সবকারী কর্ম্মচারী এবং রাজসাক্ষীর শাস্তি বিধান, বিদ্রোহ উদ্দীপক পুস্তিকা বিতরণ এবং সকলের উপর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে দল গঠন তখনকার প্রধান করণীয় কাজ বলে পরিগণিত হত। দলের কাজ প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত :—সংগঠন-বিভাগ ও কর্ম্ম-বিভাগ বা হিংসাত্মক কাজ ইত্যাদি। সন্ত্রাসবাদী কাজকে 'এ্যাকশন' (action) বলা হত। প্রতিটি কর্ম্মীর ঝোঁক ও কর্ম্মপ্রবণতা দেখে তার উপর কার্য্যভার ন্যস্ত হ'ত। টেকনিক্যাল বিভাগ পৃথক ছিল, এ-বিভাগ কয়েকটি পৃথক উপবিভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়: (১) গোপনে অস্ত্র-সংগ্রহ, (২) বন্দুক-পিস্তলাদি মেরামত (৩) পুস্তিকা মুদ্রণ, চিঠি-পত্র ও ঠিকানার পোস্টবক্স হিসাবে লোক মজুত রাখা হত। বই, অস্ত্র রাখা, গোপন ফেরারী কর্ম্মীদের আশ্রয় দেওয়া, খবরাখবর আদান-প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের কাজের জন্য বিভিন্ন কর্ম্মী নিযুক্ত করা হত। আশ্রয় দেওয়া এবং দুর্গম পথে পিস্তল নিয়ে যাওয়ার কাজে স্ত্রীলোকের

সাহায্য নেওয়া হত। এ-কাজে মা, বোন, বৌদি বা আত্মীয়ারা অগ্রণী হয়েছিলেন।

অনুশীলন পার্টি বাঙলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও আসামে প্রসারিত হয়েছিল। একটি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশে সর্ব্বত্র কাজ পরিচালিত হ'ত। জেলা ও প্রাদেশিক পরিচালক নিযুক্ত করা বা স্থানান্তরে প্রেরণ করা কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশে হত। সমস্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার বিধান ছিল। যুগান্তর পার্টি কলকাতা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, মাদারীপুর, রংপুর প্রভৃতি জেলার ছোট ছোট দল সমূহের একটি যুক্তদল (Federation of groups) হিসাবে কাজ করে। এ-দু'টি বিপ্লবী দল ছাড়া আরো ছোটো খাটো দল এক-একজন যুবক দাদার নেতৃত্বে গড়ে উঠ্‌ত, ছেলেদের নিয়ে কানাকানি করত, ইংরেজ রাজত্ব উচ্ছেদের কথা বলত।

বাঙলার বিপ্লবীদল সমূহের পরস্পরের লক্ষ্য ও আদর্শের কোনো পার্থক্য ছিল না—কর্ম্ম-পদ্ধতিও অনুরূপ। এরা পরস্পর কখনো ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে বিরোধ করে, আবার কখনো বা সহযোগিতা করে।

অনুশীলন সমিতির একদল অগ্রণী কর্ম্মী ধরা পড়ে গেলে আর একদল উপরে উঠে দলের পরিচালনভার গ্রহণ করে; এ-দল গ্রেপ্তার হলে আবার আর একদল উঠে দাঁড়াত—তারপর আর একদল, ১৯০৭।৮ সাল থেকে ১৯১৭।১৮ সাল অবধি ধরা পড়ে পড়েও নূতন নূতন বিপ্লবী এসে নেতৃত্ব দিয়ে দলের শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গিয়েছে।

সরকারী জুলুম ও নির্য্যাতনের কথা

সন্ত্রাসবাদীরা যে-নির্য্যাতন সহ্য করেছে পৃথিবীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তা বিরল। গ্রেপ্তারের পর তাদের কেবল কিল ঘুষি বুটের লাথিই মারা হত না, লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মাথায় হাঁটুতে কনুই-য়ে জোর আঘাতের ফলে কত যুবক অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। কাউকে কাউকে দশ বারো দিন না খেতে দিয়ে দেয়ালে হাতকড়ী দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ত; প্রতিদিন অজ্ঞান হয়ে গেলে মাথায় তেল জল দিয়ে জ্ঞান ফিরে এলে আবার হাতকড়ী দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হত। মাসের পর মাস নির্জ্জন কক্ষে বন্দী রেখে মাঝে মাঝে রাত্রিতে তালা খুলে ঘুম থেকে টেনে তুলে প্রশ্ন করা হত: 'কি জান—বল।' স্বীকারোক্তি না পেলে সার্জেণ্ট ও পুলিসের বুট চলত সজোরে, হতভাগ্য বন্দীর বুকে মাথায়, চোখে, তলপেটে। একদিন মাঝ রাত্রিতে কলকাতা দালান্দা হাউসের বন্দীরা বিকট চীৎকার শুনে জেগে উঠেছিল। একটি রুদ্ধ কক্ষ থেকে প্রথমটায় করুণ আর্ত্তনাদ শোনা যায়; তারপর মারের দুপ্ দুপ্ শব্দ তারপর সব চুপ। কতজন কোর্টে গিয়ে হাকিমকে মুখে, কপালে, পিঠে, হাতে, পায়ে লাঠির আঘাতের চিহ্ন দেখিয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে উত্তর হত: 'আসামী নিজে দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরতে গিয়েছিল' অথবা কখনো উত্তর দেয়: 'আসামী পুলিসকে মারতে গিয়ে নিজেও আহত হয়েছে।'

এর উপর আর কোনো কথা কওয়ার অধিকার ছিল না। নখে ছুঁচ ঢোকানো, ঘাড়ের চুলে উল্টা দিকে হেঁচ্‌কা টান দেওয়া, হাতের আঙুলে লাঠির আঘাত, জোরে কানমলা এ-সব তো ছিলই। এ-ছাড়া আরো কত রকম নির্দ্দয় অমানুষিক নির্য্যাতন চলে যার সঙ্গে মধ্যযুগীয় শাস্তিরই তুলনা করা চলে। আমি যখন প্রথমে জেল খাটি তখন ময়মনসিংহের সরার চর মামলার "লাহিড়ী" নামক এক কলেজের ছাত্র-বন্দীকে দেখি। সে বাঁকা হয়ে হাঁটত, মাথাটাও তার কোথাও উঁচু, কোথাও বাঁকা ছিল। একদিন কিছু কিছু কথা হওয়ার পর জান্‌লাম, ধরা পড়ার পর পুলিস তাকে কি নিদারুণ নির্য্যাতন করেছে। আমি তার মর্ম্মান্তিক কাহিনী শুনে কান্না সম্বরণ করতে পারিনি। সে ১৯১১ সালের কথা। পুলিসের অত্যাচারই লাহিড়ীর দৈহিক বিকৃতির কারণ ছিল।

আমার এক বিপ্লবী বন্ধু কীড ষ্ট্রীট পুলিস অফিসে ক্রমাগত বুটের লাথি ও লাঠির আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন একজন ফেরারী নেতা, তাই তার উপর অত্যাচার চরমে উঠে। চেতনা ফিরে এলে তিনি জল চান। জলের পরিবর্ত্তে তার নিকট প্রস্রাব উপস্থিত করা হয়। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে পুলিস কর্ম্মচারীকে "ছোট লোক" বলেন। পরে আবার তাকে লাথি মারা হয়—তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান। চার পাঁচ দিন তাকে কিছুই খেতে না দিয়ে আঁধার ঘরে একা বন্ধ করে রাখে—তিনি অবসন্ন দেহে অজ্ঞানের মত পড়ে থাকতেন। একটু জ্ঞান হলেই আই. বি ও এস.বি পুলিস—বিপ্লবী দলের গোপন কথা ফাঁস ক'রে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি ক'রত আর তার জন্য তাকে মারধরও করত। একেবারে মেরে ফেলারও ভীতি প্রদর্শন ক'রত। শেষ অবধি তিনি অচল অটল ছিলেন। ডেপুটি কমিশনার সাহেব তাঁর সহ্য শক্তি দেখে তাঁর সামনেই বলে দিলেন : এ লোকটির ভেতর কি একটা শক্তি

আছে (There is something in him)। এই বন্ধুটি পরে সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

তরুণ বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জ্জীর উপর আই.বি পুলিস অফিসে যে নিদারুণ অত্যাচার হয় তার মুখে সে-মর্ম্মান্তিক কাহিনী শুনে আমরা অশ্রু সম্বরণ করতে পারিনি। দেয়ালে খাড়া হাতকড়ী দিয়ে এগার দিন (দিন রাত) ওকে দাঁড় করিয়ে রাখে। কিচ্ছু খেতে দিত না। ক্ষুধায়, অনিদ্রায় নিরন্তর দাঁড়িয়ে থাকার দুঃসহ পীড়নে অবসন্ন হয়ে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ত তখন পুলিস তার হাতকড়ী খুলে চোখে-মুখে ও মাথায় জল দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করত। তার মুখ থেকে গুপ্ত-তথ্য বার করার জন্যই এটুকু সাহায্য। সে-চেষ্টা ব্যর্থ হলেই আবার সেই খাড়া হাতকড়ী—সেই লাঞ্ছনা। একদিন ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে খেতে চায় ; তৎক্ষণাৎ মেথর ডেকে বিষ্ঠা আনিয়ে তার মুখের কাছে ধরা হয়েছিল। যোগেশ ক্রোধে ঘৃণায় পুলিস কর্ম্মচারীর সর্ব্বাঙ্গে থুথু ছিটিয়ে দেয়। এর জন্য অবশ্যই তার অনেক কিল ঘুষি ও লাথি পুরস্কার মিলেছিল। পরে বড় সাহেব এসে দু-পয়সার মুড়ী খাওয়া মঞ্জুর করেন। আই.বি ও এস.বি পুলিস অফিসের নিভৃত কক্ষের এই পাশবিক পীড়ন তখন দেশবাসীর কাছে প্রকাশ পায় নি। এরকম অমানুষিক অত্যাচারেও যোগেশ চ্যাটার্জ্জীকে দমাতে পারেনি। এখন তিনি যুক্তপ্রদেশে 'আর-এস-পি-আই' দলের একজন বিশিষ্ট নেতা।

১৯১৬।১৭ সালে মারধর অত্যাচার চরমে উঠে—তখন বহু যুবক নির্য্যাতন সহ্য করতে না পেরে পুলিসের কাছে গুপ্ত-তথ্য বলে দিত অথবা নিজেদের কৃত-কর্ম্ম সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হত।

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতের এক বন্ধুকে বাঙলার রাজনীতিক কর্ম্মীদের উপর বাঙলা গভর্নমেণ্টের কঠোর-

নিষ্পেষণের কথা লেখেন। এই নির্ম্মম ব্যবহারের ফলে কেউ কেউ আত্মহত্যা করে, কেউবা পাগল হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ বাঙলার লাট রোনাল্ড্সে সাহেব অস্বীকার করেন। ভারতের সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ মণ্টেগু তাঁর ভারতের ডায়রীতে লেখেন, "কবি রবীন্দ্রনাথ আটক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের বিভীষিকায় রাজনীতিক হয়ে গেছেন।"

আনি বেশান্তও বাঙলার বন্দীদের প্রতি নির্য্যাতনের প্রতিবাদ করে ভারতের বড়লাট সাহেবকে চিঠি লেখেন। তার কিছুদিন পরই আনি বেশান্ত নিজেই অন্তরীণাবদ্ধ হন। বাঙলার যুবকদের নির্য্যাতনের এ-বর্ব্বর কাহিনী সংবলিত এক চিঠি মাদ্রাজ হাইকোর্টের এক জজ আমেরিকায় প্রেসিডেণ্ট উইলসন সাহেবকে লিখে পাঠান। জজ বাহাদুর আনি বেশান্তের 'থিওজোফিস্ট' দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯১৮ সালে অত্যাচারের মাত্রা কিছুটা কমে যায়। আমি ঐসময় ধরা পড়ে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে, প্রকাশ হয়ে পড়ার মত উৎকট মারধর বন্ধ করার গোপন নির্দ্দেশ এসেছে ওপর থেকে।

গুপ্ত সমিতির বিভিন্ন কর্ম্মধারা

১। রিক্রুটিং

ছাত্র ও যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করা ছিল বিপ্লবী দলের একটি প্রধান কাজ এর জন্য প্রতি জেলায় অনেক স্কুল-কলেজে, ক্লাব, সেবা-সমিতি ও ব্যায়াম সমিতিত গোপনে গোপনে রিক্রুটিং-এর কাজ চলত। বই পড়িয়ে, স্বদেশী বিষয়ে আলাপ ক'রে ছেলেদের স্বদেশ-প্রেম উদ্বুদ্ধ করার পর তাদের দলে টেনে আনার জন্য কত চেষ্টাই না হয়ে গেছে বাঙলার প্রায় সর্ব্বত্র। প্রত্যেক শহরের প্রায় প্রতি স্কুলে ও কলেজে কয়েকটি ছাত্রের একটি গোপন দল থাকত ; ছেলেদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে মিশে ধীরে ধীরে তাদের সন্ত্রাস-বাদী রোমান্সে উদ্দীপিত করে দলে টেনে আনবার কাজ ছিল এই গোপন দলটির। রিক্রুট করতে পারার মর্য্যাদা ছিল যথেষ্ট ; বেশী সংখ্যক ছেলে রিক্রুট হলেই দলের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ত্যাগী, সাহসী, চরিত্রবান এবং পড়াশুনায় ভাল ছেলেদের বেছে বেছে রিক্রুট করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলতো। মাঝে মাঝে ইংরেজ রাজত্ব উচ্ছেদের কাজে লাগার জন্য ছাত্রদের উদ্দীপিত ক'রে গোপন ইশ্‌তেহার ছড়ান হত। এতে ছাত্ররা সত্য সত্যই উত্তেজিত হয়ে উঠত।

এক একটি সাফল্যজনক পুলিস বা গুপ্তচর হত্যার পর অথবা বড় রকমের ডাকাতির পর সেই অঞ্চলে রিক্রুট করার কাজ খুব সহজ হয়ে যেত। বোমা পিস্তলের কোনো কাজ (য়্যাকসন) হলেই যুবক-মনে সাড়া

পড়ে যেত ; সেই কাজটি সম্পন্ন করে বিপ্লবীরা সরে পড়তে পারলে আরো বেশী উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ত। বহু সংখ্যক ছাত্রই স্বার্থপরতায়, বিলাসিতায়, কিংবা পড়াশুনায় 'ভাল ছেলে' হওয়ার চেষ্টায় মগ্ন থাকত। স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করার মত ছেলে খুব কমই পাওয়া যেত। আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতা, শিক্ষক সকলেই ছেলেদের এ-পথে যেতে নিরুৎসাহ করতেন কিংবা বাধা দিতেন ভীতি প্রদর্শন করতেন। গুপ্তচরের ভয়েও ছেলেরা ভীত ছিল ; গুপ্তচরের গতিবিধি ছিল সর্ব্বত্র—স্কুলের শিক্ষক ও গরীব চরিত্রহীন ছাত্রদের মধ্যে টাকা খেয়ে কেউ কেউ গুপ্তচরের কাজ করতো। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গুপ্তচরের উৎপাত খুব বেশী বেড়ে গিয়েছিল, গুপ্তচর বিভাগের পরামর্শ অনুযায়িই বাঙলা গভর্নমেণ্ট পরিচালিত হত। প্রচণ্ড বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও যুবকগণ গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসুক ছিল। গোপনতার আড়ালে অনেক কিছু গূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে এমন ধারণা তারা পোষণ করত ; বিপ্লবী কর্ম্মীরা অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন এবং প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত এ-রকম ধারণা অনেকেরই ছিল। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের কথাবার্ত্তায় প্রায়ই শোনা যেত, 'এদের শক্তিকে কেউ রোধ করতে পারে না, ওরা যা করা স্থির করে তা ওরা করেই।' তিন তিন বারের চেষ্টায় বাঙলার গুপ্তচর বিভাগের বড় কর্ত্তাকে হত্যা করার পর জনসাধারণের এ-বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল—বিপ্লবীদলের কর্ম্মীরা অজেয়। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করা এবং এ-দাবী আদায়ের জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থান একমাত্র বিপ্লবী দলেরই লক্ষ্য ও কর্ম্মসূচী ছিল বলে অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক—উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, সরকারী কর্ম্মচারী বিপ্লবী দলের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং গোপনে সাহায্য করতেন। রিক্রুট করার ব্যাপারে কোনো কোনো সময়ে দলে দলে বিরোধ লেগে যেত। দলাদলির বিরোধ আমরা এড়াতে পারিনি।

মেয়েদের রাজনীতিক শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার না থাকায় তাদের দলে আনার কোনো কল্পনা তখন ছিল না কিন্তু মা,বৌদি,স্ত্রী ও বোন রূপে তাদের সাহায্য অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে, ফেরারী বা পলাতক কর্ম্মীদের অতি সংগোপনে আশ্রয় দেওয়া, পিস্তল-রিভলভার রাখা বা স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া, চিঠি আদান প্রদানের পোস্টবক্স হিসাবে কাজ করা —কোনো কোনো বিপ্লবী পরিবারে মেয়েরা এ সকল কাজ করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সিউড়ীতে (বীরভূম) সিন্ধুবালা দেবী নাম্নী এক মহিলার বাড়ীতে মসার পিস্তল পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর বাক্সে ঐ পিস্তল কে রেখেছে তা তিনি বলতে অস্বীকার করেন। তাকে দু'বৎসর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী যুগে মেয়েরা বিপ্লবের কাজ থেকে পিছিয়ে থাকেনি।

কলকাতার পুলিসী ঝঞ্ঝাট থেকে নিরাপদে থাকার জন্য আমরা ফেরারী (এব্‌স্‌কণ্ডার) বিপ্লবীরা কলকাতা শহরতলীতে বাসা ভাড়া নিতাম। একবার বরাহনগরের একটি বাসায় রাত্রিতে অকস্মাৎ পিস্তলের বুলেট সশব্দে বেরিয়ে যায়। আমরা তৎক্ষণাৎ আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি কিন্তু দু'দিকের বাড়ী থেকে ডাকা ডাকি শুরু হয়। আমরা কিছুই না জানার ভান করি। প্রতিবেশীদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়ায় পরদিন আমাদের বাড়ী ছেড়ে যেতে হল।

বাগবাজার অঞ্চলের এক মজুর বস্তিতে অতি অল্প ভাড়ায় একখানি ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম। আমরা ৬।৭ জন ওখানে থাকি এবং স্বহস্তে রান্না করে খাই।

মজুর বস্তিকে 'কুলী বস্তি' বলা হত; বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিক, মুটিয়া, রিক্সাওয়ালা, ঠেলা ও গরুর গাড়ীর চালক প্রভৃতি ঐ বস্তিতে ছিল। এখানে এদের সঙ্গে থাকার একটা অসুবিধা আমাদের ভোগ করতে হয়;

আমাদের পরিষ্কার ভদ্রবেশ এখানে অচল। আমরা বাড়ীতে নোংরা ও ছেঁড়া কাপড়-জামা পরতাম, বেরিয়ে যাওয়া-আসার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতাম পাছে কুলী-মজুরদের সন্দেহ দৃষ্টি পড়ে আমাদের ওপর। আশে-পাশের ঘরের মজুরদের সঙ্গে আমাদের বেশ সৌহার্দ্দ্য হয়। তারা আমাদের সাধারণ শিক্ষিত গরীব বাঙালী বাবু ব'লে মনে করত। আমরা লুকিয়ে খবরের কাগজ নিয়ে আসতাম—কখনো তাদের সামনে কথাবার্ত্তায় ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ করিনি। বস্তির অধিবাসীদের ঝগড়া-মারামারি, হাসি-গান, গল্প-গুজব, সেকেলে কেচ্ছা, ছড়া ও বটতলার বই সুর করে পড়া আমরা অবাক হয়ে দেখতাম। কলতলায় ও নোংরা পায়খানায় স্থান পাওয়ার জন্য কি ঠেলাঠেলিই না চলত। কি বিচিত্র এই বস্তি-জীবন! ভাবতাম দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে এই বস্তিবাসীদের থাকা, খাওয়া, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি সাধন করা যাবে। দেশের স্বাধীনতার কথায় বা রাজনীতির কথায় আমরা আগ্রহ দেখাইনি পাছে আমাদের উপর সন্দেহ আসে। এমনিতেই কেন আছি, কি কাজ করি তার মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতে হত প্রতিদিন। বস্তির কুলী-মজুরদের সারল্যপূর্ণ জীবন আমাদের ভাল লেগেছিল। কয়েক মাস পর আমাদের গতিবিধি অনুসরণ করে কেউ কেউ বস্তিতে আসা-যাওয়া করছে এ-রকম আভাস পেয়ে আমরা সরে পড়ি। পাথুরিয়া ঘাটার এক বাড়ীতে বিপ্লবীদের গোপন আড্ডায় একটি গুপ্তচর উঁকি মেরে দেখছিল; তৎক্ষণাৎ তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

বাঙলার বাইরে বিপ্লবী আন্দোলন

বাঙলার বাইরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

১৯০৮ সালে যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত বোনারসে শচীন সান্যালের উদ্যোগে অনুশীলন সমিতি সংগঠিত হয়। বাঙলার অনুশীলন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পর "যুবক সমিতি" নাম নিয়ে যুবকদের সংগঠন পরিচালন করার কৌশল অবলম্বন করা হয়। বাঙলার বিপ্লবীদলের সঙ্গে এই সমিতির যোগ ছিল। পরে নেতা রাসবিহারী বসু বেনারসে এসে যুবকদের বোমা ও রিভলভার চালনা-কৌশল শিক্ষা দেন। পিংলে নামক মহারাষ্ট্রীয় যুবক ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে আমেরিকা থেকে ফিরে এসে রাসবিহারী ও শচীনকে বলেন যে, আমেরিকা হতে হাজার হাজার শিখ ও গদর পার্টির কর্ম্মীরা ভারতে বিদ্রোহের জন্য এসেছেন—বিদ্রোহ আরম্ভ হলে আরো অনেক লোক আসবে। পাঞ্জাবী বিপ্লবীদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য রাসবিহারী, পিংলে ও শচীন লাহোরে গেলেন। বেনারসে ফিরে এসে রাসবিহারী দলের কর্ম্মীদের আসন্ন বিদ্রোহ ঘোষণার কথা জানিয়ে দেন এবং বলেন, এবার জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। দামোদর স্বরূপকে এলাহাবাদের কার্য্যভার দিয়ে পাঠান হয়। বোমা ও অস্ত্র আনার জন্য দু'জনকে বাঙলায় পাঠান হয়। বিনায়ক রাও কাপ্‌লেকে বোমা সংগ্রহের জন্য পাঞ্জাব পাঠান হয়। বেনারস ও জব্বলপুর সেনা-বারিকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করা হয়। লাহোর দিল্লী থেকে পূর্ব্ব বাঙলা অবধি সর্ব্বত্র ১৯১৫ সালের ২১শে জানুয়ারী বিদ্রোহ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। কিন্তু লাহোর কেন্দ্র থেকে কোনো সিগন্যাল না পেয়ে শচীন সান্যাল বেনারস প্যারেড ময়দানে উৎকণ্ঠায় রাত্রি যাপন করেন। লাহোরে বিদ্রোহের সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ায় ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে যায়। পিংলে বেনারস থেকে এক বাক্স বোমা সহ মীরাট সেনা-বারিকে প্রবেশ করার সময় ধরা পড়ে যায়। বুদ্ধিমান তেজস্বী বীর যুবক

পিংলের ফাঁসী হয়। বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর শচীন সান্যাল ও গিরিজা বাবুর উপর যুক্ত প্রদেশের বিপ্লবী-সংগঠন পরিচালনের ভার দিয়ে রাসবিহারী বসু জাপানে চলে যান। গিরিজা বাবুর প্রকৃত নাম নগেন্দ্রনাথ দত্ত; সিলেট জেলায় কাজ ক'রতে ক'রতে সাধারণ কর্ম্মী থেকে ক্রমে শিক্ষা লাভ ক'রে বাঙলার অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী হয়ে উঠেন। শচীন সান্যাল, গিরিজা বাবু ও আরো কয়েকজন যুক্ত প্রদেশীয় যুবক পরে বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডিত হন। গিরিজা বাবু আগ্রা জেলে মারা যান। এর পরও যুক্ত প্রদেশের নানা জেলায় বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা বিতরণ চলতে থাকে।

বাঙলার বিপ্লবীদল প্রথম থেকেই আসামের বিভিন্ন জেলায় সংগঠন তৈরী করে। বিহার, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব—সমগ্র উত্তর ভারতের বিপ্লবী দল-গুলির মধ্যে যোগাযোগ ছিল। ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। পরে লাহোরেও বোমা পাওয়া যায়। পুলিসের কর্ম্মতৎপরতায় পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা ধরা পড়ে। রাসবিহারী বসু গা ঢাকা দেন। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় আমীর চাঁদ, আবাদ বিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাস এই চার জনের ফাঁসী হয়। ১৯১৫ সালের যুদ্ধের সময় সমগ্র উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতে যে-বিদ্রোহের আয়োজন হয় লাহোর ছিল সে-বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। ২৮ জনের ফাঁসী হয়। বহু লোকের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। যে-সব বিদ্রোহী সৈন্যদের সামরিক বিচারে (কোর্ট মারসেল) ফাঁসী অথবা গুলিতে জীবন দিতে হয় তাদের সম্বন্ধে কোনো তথ্যই প্রকাশ করা হয়নি।

বোম্বাই, মাদ্রাজেও বিপ্লবী দলের কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠিত হত।

যুদ্ধকালে ভারতের কংগ্রেস ও বিপ্লবী রাজনীতি

যুদ্ধের প্রথম কয়েক বৎসর ১৯১৪-১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেস নির্জ্জীব অবস্থায় ছিল। যুদ্ধের প্রথমেই ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট এস. পি. সিংহ ঘোষণা করেন—এখনো আমাদের স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন লাভের সময় আসেনি। যখন ভারতীয় বিপ্লবী দল ভারতে বিদ্রোহ ক'রে স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টায় ব্যাপৃত, যখন বিপ্লবী নেতারা আমেরিকার রাষ্ট্রগঠনের অনুকরণে ভারতে স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র—"Federal Republic in India"—প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত, তখন আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট সময় আসেনি ব'লে স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভের দাবী করতেও অনিচ্ছুক। ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে বিলাতের গভর্নমেণ্ট ভারতে ক্রমশ স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। রুশিয়ার বিপ্লবই বৃটিশ সরকারের উপনিবেশ-শাসনের বন্ধন-রজ্জুকে খানিকটা শিথিল করার আসল কারণ। রুশিয়ার সম্রাট জারের পতন ও রুশিয়ার গণ-জাগরণ বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ভীতি উৎপাদন করেছিল।

১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বসলো কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন। অন্তরীণমুক্ত আনি বেশান্ত প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়েছেন। সুরেন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ নরম দলের নেতারা আনি বেশান্তকে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট

করতে অনিচ্ছুক, শেষ অবধি গরম দলেরই জয় হল। আনি বেশান্তই প্রেসিডেণ্ট হলেন। রবীন্দ্রনাথ গরমদলের পক্ষপাতী। আমরা আমাদের গোপন-আড্ডায় ঔৎসুক্যসহকারে নরম ও গরম দলের বিরোধের পর্য্যালোচনা করি। একদিন খবর এল, ভারতের স্টেট সেক্রেটারী মিঃ মণ্টেগু বিপ্লবী দলের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে রাজনীতিক আলোচনা করতে চান। মণ্টেগু সাহেব শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্ম ভারতে এসেছেন এবং সম্প্রতি কলকাতায় বিভিন্ন রাজনীতিক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রছিলেন। আমাদের পার্টির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যারিস্টার মিস্টার এস. এন. হালদারের মারফত খবর আসে যে, মণ্টেগু সাহেব আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গেও গোপনে দেখা করতে চান। আমাদের তরফ থেকে একজন ব'লে আসেন যে, "দেখা ক'রে আর কি হবে—আমরা কোনো আপোস-রফা চাই না; পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র কাম্য।" তখনকার দেউলিয়া-নেতৃত্ব এর বেশী আর কিছু বলার খুঁজে পায়নি। বড় নেতারা সব জেলে। আমি বলেছিলাম, "নেতাদের মুক্তি দাবী করেননি কেন? জেলে নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুরোধ করতেও তো পারতেন।" মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জি ও মিঃ এস. এন. হালদার আমাদের হয়ে মণ্টেগু সাহেবকে সে-অনুরোধ করেছিলেন। এই ব্যারিস্টার দু'জন অনুশীলন দলের সমর্থন ছিলেন।

বিপ্লবী আন্দোলনের নীতি ও আদর্শ

১৯০০ সাল থেকে ১৯২০ সাল অবধি সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কল্পনা নিয়ে বাঙলার বিভিন্ন যুবক সমিতি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন করে। ১৯০৫-১৯০৬ সালের স্বদেশী-আন্দোলন এই অগ্নিযুগ সৃষ্টির ও প্রসারণের সহায়ক হয়। সাম্রাজ্যবাদী শোষণে আমাদের চিরাচরিত অর্থনীতিক কাঠামো ভেঙে যাওয়ায় মধ্যবিত্ত জমিদার-তালুকদার শ্রেণীই আঘাত পায় বেশী। জমির আয় থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা প্রথমে চাকুরীর সন্ধানে ছুটে। চাকুরী যখন জুটল না, তখন সর্ব্বত্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে; সেই অসন্তোষ থেকেই ইংরেজ বিদ্বেষ, সন্ত্রাস-বাদের উদ্ভব। আমাদের ছোট বেলায় আমরা লোকের অভাব, দুঃখ-দারিদ্র্য ও ইংরেজ শাসনের জুলুম-অত্যাচার দেখেই স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হই; সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অরবিন্দ ঘোষের শুভেচ্ছা ছিল এর গোড়ায়। প্রমথ মিত্রের অনুপ্রেরণায় ও উদ্যোগে শতাব্দীর প্রথমেই বাঙলায় অনুশীলন সমিতি যুবক চিত্তে বৈপ্লবিক চেতনার সঞ্চার করে। পুলিন দাস পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙলায় যুবকদের সামরিক সংগঠন এবং সামরিক নিয়মশৃঙ্খলা প্রবর্ত্তন করেন। যতীন মুখোপাধ্যায় ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে লড়াই ক'রে জীবন দিয়ে সংগ্রামের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলেন। ব্যক্তিগত আক্রমণমূলক সন্ত্রাসবাদই ছিল

তখনকার কার্য্যধারা। যুদ্ধের সময় ১৯১৫ সালে ব্যাপক বিদ্রোহের পরিকল্পনা হয়।

স্বদেশী-আন্দোলনের পর বাঙলায় প্রদেশব্যাপী কোনো রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। কংগ্রেস তখনো কলকাতা কেন্দ্রে অবস্থিত। গুপ্ত সমিতিই একমাত্র বাঙলাদেশ ব্যাপী রাজনীতিক সংগঠন।—বাঙলার বাইরেও এই সমিতি বিস্তার লাভ করে। গুপ্ত-সমিতির কর্ম্মীরাই সর্ব্বত্র সংগঠন বিস্তার ক'রে সন্ত্রাসবাদী কাজের দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবপ্রবণ যুবকদের মনে স্বাধীনতার উদ্দীপনা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের রোমান্স জাগিয়ে রেখেছিল। স্বদেশের জন্য মৃত্যু বরণ করেছে এরাই,—কারাগার, লাঞ্ছনা, অত্যাচার এরাই মাথা পেতে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ "তাঁর কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" প্রবন্ধে এই যুবকদেরই একমাত্র সত্যিকার ত্যাগী নিষ্ঠাবান কর্ম্মী ব'লে পরিচয় দিয়েছেন (১৯১৭ সালের ৪ঠা আগস্ট তারিখে রামমোহন লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই প্রবন্ধ পাঠ করেন।)

গভর্নমেণ্ট আমাদের এনার্কিস্ট দল (anarchist party) বা উচ্ছৃঙ্খল নামে অভিহিত করেন। বিপ্লব করার উদ্দেশ্যে কাজ করি বলে আমরা নিজেদের বলতাম বিপ্লবী। সুতরাং আমাদের দল বিপ্লবী দল। 'বিপ্লব' বলতে আমরা রাষ্ট্র-বিপ্লব বুঝি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করার কাজই বিপ্লব। সে-সংগ্রাম করবে কে? সংগ্রাম শক্তিতে শক্তিমান স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ সর্ব্বত্যাগী সাহসী যুবকগণই এ-কাজে অগ্রণী হবে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের নিয়েই আমরা সঙ্ঘ গঠন করেছি। সাধারণ শ্রেণীর জনগণের ভিতর তখনো কোনো রাজনীতিক চেতনা আসেনি। জনসাধারণের সংগঠন ও আন্দোলনের খেয়ালও আমাদের মনে আসেনি। আমরাই দেশের সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের জন্য কাজ করি—আমরাই সর্ব্বসাধারণের

হয়ে কথা বলার অধিকারী এমনি ধারণা নিয়েই আমরা কাজ করছিলাম। সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের কোনো সংজ্ঞা (definition) আমাদের জানা ছিল না ; সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণের কোনো আইডিয়া মনের কোণে স্থান পায়নি। ভাবপ্রবণ বাঙালী যুবকেরা স্বদেশ হিতৈষণার প্রেরণায়, রোমান্সের উদ্দীপনায় আমাদের দলে যোগ দিত। অনেকে একবার জেল খেটে বা পুলিসের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে ঘরে ফিরে যেত।

মানুষের দাস-মনোবৃত্তি সুলভ দুর্ব্বলতা, স্বার্থপরতা যুবকদের স্বার্থের প্রতি আকৃষ্ট ক'রে রেখেছিল। একদিকে সরকারী লাঞ্ছনা ও পীড়ন অন্য দিকে সাড়াহীন, স্পন্দনহীন নিরাশা-মগ্ন জনসাধারণ—এ-সঙ্কটে যুবকদের উদ্দীপনার মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ত। ব্যক্তিগতভাবে অধিকাংশ কর্ম্মীই শেষ অবধি লক্ষ্য পথে টিকে থাকতে পারেনি, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলেছে মুক্তির লক্ষ্য পথে।

প্রথমটায় আমরা স্বদেশী দলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারাই পেয়েছিলাম। ভারতের গৌরবময় অতীতের সনাতন সভ্যতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য। রাম-রাজ্য স্থাপনের পটভূমিকায় ছিল আমাদের লক্ষ্য পথের সাধনা। দেশীয় রাজ্যের কোনো রাজাকে ভারতের সিংহাসনে নির্ব্বাচন করার আলোচনাও চলতো পরে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের আলোচনা হত। ১৯১৫ সালের সঙ্কল্পিত বিদ্রোহের ঘোষণা-বাণীতে ভারতে প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কল্পনা করা হয়। আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের আদর্শেই ভারতের ওই রকম রাষ্ট্র পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। কংগ্রেসের দাঁবী এ-সময় গিয়েছে ইংরাজের অধীনে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করা অবধি।

পূর্ব্ববঙ্গে আমরা জমিদার মহাজনের অত্যাচার ও শোষণ চোখের উপর

দেখেছি বলে, এই দুর্নীতির উচ্ছেদ কামনা করেছিলাম। কখনো মনে হত, স্বাধীনতার পর অত্যাচারীদের বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে সত্যপরায়ণ প্রজা-রঞ্জনকারী জমিদার এবং ন্যায়পরায়ণ নির্লোভী মহাজন গড়ে তোলা সম্ভব হবে। মোটের উপর আমাদের ভাবধারা নিতান্তই ঘোলাটে ও অস্পষ্ট ছিল। যে সহজ সরল বিশ্বাস নিয়ে আমরা কাজ ক'রতাম তা হচ্ছে এই যে, একবার স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পারলে সব দুঃখ-দুর্গতি দূর হয়ে যাবে—সব মালিন্য দূর হয়ে যাবে। মানুষ সদ্‌ভাবাপন্ন হয়ে সকলে মিলে-মিশে সুখে সমাজ-জীবন যাপন করবে।

প্রথম দিকে ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত হয়েই আমরা কাজ ক'রতাম। ধর্ম্মের ভিত্তিতেই আমাদের রাজনীতিক জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়েছিল। তা' আবার বিবেকানন্দ প্রদর্শিত সুসংস্কৃত হিন্দু ধর্ম্ম। তখন আমরা কোনো 'এ্যাকশন' বা আক্রমণ করতে যাওয়ার আগে দেবীর আশীর্ব্বাদ স্বরূপ নির্ম্মাল্য নিয়ে যেতাম। কালী প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে দেশ-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করার শপথ গ্রহণ করাও হ'ত।

তারপর ক্রমশ সঙ্কীর্ণতা কেটে যায়। আমরা বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধী হয়ে উদার মতাবলম্বী হয়ে পড়ি। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সম্বন্ধে পার্টির কোনো পরিস্ফুট ভাবধারা ছিল না বলে বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ ক'রে পল্লীতে সঙ্ঘগুলি বেশী কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। নূতন ছেলেদের দলে ভর্ত্তি করার সময় নানারকম ভ্রান্ত অলৌকিক অনুষ্ঠান অবলম্বিত হত। মুসলমানদের দলে নেওয়া সম্বন্ধে কারুর কোনো উৎসাহ ছিল না এবং একটা অবিশ্বাসের ভাবই বিদ্যমান ছিল।

১৯১৭ সালের মাঝামাঝি দু'জন শিক্ষিত বিপ্লবীর সঙ্গে একত্রে থাকা কালে সমাজতন্ত্রবাদের কথা শুনি। তাঁরা সমাজতন্ত্রবাদ অপেক্ষা নৈরাজ্যবাদ (anarchism) উচ্চতর আদর্শ বলে মনে করতেন। বাকুনিন

ও অন্যান্য এনার্কিস্টদের নামও শুনি। বাকুনিনের "ভগবান ও রাষ্ট্র" (গড এ্যাণ্ড দি স্টেট) বই পড়ি। নূতন ভাবধারা বেশ ভালই লাগে। সুশীল লাহিড়ী নামে যুক্তপ্রদেশের একজন বিপ্লবী কর্ম্মী বিবেকানন্দের সমাজ-আদর্শকে ভারত-সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করতেন। লক্ষ্ণৌতে তাঁর ফাঁসী হয়। বিনায়ক রাও কাপ্‌লে সমাজতন্ত্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ ইত্যাদি পাশ্চাত্য নূতন মতবাদ পছন্দ করতেন। উত্তরপাড়ার অমর চ্যাটার্জ্জী এই দুই মতের সমন্বয় সাধনের কথা উল্লেখ ক'রে বর্ত্তমানে দেশের স্বাধীনতাই প্রধান চিন্তনীয় বলে আলোচনা করতেন। বস্তুত দেশের বিপ্লবী কর্ম্মীদের মধ্যে কোনো মতবাদের ধারণাই সে-সময় ছিল না। কার্ল মার্ক্‌সের নাম আমরা তখনো শুনি নি। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় রুশ বিপ্লব (ফেব্রুয়ারী বিপ্লব) সম্বন্ধে একটি ছবি আসে। আমি বন্ধুদের সঙ্গে সেই সিনেমা দেখে উদ্দীপিত হয়ে আসি। বৃটিশ ধনতন্ত্রবাদীর তৈরী ছায়াচিত্র তার নিজস্ব ধারণানুযায়ী রচিত হওয়াই স্বাভাবিক। তবু অত্যাচারী রুশ সম্রাটের পতন, রুশ রিপাব্লিকের (প্রজাতন্ত্র) উত্থান আমাদের ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল ও বাস্তব ক'রে তুলেছিল। আজ দীর্ঘকাল পরে সেদিনের কথা মনে হলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। আমরা মনে করেছিলাম, নিহিলিস্টদের সাধনা এতদিনে পূর্ণ হল। রুশিয়ার বিপ্লবের কত পূর্ব্বেই যে নিহিলিস্টদল বিলুপ্ত হয়ে নূতন গণতান্ত্রিক চেতনায় রুশজাতি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল আমরা তখন তা জানতাম না, গণ-সংগঠনের বিপ্লবী শক্তি তখন আমরা এতটুকুও হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। জগতের অগ্রগতির পথে আমরা এক শতাব্দী পিছনে পড়েছিলাম। অক্টোবর বিপ্লব যে কি অমূল্য সম্পদ নিয়ে এসেছিল বিশ্বের নির্য্যাতিত জনগণের দুয়ারে, আমাদের মাথায় তা প্রবেশ করেনি। জারতন্ত্রের উচ্ছেদটুকু আমাদের খুব ভাল লাগে এবং এর থেকে

আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের প্রেরণা পাই। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব আমাদের তদানীন্তন বিপ্লব-আদর্শের সঙ্গে কতকটা খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু এ-বিপ্লব রুশ-জনগণের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারেনি, কৃষককে জমি দিতে পারেনি, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি,—তাই না এ-বিপ্লবের ব্যর্থতা! ইতিহাসের গতিপথে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব নিতান্তই কালাতিক্রান্ত ও অকেজো। পরবর্ত্তী অক্টোবর (১৯১৭) বিপ্লব সময়োচিত এবং তার যথার্থ পরিণতি—যা রুশিয়ার জনগণের তদানীন্তন সমস্যাগুলির বাস্তব ও প্রকৃষ্ট সমাধান দিতে পেরেছিল। প্রথমটি আমাদের আকৃষ্ট করে—এর অসাফল্য যে দ্বিতীয় পরিণতি অবশ্যম্ভাবী ক'রে তোলে, সে-বিষয়ে আমরা অবহিত হইনি। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুক্তিযুক্ত পরিণতিই হল অক্টোবরের গণ-বিপ্লব।

আমরা স্বাধীনতা পেলেই খুশী। পৃথিবীর সব দেশই স্বাধীন হোক —এমন একটা উদার মনোভাব আমরা পোষণ করতাম। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হ'লেও ধনতন্ত্রবাদ উচ্ছেদের কোনো কল্পনা আমাদের মনে আসেনি। কলকারখানার শিল্পোৎপাদন ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠবে নূতন স্বাধীন ভারত। মধ্যযুগীয় জমির মালিক, আধুনিক যুগের কলকারখানার মালিক—এই উভয় রকম মালিকানা স্বত্ব স্বীকার করেই ছিল আমাদের ভারত গড়ার কল্পনা। ১৯১৫ সালে যুদ্ধের সময় ভারতের বিপ্লবী-নেতৃত্ব বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের আদর্শ স্বাধীন-ভারতের আদর্শ বলে ঘোষণা করে।

রাজবন্দী জীবন

আগেই ব'লেছি, ১৯১৮ সালের প্রথম ভাগে কলকাতা হাইকোর্টের সামনে ধরা পড়ি। প্রায় পাঁচ বৎসর আত্মগোপন ক'রে চলার জীবনের অবসান হল। ঘর বাড়ী নেই, নিজস্ব সম্পদ নেই—দলের স্বদেশী কর্ম্মী ছাড়া আত্মীয়স্বজন কেউ নেই—ছন্নছাড়া, তবু অতি প্রীতিদায়ক এই পাঁচ বৎসরের জীবন। কেবল ফুর্ত্তি, আনন্দ, কর্ম্মোদ্দীপনা। প্রতি দিনের সংগ্রামের জীবন, প্রতিদিনেব সতর্ক জীবন—তবু তার ভিতরেই আছে পূর্ণ এক পরিতৃপ্তি। যাদের মরণের ভয় নেই,—বিদ্রোহের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে যারা মৃত্যুর গর্জ্জন সঙ্গীতের মত শুনেছে,—যারা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেই কাজে নেমেছে, প্রতিটি সংগ্রামাত্মক কাজে মৃত্যু যাদের হাত-ছানি দিয়ে ডাকে, তাদের—সেই সকল গোপন বিপ্লবী-কর্ম্মীদের অফুরন্ত আনন্দের উৎস রোধ ক'রবে কে! আমার যৌবনের সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ—যার অপূর্ব্ব স্মৃতি আমি ভুলতে পারিনি তার পরিসমাপ্তি ঘটে এই গ্রেপ্তারে।

ইলিসিয়াম রো স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের অফিসে আমাকে ৪।৫ দিন আটকে রেখে নানাবিধ জিজ্ঞাসাবাদে উত্যক্ত ক'রে তোলা হয়। ওখানে আমার কাপড়, জামা, জুতা, গায়ের চাদর কেড়ে নিয়ে শুধু একটি নেংটি পরতে দেওয়া হয়। ওই নেংটি

প'রেই ওই ক'দিন রাত দিন চেয়ারে বসে কাটাতে হয়েছিল। তন্দ্রা এলে ঘাড়ের চুল ধরে উল্টা দিকে হেঁচকা টান মেরে ঘুম ভাঙিয়ে দিত। দৈনিক ২।৩ কাপ চা আমার খাওয়ার ব্যবস্থা, এর বেশী কিছু নয়। অবশ্য আমি কখনও ওসব চাইওনি। পুলিসের ইনস্পেক্টার ও ডেপুটি সাহেবরা পালা বদল ক'রে একজনের পর আর একজন এসে আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে তোলেন। বন্দুক কাঁধে দু'জন সিপাই দু'দিকে সর্ব্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। প্রশ্নের উত্তর না পেলে কথায় কথায় আমাকে ভয় দেখান হ'ত যে, অন্ধকার ঘরে নিয়ে হাড় গুঁড়ো ক'রে ফেলার ব্যবস্থাও আছে।··· 'তখন তো সবই বলে দেবে, এখন বললে হাড় ক'খানা রক্ষা পেত!' অকথ্য ইতর ভাষায় গালাগালি ক'রে যেত কোনো কোনো ভদ্র-বেশী ইনস্পেক্টার। একদিন এক স্পেশাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এসে আমার বাঁ পা তুলে ধরে একটা কাটা দাগ দেখে নিলে। তারপর পা-টা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, 'ওটা কিসের দাগ?'

উত্তর দিলাম, 'ছোট বেলায় কেটে গিয়েছিল।'

সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলো ইংরেজিতে: "হারামজাদা শূয়ার, আমি জানি তুমি বোমা ছুঁড়েছিলে...(অমুক) জায়গায়। এ তারই লোহার টুক্‌রোর কাটা চিহ্ন। তাই না?"

আমি বিস্মিত হয়ে সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সাহেব একটা বড় খাতা এনে দেখালে। ওতে লেখা রয়েছে, আমার পায়ের কোন স্থানে কত ইঞ্চি পরিমাণ দাগ আছে এবং কোন তারিখে কোথায় বোমার টুক্‌রো পায়ে বিদ্ধ হয়েছিল। লেখা দেখিয়ে সাহেব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। 'আমি ওসব কিছুই জানি না' বলতেই সাহেব হিংস্র হয়ে ওঠে—বুটের ঠোক্কর দিয়ে সজোরে আমার বুকে একটা ঘা মেরে চলে যায়। আমি চেয়ার শুদ্ধ পড়ে যাই, এক মিনিটের মধ্যে

আমার মাথা ঘুরে বমি হয়ে যায়। এরপর পুলিস আমাকে এক গ্লাস জল দিল। দিন তিনেক পর এই এক গ্লাস জল পেলাম।

সেইদিন রাত দুপুরে একটা ছোট ঘরে আমাকে নিয়ে যায়। কলকাতা স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের হেড অফিস—নির্ম্মম ও হিংস্র প্রকৃতি পুলিসেরই ভিড় এখানে—যেন যমপুরী। কেন এখানে নিয়ে এল ভেবে পাই না। একটা হারিকেন বাতি টিম্‌টিম্ ক'রে জ্বলছে। গেল দু'বছর যে-মারধর ও নির্য্যাতন চলেছিল তারই পুনরাবৃত্তি হবে কি? মনে মনে ভগবানকে ডেকে বলি, 'ভগবান, মনের বল না যেন ভাঙে।' এক কোণে এক যুবক বসে আছে—হাতে তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—চুলগুলি রুক্ষ। পুলিস হাত ধরে টান দিয়ে ওরই সম্মুখে আমাকে নিয়ে বসাল। 'এসেছেন—পারলেন না আরো কিছুদিন বাইরে থাকতে' বলেই যুবকটি মুচ্‌কি হেসে আমার দিকে তাকাল। যুবকটি আমাদের বন্ধু 'কিষ্ট সাহা।' মাস তিনেক আগে ধরা প'ড়ে এই যমপুরীতে এসেছে। সে আমাকে বল্‌ল, 'এখানে যে কি নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছি তা আর বলার নয়। এই দেখুন ওরা আমার হাতটা ভেঙে দিয়েছে। পারবেন কি এত যন্ত্রণা সহ্য করতে? তার চেয়ে দু'চার কথা বলে দিয়ে চলুন বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করি।' কথা শুনেই সন্দেহ হল 'কিষ্ট সাহা' যেন পুলিসের হাতের লোক হয়ে গেছে। দলের পুরানো লোক—সাহসী বলে খ্যাতি ছিল। এত অধঃপতন কি করে হয়! আমি সহ্য করতে না পেরে ওকে একটা লাথি মেরে ব'ললাম, 'বিশ্বাসঘাতক!' সে চেঁচিয়ে উঠল—পাশের দুয়ার খুলে গেল। এক ইনস্পেক্টার বাবু ছুটে এসে 'কিষ্ট সাহাকে' সরিয়ে নেওয়ার জন্য সিপাইকে নির্দ্দেশ দিল। সকলেই চলে গেল। এক যুবক সিপাই আমাকে নিয়ে ওখানে রইল। এ-সময় সিপাইটি চুপে চুপে বল্‌ল, 'বাবু, এ শালা হারামী হ্যায়, আপ কুছু মাৎ বলিয়ে।' আমি

কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে সেপাইর দিকে তাকালাম,—এ দৈত্যপুরীতেও কি প্রহ্লাদ আছে? এমন সময় অপর একটি সেপাই ঘরে ঢুকে পড়ল। আমাকে সারা রাত এ-ঘরেই বসিয়ে রাখলে। নিদ্রার আবেশে চোখ আমার এক একবার ভেঙে পড়ে। দু'ঘণ্টা পর পর সেপাই বদলী হয়। শেষ রাত্রে এক ছোকরা গোছের গুপ্তচর এসেই ব'লল, 'আপনার কপালে অশেষ দুঃখ আছে। ঐ কম্বল আর ঐ লোহার ডাণ্ডা যা দেখ্ছেন, তা আপনাদের মত বেয়াড়া লোকদের জন্যই রাখা হয়েছে। কিষ্ট সাহা দোষ স্বীকার করতে দেরী করেছিল বলেই তার হাতটি ভেঙে দিতে হয়— পরে সে সব কিছু বলে দেয়। গৌহাটির ঠিকানাও আমরা তার কাছেই পাই।' আমি নীরবে শুনি। তখন বুঝতে পারি, আমার ধরা পড়ার মূলেও কিষ্ট সাহার কারসাজি ছিল। লাটসাহেবের নির্দ্দেশে তখন দৈহিক নির্য্যাতন অর্থাৎ মারধর বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ভীতি সঞ্চার ক'রে স্নায়বিক নির্য্যাতন বন্ধ হয়নি। আমার কাছ থেকে কিছু কথা বের করার আশা তা'দের ছাড়তে হ'ল।

শীর্ণ অবসন্ন দেহে কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলের চুয়াল্লিশ নম্বর সেলের এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করি ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে। তালা বন্ধ নির্জ্জন কক্ষে কত কথাই না মনে আসে: প্রথম বোমার মামলার আসামী বারীন ঘোষ ও তাঁর সহকর্ম্মীরা এখানে ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ এখানে ধ্যানমগ্ন চিত্তে বাসুদেব দর্শন করেছিলেন। কানাই দত্ত ও সত্যেন বসু এখান থেকেই ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামকারী শহীদের পাদস্পর্শে পূত এই পীঠস্থান প্রেসিডেন্সী জেলের 'চুয়াল্লিশ-সেল', এখানে এসে গৌরব বোধ করি—অন্তরের গ্লানি কেটে যায়। কিছুদিন পর ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশন অনুযায়ী স্টেট-প্রিজনার ক'রে হাতে হাতকড়া দিয়ে আমাকে রাজসাহী জেলে নিয়ে

যায়।তিন বৎসর জেলে পড়াশুনা, চিন্তা ও আলোচনার ভিতর দিয়ে অনেক কিছুই শিক্ষা লাভ করি। ইংরেজের যুদ্ধ জয়ের পর আমরা সর্ব্ব প্রথম খবরের কাগজ পড়ার অনুমতি পাই—"দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান"।

সন্ত্রাসবাদ ও রাজদ্রোহাত্মক আন্দোলন দমন কল্পে গভর্নমেণ্ট রাউলাট কমিশন নিয়োগ করে। রাউলাট কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী কঠোর দমন-নীতি মূলক আইন প্রণয়ন করার বিরুদ্ধে গান্ধীজী প্রতিবাদ করেন। তার সঙ্গে ১৯১৯ সনের ১৩ই এপ্রিল অমৃতসর জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হয়। ১৯২০. সালে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতের মুসলমানরাও কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে গভর্ন-মেণ্টের বিরুদ্ধে অসহযোগ ক'রে খেলাফত আন্দোলন জাগিয়ে তোলে। জেলের ভিতর আমরা রাজবন্দীরা এই সব খবর পড়ে আলোচনা করি। এই বৎসর ভারতের বিচ্ছিন্ন শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ঐক্যবদ্ধ হয়। আগ্রা জেল থেকে আগত এক বন্ধুর কাছে খবর পাই, বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত অনুশীলন সমিতির নেতা গিরিজা বাবু আগ্রা জেলে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। তিনি আরও বলেন যে, আমাশয়ে মাসখানেক ভোগার পরও যখন রোগ সারে না, তখন ডাক্তার অজ্ঞাতকুলশীল বাঙালী কয়েদীকে একমাত্রা বিশেষ ওষুধ খাইয়ে দেন; যার ফলে গিরিজা বাবুর জীবনের অবসান হয়। গিরিজাবাবুর প্রকৃত নাম ছিল নগেন্দ্র দত্ত। ইনি শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী।

রুশিয়ার বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাত "স্টেটস্‌ম্যান" কাগজ; তারই ভেতর দিয়ে আমরা রুশিয়ার বিপ্লব বুঝতে চেষ্টা করি। এ-নূতন বিপ্লব পৃথিবীর পরাধীন জাতি ও আর্ত্ত মানব জাতির কাছে যে সুখ, শান্তি ও স্বাধীনতার নূতন বাণী নিয়ে এসেছে আমরা রাজবন্দীরা তাতে উল্লসিত

হই। চন্দননগরের বসন্তদা বাঙলায় অর্থনীতির বই লিখ্‌ছিলেন, একদিন মনের উল্লাসে তাঁকে ব'ললাম, 'বসন্তদা, রেখে দিন এ-বই লেখা। লেনিনের দেশ রুশিয়া নূতন 'অর্থনীতি' তৈরী করছে, ধনীর অর্থনীতি আর চলবে না।" বসন্তদা গম্ভীর মেজাজে উত্তর দিলেন, "এ-দেশে তা অনেক দূরের কথা।"

৩ বৎসর পর ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে মুক্তি লাভ করি। কয়েক-দিন পূর্ব্বেই নাগপুর কংগ্রেসে স্বরাজের আদর্শ গৃহীত হয় এবং অহিংস অসহযোগ নীতি ঘোষিত হয়।

অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন

১৯২১-২৩

জেল থেকে বাইরে এসেই আমি আবার স্বদেশী কাজে লেগে যাই। যুদ্ধাবসানে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন বন্যার প্লাবনের মত সমস্ত ভারত ও সমগ্র বাঙলায় ছড়িয়ে পড়েছে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি জনসাধারণ খুব আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করেছে। হিংসা-পন্থীদের নিন্দা পথে-ঘাটে; যেখানে সেখানে তাদের অপমান করা হয়। কংগ্রেসে "ভায়োলেন্স" বা হিংসা-পন্থীদের স্থান নাই। অহিংস আন্দোলনের জয়-জয়কার। ইংরেজের দুর্দ্দিনে সশস্ত্র বিপ্লব-পন্থীরা কিছু ক'রে উঠতে পারেনি। সুতরাং অহিংস পথই ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের একমাত্র পথ—সকলেরই মনে এ-বিশ্বাস বদ্ধমূল। পুলিন দাসের নেতৃত্বে আমরা এ-স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ালাম। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উল্লেখ করে তিনি বলতেন, 'গান্ধী দেশটাকে কুলীর দেশে পরিণত করে ফেল্‌লেন। সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া দেশের স্বাধীনতা আসবে না।'

অনুশীলন পার্টি আমাকে বরিশাল জেলা সংগঠনের পরিচালন ভার দেয়। এখন আর গুপ্ত-সমিতি নাই; সকল সন্ত্রাসবাদী দলই প্রকাশ্য আন্দোলনে কাজ করে। আমাদের দল ছাড়া সকল দলই স্বার্থোদ্ধারের

সাময়িক উপায় বা ‘পলিসি’ হিসাবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন স্বীকার করে নিয়েছে। অতীতের অজ্ঞাতকুলশীল বিপ্লব-প্রয়াসী কর্ম্মীরা এখন বাঙলার সর্ব্বত্র প্রকাশ্যভাবে যুবক সংগঠন, লাইব্রেরী ও ক্লাব গঠন এবং কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ ক’রেছে। আমি ১৯২১ সালে বরিশাল জেলা কংগ্রেসের কাজে বিশেষ অংশ গ্রহণ করি; কিন্তু যখন অহিংস-সংগ্রামে বিশ্বাস করার নীতি স্বীকার ক’রে প্রতিজ্ঞা পত্র সই ক’রে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার নির্দ্দেশ এলো, তখন স্বরাজ লাভের জন্য ‘অহিংস-সংগ্রামে বিশ্বাস করি’ এ-কথা মেনে নিতে অস্বীকার করায় কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াতে হ’ল। এতে বরিশালের অনেকের নিকটই অপ্রিয় হ’লাম। গান্ধীর আন্দোলনে ভারতে যে প্রথম গণ-চেতনার উন্মেষ হয় তাতে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রয়োজন হবে না—এই রকম ধারণাই লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমানের একতাবদ্ধ আন্দোলন ও লক্ষাধিক লোকের কারাবরণই এমন ধারণার কারণ।

সকলের নিন্দা-অখ্যাতি অগ্রাহ্য ক’রে আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের নামে দল গঠনের কাজ চালিয়ে গিয়েছি। তখনকার অবস্থায় দলের প্রসারতা লাভের সম্ভাবনা ছিল না,—কোনোমতে টিকে থাকা মাত্র। গান্ধীজীর কথামত এক বৎসরে ‘স্বরাজ’ লাভ না হওয়ায় এবং চৌরিচৌরায় বিদ্রোহী জনগণের অভ্যুত্থানের ফলে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় “অহিংস” পন্থার প্রতি লোকের আস্থা কমে যায় এবং আমাদের সংগঠনের প্রতি আবার বিশ্বাস ফিরে আসে।

বছর দু’য়েক যেতে-না-যেতেই নেতা পুলিনবাবুর কর্ম্মপন্থায় আমরা আস্থা হারাই। তাঁর বিরাট পরিকল্পনা অনুযায়ী সশস্ত্র বিপ্লব কোনো-দিন কার্য্যকরী হাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, ছোট ছোট কারখানায়

বড় বড় অস্ত্র তৈরী ক'রে বিদ্রোহের জন্ম তৈরী হতে হবে; গণ-সংগঠনের কোনো মূল্য তিনি দিতেন না। সত্যিকার কোনো সংগ্রাম-নীতি তাঁর কল্পনায় নাই, ক্রমশ আমরা তা বুঝেছিলাম। অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের দিনে পুলিনবাবুর পরিচালিত মিলিটারী সংগঠনই বাঙালী যুবকদের সংগ্রাম-শক্তি জাগিয়েছিল। কিন্তু তারপর বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অগ্নিদিনের খ্যাতনামা কর্ম্মীদের মত পুলিন দাসের প্রতিভাও ম্লান হয়ে যায়। সে যুগের অভাবকে তিনি মেটাতে পারেননি। যার ফলে ১৯২২ সালের শেষের দিকে আমরা অনুশীলন দলের নেতা পুলিনবাবুকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতে সক্ষম হই।

অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের পর

এ-সময় অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ার পর পুরানো বিপ্লবী দলগুলি কংগ্রেসে যোগ দিয়ে দল গঠন আরম্ভ করে। অনুশীলন ও যুগান্তর এই দুটি প্রধান দল কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দলে যোগ দেয়। চিত্তরঞ্জন আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় নেতা পার্নেলের মত বিপ্লবী-দলগুলি হাতে রেখে স্বরাজ্যদলের শক্তি বৃদ্ধি করেন। বিপ্লবীরাও নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য স্বরাজ্যদলে যোগ দেয়। বাঙালী বিপ্লবীরা কেউই গান্ধীবাদীদের পরিবর্ত্তন-বিরোধী নীতি সমর্থন করেনি। বিপিন গাঙ্গুলী, সন্তোষ মিত্র ও জ্যোতিষ ঘোষ প্রমুখ কর্ম্মীদের প্ররোচনায় একদল যুবক আবার পূর্ব্বের মত সন্ত্রাসবাদী কাজে ব্রতী হয়। এ-সময় প্রত্যেক পার্টিই নিজ নিজ দলীয় সাপ্তাহিক মুখপত্র বের ক'রেছিল। শঙ্খ, বিজলী, স্বরাজ, সারথী প্রভৃতি সাপ্তাহিক কাগজগুলি ছিল বিপ্লবীদের পরিচালিত তখনকার প্রগতিশীল পত্রিকা। আমাদের পার্টির মুখপত্র "শঙ্খ" পত্রিকায় আমি প্রায়ই প্রবন্ধ লিখতাম। সম্পাদক নলিনী গুহ লেখার জন্য আমাকে উৎসাহিত ক'রতেন। আমার লেখা 'বিপ্লবী নলিনী বাগচীর জীবন-কথা' সে-দিনে বেশ আদৃত হয়েছিল।

১৯২৩ সালে অগ্নিযুগের সংগ্রামের ঐতিহ্য বহনকারী বাঙলা আবার বিপ্লব-পথের সন্ধানে যুবশক্তিকে সংগঠিত করার চেষ্টায় অগ্রণী হয়।

.এবার কংগ্রেস, ছাত্র ও যুবক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আরো ব্যাপক-ভাবে সংগঠন-বিস্তার চলতে থাকে। "ভারত স্বাধীনতার অগ্রদূত" নামে একটি বল্‌শেভিক পত্রিকা বিদেশ থেকে বিলি করা হত। আমরা পত্রিকাখানি খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়তাম; কংগ্রেস নেতারা এ-কাগজের লেখা পছন্দ করতেন না। মুষ্টিমেয় একদল যুবক পুরানো সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় কলকাতা শাঁখারীটোলা পোস্ট অফিস লুট করে। আমরা এই ধরনের ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের উপরে আর আস্থা রাখতাম না—তার পরের পর্য্যায় সম্বন্ধে তখন আমরা চিন্তা ক'রছি। কিন্তু সরকারী আমলাতন্ত্র ঐ সন্ত্রাসবাদী কাজের অজুহাতেই ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশনে আমাদের সতেরো জনকে গ্রেপ্তার ক'রে 'স্টেট প্রিজনার' ক'রে রাখে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন দত্ত, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলী, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, পূর্ণ দাস।

১৯২২ সালে বিদেশ থেকে অবনী মুাজর্থী ও ১৯২৩ সালে নলিনী গুপ্ত ভারতে আসেন। এঁরা উভয়েই রুশিয়ার বলশেভিক দলের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। নলিনী বোমা তৈরীর কাজ জানতেন। ঢাকার দল তাঁর কাছ থেকে বোমা তৈরী শিক্ষা করার ব্যবস্থা করেন। অবনী 'মুখার্জী ছিলেন যুদ্ধের সময় জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতে বিদ্রোহ করার ষড়যন্ত্রের অপরাধে অপরাধী। ধরা পড়ে গেলে শত্রুপক্ষে যোগ দোওয়ার অপরাধে তাঁর নাকি ফাঁসীও হতে পারত। একবার বন্দী হয়ে তিনি সিঙ্গাপুর থেকে পালিয়ে যান। পরে তিনি কুমিউনিস্ট হন। কমিউনিস্ট পরিচালিত জার্মান নাবিক ইউনিয়নের সাহায্যে তিনি হাম্বুর্গ থেকে জার্মান জাহাজে বোম্বাইয়ে আসেন। ঢাকায় আমার সঙ্গে অবনী মুখার্জীর পরিচয় হয়—তিনি তখন

"গরীবের কথা" বই লিখছিলেন। স্থির হয়, বাঙলার গণ-সংগঠনের প্রেরিত প্রতিনিধিরূপে পরিচয় পত্র সহ অবনী মুখার্জী রুশিয়ায় যাবেন, আর আমি তাঁর সঙ্গে যাব : উদ্দেশ্য ছিল, বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করা। পার্টি থেকে আমাকে মনোনীত করে। পরে গোপেন চক্রবর্ত্তীরও আমাদের সঙ্গে যাওয়া স্থির হয়েছিল। ছাত্র নেতা নিরঞ্জন সেনের সাহায্যে 'অল ইণ্ডিয়া স্টুডেণ্টস্ ইউনিয়ন'-এর পরিচয়-পত্র পাওয়া যায়। মাদ্রাজের বল্‌শেভিক নেতা সিঙ্গারাভেলুর কাছ থেকে ভারতীয় মজুর-কৃষক দলের পরিচয় পত্র আনা হয়েছিল। সে ১৯২৩ সালের কথা। আমি ঢাকা থেকে শীতবস্ত্র, ঠিকানা ও পত্র লেখার সাঙ্কেতিক 'কোড' সহ কলকাতায় আসি।

কলকাতা থেকে ওয়ারেনফেল্স নামক হাম্বুর্গগামী সওদাগরী জাহাজে যাওয়া আগেই ঠিক হয়েছিল। জাহাজ ছাড়ার একদিন আগে অবনী মুখার্জীর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে উপরোক্ত জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাই। আমরা দু'জন খিদিরপুর ডকে গিয়ে দু'তিনটে জাহাজে উঠে দেখে-শুনে পরে জার্মান জাহাজে উঠি। আমরা সাধারণ গো-বেচারী লোকের মত জাহাজ দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঐ জাহাজে ওঠার এক মিনিটের মধ্যে দু'জন বাঙালী ভদ্রলোক এসে আমাদের নানা প্রশ্ন ক'রতে থাকে। আমরা তখন ইঞ্জিনিয়ারের খোঁজ না ক'রে কল-কব্জা দেখার ভান করতে লাগলাম। ভদ্রলোক দুটি আমাদের পেছন আর ছাড়ে না—জিজ্ঞাসাবাদে আমাদের বিব্রত ক'রে তোলে। গতিক ভাল নয় বুঝে আমারা এক-পা দু-পা করে নীচে নেমে আসি। আই. বি-র লোক দুটি পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললো, 'বিনা অনুমতিতে জাহাজে উঠেছেন কেন? আপনাদের সঙ্গে কি আছে তা দেখব।' ... 'কেন সবাই তো ওঠে এবং দেখে চলে যায়—' বলেই আমরা দ্রুতবেগে নেমে পড়ি।

আই. বি. পুলিস দুটি তখন পাহারাওয়ালাদের ডাক দিয়ে চেঁচাচ্ছে, 'ওই লোক দুটোকে পাকড়াও কর।' হট্টগোলের মধ্যে পুলিস 'কেয়া হ্যায়'—কেয়া হ্যায়' বলে যখন চেঁচাচ্ছে তখন আমরা দৌড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে কুলী-মজুর-খালাসীদের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছি। অবনী মুখার্জী মাস দুই পূর্ব্বে এ-জাহাজে এসেছেন। এই ওয়ারেনফেল জাহাজেই ফিরে যাবেন। তিনি নিজেই অনেককে এ গোপন তথ্য বলেছিলেন। তাতেই গোপন কথা আর গোপন ছিল না, পুলিস প্রভুদের কানে পৌঁছে যায়। অবনী মুখার্জীকে ধরার জন্যই আই. বি. পুলিস এ-জাহাজে গোয়েন্দা লাগিয়ে দেয়। বিদেশে যাওয়া স্থগিত হ'ল। অবনী মুখার্জীর সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানতাম না, তাঁর নিজের কথাই আমরা বিশ্বাস করি। পরে জানা যায়, তিনি পার্টি হ'তে বিতাড়িত হয়ে এদেশে এসেছিলেন। আড়াই মাস পর ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমাকে ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশন আইনে বন্দী করে।

আশায় ছিলাম, ইওরোপে যাব—বিপ্লবের দেশ রুশিয়া দেখব ; ভাগ্যে জুটল ইংরেজের কারাগার। ব্যথাহত চিত্তে ঢাকা থেকে সশস্ত্র পুলিস পরিবেষ্টিত হয়ে আলিপুর জেলে প্রবেশ করি। আমরা তখন ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের সমর্থক ছিলাম না। পুলিস তা জেনেও আমাদের গ্রেপ্তার করে এবং দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল বন্দী ক'রে রাখে। সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণ অচিরেই বাঙলার জাগ্রত যুবশক্তিকে জেলে পুরে দিয়েছিল। অবনী মুখার্জী পরে ইরানের পথে রুশিয়ায় চলে যান। গোপেন চক্রবর্ত্তীও রুশিয়ায় গিয়েছিলেন। নলিনী গুপ্ত কলকাতায় ধরা পড়ে' কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন।

জেলে পাঁচ বৎসর

(১৯২৩-২৮)

প্রায় আড়াই বৎসর বাইরে কাজকর্ম্ম করার পর ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৃতীয়বার ধরা পড়ি এবং পাঁচবৎসর বন্দী-জীবন যাপন ক'রে ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে মুক্তি লাভ করি। এই পাঁচ বৎসরের জেল-জীবন বিচিত্র কাহিনীতে ভরা। বাঙলা দেশের আলিপুর, মেদিনীপুর, ঢাকা, মহারাষ্ট্রের যারবেদা এবং কর্ণাটকের বেলগাঁও জেলে পাঁচবৎসর কাটাই। ১৯২৪ সনের অক্টোবর মাসে সরকার রাতারাতি অর্ডিনান্স বিধান জারী ক'রে বাঙলার বহু যুবককে গ্রেপ্তার করে। সুভাষ বসু ও সত্যেন মিত্রও ঐ সময় বন্দী হন। বহু নূতন বন্দীর আমদানীতে আমাদের কারাগারে নরক গুলজার হয়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় ছাড়াও অর্ডিনান্স জারী ক'রে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্ম্মীদের সরকার গ্রেপ্তার করতে পারে—এ ধারণা আমাদের ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের নূতন অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নেতাদের একটু চিন্তিত ক'রে তুলেছিল।

জেলে বসে অতীতের সমালোচনামূলক কথায় ও চিন্তায় আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে নূতন কিছু শিখেছিলাম বলে মনে হয় না। মেদিনীপুর জেলে অনুশীলন, যুগান্তর ও বিপিন গাঙ্গুলীর দলের

(তদানীন্তন তিনটি প্রধান বিপ্লবীদল) প্রধান নেতারা প্রায় সকলেই ছিলেন। অতীত ও ভবিষ্যতের নানা কথাই সেখানে আমরা আলোচনা ক'রতাম।

আমরা বিপ্লব চাই, কিন্তু বিপ্লব যে কি, সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা তখনো আসেনি। সন্ত্রাসবাদের দ্বারা যে স্বাধীনতা আসবে না —তাতে আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। রুশ বিপ্লবের বৈপ্লবিক সাফল্যের প্রতি আমাদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল—কিন্তু এ সাফল্যের পেছনে যে ছিল গণশক্তির অভ্যুত্থান—সে বিষয়ে আমরা বাঙলার বিপ্লবীরা মোটেই সজাগ হইনি। আসলে আমাদের বিপ্লবের আদর্শ ছিল অত্যন্ত ঘোলাটে স্বাদেশিকতার ভাবাবেগে ও স্বাধীনতার মহান প্রেরণায় পূর্ণ; একটা রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে আমাদের মানব কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা সত্য ও সার্থক হয়ে উঠবে—এই সরল বিশ্বাস নিয়েই আমরা বসেছিলাম। রুশ বিপ্লব বুঝার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের লেখা বই, অথবা বাট্রাণ্ড রাসেল, জি. ডি. কোল, ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড প্রমুখ ব্যক্তিদের সাহিত্যই তখন আমাদের সম্বল। গণবিপ্লব-বিরোধী বিলাতী সাম্রাজ্যবাদী মাসিকপত্র 'নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরি এ্যাণ্ড আফটার' (Nineteenth Century and After) পড়েও রুশ বিপ্লবের ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করতাম। অরবিন্দের 'মানব ঐক্যের আদর্শ' (Ideal of Human Uuity) পড়ে আমরা শিখেছিলাম, সমাজতন্ত্রবাদ বা রুশিয়ার বল্‌শেভিকবাদ মানব-জীবনের সমস্যার সমাধান নয়। তবু রুশ বিপ্লব যে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের দুর্গ চূর্ণ ক'রে দিয়ে পৃথিবীতে নূতন জীবনের সত্যিকার শান্তি ও স্বাধীনতার বার্ত্তা নিয়ে এসেছে—পরাধীন আমরা তা অস্বীকার করতে পারিনি। আমরা গণ-জাগরণের বুলি মাঝে মাঝে আওড়াতাম, আর জাতীয় আন্দোলনকারী শিক্ষিত ভদ্রসমাজই জনগণের প্রতিনিধি, এই মনে ক'রে আত্মতৃপ্তি লাভ করতাম।

দল থেকে অবনী মুখার্জীর সঙ্গে আমাকে বিদেশে পাঠান স্থির হয় বিদেশ থেকে দেশে পার্টির কাছে অস্ত্রপ্রেরণের জন্যে—রুশিয়ার বিপ্লবী গভর্নমেণ্টের কিংবা বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কথাটা ছিল নিতান্তই গৌণ। যুদ্ধের পর বৃটেনের সঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়ার বিরোধ চলছিল। তাতেই ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা সংগ্রামে রুশ গভর্নমেণ্ট প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সাহায্য ক'রবে—অনুশীলন পার্টির নেতারা এই রকম মনে করেন। মূল্য দিলে ইওরোপ থেকে অস্ত্র পাঠানো যাবে অবনী মুখার্জীও এরকম আশ্বাস দেন; মজুর-কৃষকের সংগঠন ও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথাও বলেছিলেন। এম. এন. রায়ের বিরুদ্ধে অবনী মুখার্জীর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সঙ্ঘে স্থান পাওয়ার জন্যে দরকার ছিল ভারতের কোনো গণসঙ্ঘের প্রতিনিধিত্বসূচক পরিচয়-পত্র—আর অনুশীলন পার্টির আকাঙ্ক্ষা ছিল অস্ত্র পাওয়ার। এ দুয়ের মধ্যে সত্যিকার সংযোগ-সূত্র কিছুই ছিল না। অন্যদলও বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ ক'রত। অস্ত্রের পরিবর্তে গণ-চেতনা উদ্দীপক পুস্তিকা প্রকাশ ও মুদ্রণের জন্য মুদ্রাযন্ত্র পাঠানোর ইঙ্গিত আসে বিদেশ থেকে। বাঙালী বিপ্লবীদের মনে গণ-বিপ্লবের কোনো ধারণাই ছিল না—কাজেই সে পথে তারা এগোয়নি।

আমরা প্রথম বন্দী দলের সকলেই ছিলাম পুরানো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী। আমাদের গ্রেপ্তার নিয়ে দেশে আন্দোলন হয়। এরই মাস তিনেক পূর্ব্বে মুজফ্ফর আহ্মদ গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকা জেলে একা "স্টেট প্রিজনার" রূপে আটক ছিলেন। আমরা তখন তাঁর কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে কোনো গুরুত্ব দিইনি। পর বৎসর তাঁকে কানপুর বল্শেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী ক'রে নিয়ে যায়। সেদিন কে জানতো, এই মুজফ্ফর আহ্মদই বসন্তের অগ্রদূতের মত ভবিষ্যৎ গণশক্তির অভ্যুত্থানের বাণী নিয়ে

এসেছেন। জেলে আলোচনার সময় যুগান্তর পার্টির একজন খ্যাতনামা নেতা বলেছিলেন, "ভারতে বিপ্লব আসবে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে; হয়তো রুশ বিপ্লবের চেয়েও উচ্চতর ও মহত্তর আদর্শ প্রতিষ্ঠা ক'রবে স্বাধীন ভারত।" স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়া সনাতন ভারতের অকাট্য শ্রেষ্ঠতার গৌরবমণ্ডিত মন নিয়ে আমরা ঐ নেতার কথায় সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম বৈ কি! মেদিনীপুর জেলে আমরা স্বহস্ত লিখিত স্বরচিত একটি মাসিকপত্র বের করতাম। ঐ পত্রিকায় অনুশীলন পার্টির এক নেতা মুসলিনী ও তাঁর ফ্যাসিস্ট যুবকদলের প্রশংসা ক'রে এক প্রবন্ধ লেখেন। আমি তীব্র ভাষায় ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ লিখি। আমারও যুক্তি বেশী কিছু ছিল না, শুধু লেখকের দারোগা মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে বলি এবং গণতন্ত্রের দোহাই দিই। এ লেখার জন্য জেলে আমাকে অনেকের বিরাগভাজন হতে হয়।

গোপীনাথ সাহা কলকাতার পুলিস কমিশনার কুখ্যাত টেগার্ট সাহেবকে গুলি ক'রতে গিয়ে ভুলে অপর একজন সাহেবকে চৌরঙ্গীর পথে গুলি ক'রে হত্যা করে। ভুল করার জন্যে গোপীনাথ দুঃখ প্রকাশ করে এবং বীরের মত ফাঁসী কাঠে গিয়ে দাঁড়ায়। ফাঁসীর আদেশ হবার পর যুবকটি কোর্টে বলেছিল, 'আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ ছড়িয়ে দেবে।' সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে স্বদেশপ্রেমিক বীরের সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক প্রস্তাব পাশ হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতেও আত্মত্যাগী স্বদেশহিতৈষী যুবকের সম্বন্ধে প্রশংসাত্মক প্রস্তাব উত্থাপন ক'রেছিলেন এবং অহিংসা মন্ত্রের ঋষি মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতেও প্রায় অর্দ্ধেক ভোট এই প্রস্তাবের পক্ষে পড়েছিল।

১৯২৫ সালে বাঁকুড়া জেল থেকে তরুণ যুবক গণেশ ঘোষকে আনা

হয় মেদিনীপুর জেলে ; পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ক'রছে এই সন্দেহে তাকে ছোট জেল থেকে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে বদলী করা হয়। দেখলাম, একটি আগুনের ফুলকী—স্বচ্ছন্দে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায় বৃটিশ রাজত্ব ধ্বংসের অনলে। কিছুকাল পরে নিরঞ্জন সেন বহরমপুর কলেজ থেকে অর্ডিনান্স আইনে গ্রেপ্তার হয়ে ফুলের মালা হাতে নিয়ে এলো মেদিনীপুরে। মালাটি আমাকে দিয়ে বললো, 'এ আপনারই প্রাপ্য।' কলেজের ছাত্ররা গ্রেপ্তারের পর তাদের প্রিয় নেতা নিরঞ্জনকে ফুলের মালা দিয়ে বিদায় অভিনন্দন দেয়। বরিশালে পড়ার সময় থেকেই নিরঞ্জন আমার পরিচিত। কিশোর বয়সে একটি সাধু-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ধর্ম্মাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। পরে আমাদের সঙ্গে মিশে ছাত্রদের নিয়ে বিপ্লবী সংগঠন তৈরীর কাজে সে দিন দিন উন্নত হয়ে গড়ে উঠেছিল। বহরমপুরের ছাত্র, প্রফেসার ও ভদ্র-লোকেরা নিরঞ্জন সেনের কর্ম্মশক্তি ও অমায়িকতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে শ্রদ্ধা করতো এবং ভালবাসতো। তারপর আসে দক্ষিণ কলকাতা যুব-সঙ্ঘের অক্লান্ত কর্ম্মী যতীন দাস। বেনারসের বিপ্লবী নেতা শচীন সান্ন্যালের সঙ্গে বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা প্রকাশের কাজে ব্যস্ত থাকা কালে যতীন দাস ধরা পড়ে। যতীন দাস ও নিরঞ্জন সেন পূর্ব্বেই দলের কার্য্য-সূত্রে আমার পরিচিত ছিল। গণেশ ঘোষের সঙ্গে এদের সৌহার্দ্দ্য ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এই জেলের ভেতর। তিনজনই প্রায় সমবয়সী। কলেজী শিক্ষা ছেড়ে জেলে এসে মিলেছে। জেলখানাকে বিপ্লবী রাজনীতি শিক্ষার কলেজে রূপান্তরিত ক'রে তোলার সাধনা ছিল তাদের। সমস্ত দলীয় সঙ্কীর্ণতা পরিহার ক'রে তারা তিনজনে সঙ্কল্প করেছিল—এবার বাইরে গিয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ ক'রবে ; প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ মূলক কাজই ছিল তাদের দৃঢ় সঙ্কল্প। আমি

নিজেও তাদের এ চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমতাবলম্বী ছিলাম। এই সুন্দর সজীব আকাঙ্ক্ষার জন্য তাদের তিনজনকে আমি ভালবাসতাম।

মেদিনীপুর থেকে চিকিৎসার জন্য আমাকে কলকাতা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে যায়। সেখানে যাওয়ার ক'দিন পরেই জেলের ভিতর এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনীতিক বন্দীরা জেলে মানুষোচিত ব্যবহার পাওয়ার জন্য দাবী করেন।* কেউ তাদের অভিযোগে কর্ণপাত করেনি; জেল ও পুলিস কর্ম্মচারীরা দণ্ডপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদী কয়েদীদের ঘৃণা করতো, আর বিনা বিচারে বন্দীদের কিছুটা পরোয়া করতো।

একদিন বাঙলার আই. বি. পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভূপেন চট্টোপাধ্যায় তাদের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হন। ভূপেনবাবু প্রায়ই রাজনীতিক বন্দীদের সঙ্গে প্রেমালাপ ক'রতে জেলে আসতেন। তাদের অন্তরের কথা জেনে নেওয়ার মতলবেই তাঁর এই আসা। এই হত্যা মামলায় অনন্তহবি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী নামে দুটি একনিষ্ঠ কর্ম্মী যুবকের ফাঁসী হয়, অপর তিনজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়। দক্ষিণেশ্বরে ধৃত ন'জন যুবক সুদৃঢ় বিপ্লবী কর্ম্মী বলে খ্যাতিলাভ করেছিল। অনন্তহরি ও প্রমোদ সাহসের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করে। সুন্দর স্বভাবের জন্য আমরা তাদের প্রশংসা করতাম, তাদের ফাঁসী আমাদের মর্ম্মান্তিক দুঃখের কারণ হয়েছিল।

ঐ বৎসর (১৯২৬ সাল) কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনেই নজরুল ইসলাম রচিত বিখ্যাত গানটি প্রথম গাওয়া হয়। বাঙালী বিপ্লবী শহীদদের রক্তমাখা ছন্দে রচিত এই গান স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকের মৃত্যুকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে।

ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান হে।
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা
দিতে কোন বলিদান হে॥

বাইরে থেকে কিছু কিছু খবর পাওয়া যেত আলিপুর জেলে। "গণবাণী" নামক সাপ্তাহিক কাগজকে কেন্দ্র ক'রে একদল লোক নাকি রুশিয়ার বিপ্লবী মত প্রচার করে। আমাদের বন্দী বন্ধুদের কাছে এ-দল সম্বন্ধে একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাবই দেখতাম। এরা নাকি একটা পিস্তলের চেয়ে একটা মজুর বা কৃষককে দলে ভিড়াতে পারলে বেশী কাজ হ'ল ব'লে মনে করে। বলা বাহুল্য আগ্নেয়াস্ত্রের উপর যারা নির্ভর ক'রে আছে গণ-অস্ত্রের উপর তাদের বিদ্রূপোক্তি স্বাভাবিক। শুনলাম, গোপেন চক্রবর্ত্তী ও ধরণী গোস্বামী অনুশীলন সমিতিতে নাকি গোলমাল পাকিয়ে তুলেছে। গণ-সংগঠন মূলক কোনো কোনো কার্য্য পদ্ধতি গ্রহণের জন্য পার্টির কাছে তাঁরা প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সে প্রস্তাব গ্রহণের জন্য জেদ করেন। গোপেন চক্রবর্ত্তী তখন রুশিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন। মোটের উপর বাইরের এই নূতন কর্ম্মপন্থার পথিকদের সম্পর্কে সত্য মিথ্যা নানা ঘটনা ও রটনা জেলের ভিতরে এসে বিপ্লবী বন্দীদের বিদ্রূপ উদ্রেক করত। আমি পার্টির প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলাম, আমার পার্টির বিপ্লবী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক আশা ও বিশ্বাস রাখতাম। পার্টির বিরুদ্ধ-বাদীদের সম্বন্ধে নেতারা যা'কিছু বলতেন তাই নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করি, মনে কোনই সন্দেহের উদয় হ'ত না। নিন্দা শুনে শুনে এই নূতন কর্ম্মীদলের বিপ্লবী সম্ভাবনা থাকতে পারে এমন কোনো ধারণা তখন আমার মনে আসেনি। আর এই নিন্দা সম্পর্কে সন্ত্রাস-বাদীদের সকলে একই মত পোষণ করতো, গণ-আন্দোলনের মর্ম্মার্থ

বুঝার কোনো চেষ্টা বা আগ্রহ আমাদের ছিল না; নেতা এবং সাধারণ কর্ম্মী সকলেই এ বিষয়ে উদাসীন। গণ-বিপ্লবের সাহিত্য তখন দুষ্প্রাপ্য। আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় সংগ্রামের সাহিত্য জেলে প্রচুর আমদানী হ'ত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "পথের দাবী' প্রকাশ হওয়ার পর সকলেই তা আগ্রহের সঙ্গে পড়ে। 'পথের দাবী'তে তখনকার বিপ্লবী মনের যথাযথ ছবি ফুটে উঠেছিল; জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, মধ্যবিত্তের স্বাধীনতা, শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন সব কিছুর সংমিশ্রণে রক্ত বিপ্লবের কাহিনীতে গাঁথা এই বই দেশে বেশ আদৃত হয়েছিল। আমরা এখানে বসে সাহিত্য চর্চ্চাও করতাম—বই লেখা, বা অনুবাদ করা বা লেখার উপাদান সংগ্রহ করা ইত্যাদি। আমি "আয়রল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস" লিখি। আমার লিখিত পুস্তকের ৭০০ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি খানি বাড়ীতে আগুন লেগে পুড়ে যায়। ডাক্তার যাদু গোপাল মুখার্জী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে একটি বই লেখেন।

আলিপুর থেকে আবার মেদিনীপুর জেলে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এখান থেকে সেরা সেরা বন্দীদের দূর দূরান্তর জেলে চালান দেওয়া হয়েছিল; আবার নূতন নূতন বন্দীদের এখানে এনে বন্দীশালা পূর্ণ ক'রে তোলা হয়। চাটগাঁর গণেশ ঘোষকে যুক্ত প্রদেশে পাঠানো হয়। আবার চাটগাঁর সূর্য্য সেন মেদিনীপুর আসেন। তারপর আমাদের বদলীর পালা—সূর্য্য সেন, নিরঞ্জন সেন রত্নগিরি জেলে; আমি ও অপর একজন বেলগাঁও জেলে (কর্ণাটক)। বোম্বাইর নিকটবর্ত্তী কল্যাণ জংশন অবধি আমরা এক সঙ্গেই যাই। পথে বড় বড় স্টেশনে আমাদের সঙ্গে মাথায় লাল পাগড়ী, কাঁধে বন্দুক পুলিস দল ও বেল্টে রিভলভার বাঁধা সার্জেন্ট দেখে লোকের দৃষ্টি আমাদের

উপর পড়ত। আমাদের এক সাথীর অসুখ হয়ে পড়ায় নাগপুর স্টেশনে আমরা পুলিসের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে থেকে যাই। আমাদের দেখার জন্য স্টেশনে ভীড় জমে যায়। নাসিকে জনতা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে আমাদের সম্বর্দ্ধনা করে। কল্যাণ স্টেশনে সাথীদের ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হয়েছিল, বিশেষ করে নিরঞ্জনকে। বিদেশে কারাগারে নিরঞ্জনের সঙ্গে একত্রে থাকার সুযোগ পেলে কেবল আমিই খুশী হতাম না—নিরঞ্জনের মা-বাবা, স্ত্রী অমিয়া সকলেই খুশী হতেন।

বাইরে গিয়ে একত্রে কাজে নেমে যাওয়ার কথাটা বিদায়ের প্রাক্কালে সূর্য্য সেনকে আবার মনে করিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ ক'রলাম। সূর্য্য বাবু হাসি মুখে হাত তুলে সম্মতি সূচক অভিনন্দন জানালেন; আমাদের গাড়ী তখন পুনা অভিমুখে চলেছে। দূর বিদেশে শৃঙ্খলিত বন্ধুরা যখন একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তার আঘাত যে কত বড় তা তখনই বুঝতে পেরেছিলাম। দুদিকের পাহাড় দেখতে দেখতে শিবাজীর দেশ পুনায় পৌছলাম। আমাদের সহযাত্রী প্রহরী দলের নেতা সার্জেণ্ট সাহেব পথে নানা কথা বলে আমাদের আপ্যায়িত করেন। তিনি গান্ধীজীকে আহ্‌মদাবাদ থেকে পুনা নিয়ে গিয়েছেন, বেশ গর্ব্বের সঙ্গেই সে কথাটা বলেন। তিনি আরো বলেন যে, আপনাদের সম্বন্ধে কঠোর নির্দ্দেশ আছে; আপনারা না কি বিপজ্জনক বন্দী।

পুনা স্টেশনে মহারাষ্ট্রীয়দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করি, পুলিসের তৎপরতায় অবশ্য তা হয়ে উঠেনি। সেখান থেকে কবুতরের খোপের মত গাড়ীতে চড়ে আঁকা বাঁকা পাহাড়ী পথে কখনো বা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে আমরা পর দিন

দুপুরে কর্ণাটকের প্রধান শহর বেলগাঁও স্টেশনে পৌঁছি। বেলগাঁওয়ে প্রায় চার পাঁচ শ' লোক আমাদের দেখার জন্য ভীড় ক'রে দাঁড়ায়। দর্শকদের মধ্যে বাঙালী ছিল না কেউই। আমাদের মাথায় টুপী বা পাগড়ী ছিল না—টিকি তো নয়ই। কাজেই আমরা হিন্দু কি মুসলমান, দর্শকদের বোঝা বেশ কঠিন হচ্ছে—তাদের পরস্পরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা হিন্দলগী সেণ্ট্রাল প্রিজনে প্রবেশ করি। জেলের কয়েদী, সিপাই ও অফিসারগণ আমাদের বাঙলার রাজা-জমিদার স্থানীয় লোক বলেই মনে করেছিল।

"স্টেট প্রিজনার" তারা কখনো দেখেনি। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার কয়েকজন শিখ বন্দী ওখানে কঠোর নির্য্যাতন ভোগ করছিলেন। তাঁরা ২৪ ঘণ্টা সেলে বন্দী থাকতেন। খাটুনী ছিল—গম পেষা। আহার—মানুষের অখাদ্য জোয়ারী রুটি, ঘাসের তরকারী, আর কলাইয়ের ডাল। দণ্ড—আজীবন দ্বীপান্তর। তাঁদের সঙ্গে দেখা করার কোনো উপায় ছিল না। আমাদের সম্পূর্ণ এক পৃথক প্রাঙ্গনে সমস্ত কয়েদীর সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা হয়েছিল। আমরা আমাদের ঘরে বসে আরব সাগরের তীরবর্ত্তী পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখতাম, আর দু-হাজার মাইল দূরের বাঙলা—স্বদেশী ভাবের জোয়ারে উদ্বেলিত বাঙলার কথা স্মরণ করতাম। কর্ণাটকে রাজনীতিক চেতনা তখন বাঙলার চেয়ে কত কম তা বুঝেছিলাম বে-সরকারী জেলপরিদর্শক, জেল ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার ও জেল কর্ম্মচারীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে। বে-সরকারী পরিদর্শক রাওসাহেব মনে ক'রেছিলেন আমারা কোনো ছোট দেশীয় রাজ্যের রাজা। গবর্নমেণ্টের রোষে পড়ে রাজবন্দী

হয়েছি। তিনি ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে কথা বলতেন। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা হলেই পরস্পরকে বুঝতে আর কোনো কষ্ট হবে না—এই তাঁর ইচ্ছা। আমরা মহারাষ্ট্রীয় ভাষা জানি না বলায় তিনি বিস্মিত হন। আরও বিস্ময়ের বস্তু, বাঙলাদেশের কলকাতা শহরের নাম তিনি জানেন বটে, কিন্তু সে যে কত দূরদেশ, তা তিনি জানেন না। জেলের ডাক্তার বিলাম পল্লী আমাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি জব্বলপুরে থাকা কালে শুনেছিলেন, বাঙালী সন্ত্রাসবাদীরা ভয়ঙ্কর জীব। আমাদের সংস্পর্শে এসে তাঁর সে ভ্রম দূর হয়। বেলগাঁও জেলে গিয়ে আমরা ব্রাহ্মণ পাচক দাবী করি। সে-দেশে এই দাবী না ক'রলে শুধু আমাদের নিজেদের মর্য্যাদা নয়, আমাদের রাজনীতিক মর্য্যাদারও হানি হত। জেলার উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাছ খাবেন তো আবার ব্রাহ্মণ পাচক চাইছেন কেন? মারাঠি পাচক ছাড়া কেউ মাছ রান্না ক'রবে না।' অবশেষে হিন্দুস্থানী ঠাকুর পাওয়া গেল।

বেলগাঁও জেলে নানা ভাষাভাষী নানা জাতির কয়েদীদের কথাবার্ত্তা শুনতে খুব ভালো লাগত। মারাঠী, কানাড়ী, গোয়াবাসী, সিন্ধী ও হিন্দুস্থানী—এই পাঁচ জাতীয় কয়েদী পাঁচটি পৃথক ভাষায় কথা বলে। আমাদের চাকর নিলাপ্পা (কানাড়ী), ঝাড়ুদার বাসাপ্পা (মারাঠী) আর হিন্দুস্থানী ঠাকুর—তিনজনে একসঙ্গে বসে কখনো গল্প করত, কখনো বা ঝগড়া ক'রত। মজা এই যে, কেউ কারুর কথা ভালো ক'রে বুঝত না। তার চেয়ে আরো উপভোগ্য হত, গোয়াবাসী সেপাইটি যখন তার নিজ ভাষায় এদের ঝগড়া মেটাতে আসত। এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে হাসির হর্‌রা উঠতো।

কাছেই রত্নগিরি জেলে নিরঞ্জন সেন ও সূর্য্য সেন ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যোগ স্থাপনের কোন উপায় ছিল না। নিরঞ্জনের স্ত্রী অমিয়ার

সঙ্গে চিঠি-পত্রালাপের ভিতর দিয়ে নিরঞ্জনের খোঁজ খবর পেতাম। বেলগাঁও থেকে পুনা যারবেদা জেলে বদলী হয়ে যাই। যাওয়ার সময় এক কানাড়ী ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী গো-রক্ষার দিকে একটু নজর রাখার জন্য আমাদের অনুরোধ করেন। আমরা বলেছিলাম, স্বাধীনতা এলেই সব কিছু রক্ষা পাবে।

সেখানে গিয়ে যারবেদা জেল বলতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কিছুই বুঝতে পারেন না। উচ্চারণ না জানায় লজ্জিত হই। বাঙলায় আমরা 'যারবেদা' জেল বলি—আসলে উচ্চারণ হ'লো 'য়েরোড়া' জেল। বিরাট জেল—বোধ হয় ভারতে এর চেয়ে বড় জেল আর নেই। বিধি-বিধানের কঠোরতা, রাজবন্দীর নির্য্যাতন এখানে খুব বেশী। ইওরোপীয় বন্দীদের প্রাঙ্গনের এক অংশে আমাদের ২।৩টি স্টেট প্রিজনার থাকার সেলগুলি। সেলের মাঝখানে ছোট্ট লোহার খুঁটিতে পোতা একটি লোহার রিং (বলয়)। লোহার রিংটা কিসের জন্য জিজ্ঞেস করায় জেলার সাহেব জবাব দিয়েছিলেন, "আপনাদের আচরণ ভালো না হ'লে ওইতে হাতকড়া দিয়ে রাখা হবে সারা রাত। ওরই জন্যে এই ব্যবস্থা।"

এই ধরনের অভদ্রোচিত উত্তর আমি আশা করিনি। উত্তরে ব'লেছিলাম, "বাঙলার দেশপ্রেমিকরা ভদ্রলোকই। আপনার আচরণেই বোঝা যাবে—কি ধরনের ব্যবহার আশা করেন আপনি।" বোঝা গেল, জেলার সাহেব রাগ চেপে গম্ভীর হলেন।

১৯১৬ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত গদর পার্টির বৃদ্ধ বন্দীদের আন্দামান দ্বীপ থেকে ফিরিয়ে এনে এ জেলে রেখেছে। অফিসে যাতায়াতের পথে তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হত—দেখামাত্র তারা দু'হাত জোড় ক'রে 'বন্দোমাতরম্' বলত। আমরাও 'বন্দেমাতরম্' ব'লে প্রত্যভিবাদন জানাতাম। ইচ্ছে হ'ত—দাঁড়িয়ে দু-একটা কথা বলি, কিন্তু উপায় ছিল না।

গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির জর্জ এলিসন জাল পাসপোর্টে ভারতে আসার অপরাধে দেড় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ঐ যুবকের সঙ্গেও দেখা হ'ল এখানে। জেলে তাঁর উপর খুব কড়া নজর ছিল—স্বভাব গুণে যুবকটি অন্য সকল বৃটিশ কয়েদীদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছিলেন। এলিসন আমাকে একদিন বলেছিলেন, "গণশক্তিকে উপেক্ষা ক'রে শুধু সশস্ত্র যুবক সমিতি গ'ড়ে আপনারা দেশের কল্যাণ সাধন ক'রতে পারবেন না। চরকা কেটেও স্বরাজ আসবে না। গণ-সংগঠনের দিকে দৃষ্টি দিন।" যুগান্তর পার্টির নেতৃস্থানীয় সুরেন ঘোষ বদলী হয়ে এখানে আসেন, কিছুদিন পর চট্টগ্রাম দলের নেতা সূর্য্য সেনও এই জেলে আসেন। নিরঞ্জন সেন বাঙলায় ফিরে যায়।

সূর্য্য সেনের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বাইরে গিয়ে একসঙ্গে কাজ করা স্থির হয়। নিরঞ্জনকে আমার একান্ত প্রিয়জন মনে ক'রে তিনি বলেন, নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। সূর্য্যবাবু শান্ত ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। নানা গল্প-গুজবে আমাদের সময় কাটত। সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে নানাকথা তো হতই, মুক্তির পর বাইরে গিয়ে খুব জোরের সঙ্গে একত্র হয়ে কাজে লেগে যেতে হবে এবং এবার একটা কিছু করতেই হবে—এমনি ধারায় আলাপ আলোচনা হত প্রায় প্রতিদিনই।

সুরেন ঘোষের সঙ্গেও আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাঙলায় বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালন সম্বন্ধে আলোচনা করি। সুরেনবাবু খুশী হয়ে বলেন—আমরা এবার সে চেষ্টা নিশ্চয়ই ক'রব। সুরেনবাবু জেলে বসে বৈষ্ণব-তত্ত্বের গবেষণা ক'রতেন এবং ব'লতেন, বাঙলার সমাজ কোনো গোঁড়ামির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে না। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের চেয়ে বাঙলায় সাম্যমূলক বৌদ্ধ আচার নীতিরই প্রভাব ছিল, পরবর্ত্তী যুগে এখানে

বৈষ্ণব মতের প্রসার হয়। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান খৃস্টান ও উঁচুজাত নিচুজাত সকলেরই এখানে সমান অধিকার। বাঙলার সমাজ গড়া হ'ল এই সাম্যের ভিত্তিতে। রাজনীতিতেও গণতান্ত্রিক সমতাই হবে এ ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি। অর্থনীতিক সমস্যার বিষয়ে তিনি নীরব ছিলেন। কখনো বা বলতেন, জাতি ও বর্ণভেদ দূর ক'রে দিলে পরে আপনা থেকেই লোকের মনে সাম্যভাব এসে যাবে; শোষণের মনোবৃত্তি ধনীর মন থেকে মুছে যাবে।

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারত গভর্নমেণ্টের নির্দ্দেশে আমাকে বোম্বাই যারবেদা জেল থেকে পূর্ব্ব বাঙলার ঢাকা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। আমার পিতা তখন বসন্ত রোগে আক্রান্ত; এই ব্যবস্থা হয় তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যই। ঢাকা জেল থেকে সশস্ত্র পুলিস পরিবেষ্টিত হয়ে আমি বাড়ী যাই।

ইস্ট বেঙ্গল রাইফেল ব্যাটেলিয়ান-এর দশ জন গাড়োয়ালী পুলিস বন্দুক কাঁধে ক'রে আমার আগে পাছে চললো আগলে। তা'ছাড়া জেলের হাবিলদার, আই. বি. ইনস্পেক্টর ও দু'জন 'ওয়াচার' (watcher) মোট ১৪ জন রক্ষী মাধবদী গ্রামে আমার বাড়ীতে আমাকে নিয়ে পৌছল। বাড়ীর সীমানার মধ্যে আমার থাকার নির্দ্দেশ ছিল—গাড়োয়ালীরা বন্দুক কাঁধে ক'রে সারা দিনরাত পাহারা দিত। 'ওয়াচার' দু-জন বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরে দেখতো, আমি কোনো বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি কিনা। গ্রামের লোক এ দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে পড়ে। মেয়েরা ঘরের বাইরে যেতে ভয় পেতে লাগল। সেপাইরা বাজারে গিয়েও চার পাঁচ জন ক'রে দল বেঁধে বন্দুক কাঁধে ঘুরে বেড়াত। খবর পেয়ে দৈনিক শত শত লোক আমাকে দেখতে আসতে লাগল। চতুর্থ দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি প্রায় সহস্রাধিক লোক আমাকে

দেখতে আসে। রাত্রে পুলিস কাউকেই আমার বাড়ীতে ঢুকতে দিত না। অকস্মাৎ পঞ্চম দিন সকাল বেলা খবর এলো যে, আমাকে আবার জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। সেদিনও প্রায় হাজার লোক আমার চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে আসে। রাইফেল বন্দুক কাঁধে নিয়ে ১০ জন গাড়োয়ালী সেনা আমাকে মাধবদী বাবুর হাট থেকে জিনার্দ্দি রেল স্টেশন অবধি পাঁচ মাইল রাস্তা মার্চ করিয়ে নিয়ে যায়। কলকাতার প্রায় সকল দৈনিক কাগজে সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ আমার বাড়ীতে সশস্ত্র গাড়োয়ালী সেনার আগমন বার্তা প্রকাশিত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম আসে।

প্রায় দু'মাস ঢাকা জেলে থাকার পর ফৌজদারী সংশোধনী আইন অনুযায়ী আমার হাতের লেখা, আঙুলের ছাপ ও ফটো রেখে আমাকে বাড়ীতে অন্তরীণ করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। তারপর ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে মুক্তি পাই।

মুক্তির পর

১৯২৮ সালের মাঝামাঝি আটক বন্দীরা মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছেন। দেশে আবার আন্দোলনের ঢেউ। কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ তখন মৃত। নেতৃত্ব করছেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা সুভাষ বসু রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ।

বিপ্লবী নেতারা জেল থেকে ফিরে এসে বাঙলার সর্ব্বত্র অভিনন্দন পাচ্ছেন যা তাঁরা পূর্ব্বে পাননি; সভা সম্মেলনে তাঁদেরই সম্বর্দ্ধনা। পতাকা উত্তোলন, উদ্বোধন ও সভাপতিত্ব করার সম্মান পাচ্ছেন তখন তাঁরাই। বাঙলার ছাত্র ও যুবক-মন আকৃষ্ট ক'রে ফেলেছে সদ্যমুক্ত বিপ্লবী কর্ম্মীরা—যাদের সাথীরা গুলিতে ফাঁসীতে মরেছে—এতদিন কারা-যন্ত্রণা ভোগ করেছে। কংগ্রেস নেতাদের চেয়েও তখন আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা বেশী।

চারিদিকে জনগণের মধ্যে নবজাগরণের সাড়া—রাজনীতিক চেতনা বেশ উদ্বুদ্ধ; সংগ্রামাত্মক নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতিতে দেশের জনসাধারণকে সুসংগঠিত ক'রে নেওয়ার এই তো প্রকৃষ্ট সময়;—এবং বিপ্লবী সংগঠন-গুলিই এ দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত।

অনুশীলন পার্টি ও যুগান্তর-সংযুক্ত দলের মনোনীত নেতারা একদলে মিলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রুদ্ধকক্ষে দিনের পর দিন মিটিং ক'রতে লাগলেন।

'যুগান্তর সংযুক্তদল' বলতে মূল যুগান্তর দলের সঙ্গে ময়মনসিংহ, বরিশাল, মাদারীপুর, হুগলী ও চট্টগ্রাম জেলার উপদলগুলির সংযোগ বুঝায়। জেলেই এ-মিলনের—সম্মিলিত দল গঠনের জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল। মুক্তির পর বিপ্লবী দলগুলি পূর্ব্বকল্পনা কাজে পরিণত করার ব্যাপারে ব্রতী হয়। 'ভিন্ন ভিন্ন বিপ্লবী সঙ্ঘগুলি একত্রে মিলে যাবে'—মিলন সাধনের পূর্ব্বেই একথা প্রচার হয়ে পড়ে। এ-মিলনে বাঙলার বিপ্লবীদল শক্তিশালী হয়ে উঠবে ব'লে যুবকগণ উল্লসিত। সত্যিই ঐক্যবদ্ধদলের শক্তি অপরাজেয় হত। নেতারা কোনো কিছু সিদ্ধান্তে পৌছতে পারার পূর্ব্বেই জেলখানায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁরা "ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘ" গঠনে উদ্যোগী হন। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও নীতি পদ্ধতি সম্বলিত খসড়া প্রস্তুত হয় সম্মিলিত বিপ্লবী দলের প্রতিনিধিদের দ্বারা। জাতীয় কংগ্রেসে তখনও "স্বাধীনতা" লক্ষ্য ব'লে স্বীকৃত হয় নি। তাঁরা এই সঙ্ঘ গঠনের ভিতর দিয়েই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ক'রেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসীদের বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নিজেরাই একটি প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনে সাহসী হ'লেন না। সঙ্ঘের উদ্দেশ্যের খসড়া কিছু পরিবর্ত্তন ক'রে সুভাষ বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর এবং আজাদ অবধি এতে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শুধু বিপ্লবীদের নিয়েই বিপ্লবীদল গঠন করার চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল, অ-বিপ্লবী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আপোস মনোবৃত্তির ফলে। সকল জাতীয়তাবাদীদের নিয়েই "ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘ" গঠিত হ'ল। আমাদের কয়েকজনের এ-ব্যবস্থা মনঃপুত হয়নি। আমাদের নেতারা একই সময়ে কংগ্রেসীদের বিরাগভাজন হ'তে এবং সরকারী রোষে পড়তে প্রস্তুত ছিলেন না। আসল কথা, বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রতিভা ও উদ্যোগ না থাকায় তাঁরা নিজেদের শক্তিতে আস্থাবান ছিলেন না।

এর কিছুদিন পরেই সকল দলের লোক মিলেই ঢাকা জিলা স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠিত হয়—আমাকে তার সম্পাদক নির্ব্বাচন করা হয়। নিরঞ্জন সেনকে সম্পাদক ক'রে বরিশালে সঙ্ঘ গঠিত হয়। অন্য কয়েকটি জেলাতেও স্বাধীনতা সঙ্ঘ স্থাপিত হয়।

বিপ্লবী দলগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা আর বেশীদূর এগোয়নি। নিজেদের দলাদলি কংগ্রেসে নিয়ে গিয়ে কংগ্রেসের দলাদলিকে আরও শক্ত ও সবল ক'রে তুললো।

১৯২৮ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন। আমরা কংগ্রেসের কাজে মনোনিবেশ করলাম। বিপ্লবীদলের সঙ্গে আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে অংশ গ্রহণ নিয়ে কংগ্রেসী নেতাদের একটা বোঝাপড়া হয়। এবারেই সর্ব্বপ্রথম দু'-হাজার যুবককে মিলিটারী পোশাকে সজ্জিত ক'রে মিলিটারী কায়দায় ট্রেনিং দিয়ে কংগ্রেস পরিচালনের ব্যবস্থা করে। বিপ্লবীদলের নেতা ও কর্ম্মীরা এই "জাতীয় সেনাবাহিনী" পরিচালনের ভার নেয়। সুভাষ বসু ছিলেন সর্ব্বাধিনায়ক (G. O. C.)।

এরই কয়েকমাস পূর্ব্বে কলকাতা ও আশেপাশে কয়েকটি মজুর ধর্ম্মঘট হয়। লিলুয়ার হাজার হাজার রেল শ্রমিকের ধর্ম্মঘট জনসাধারণের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। মজুর আন্দোলন তখন বেশ দানা বেঁধে উঠছিল। শ্রমিক ধর্ম্মঘট ও শ্রমিক আন্দোলনের বৈপ্লবিক শক্তি নিয়ে আমাদের বিপ্লবী নেতারা তখনও বড় বেশী মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু তাঁদেরই একটি শাখা যখন ছাত্র ও যুবকদের আকৃষ্ট ক'রে 'ইয়ং কমরেড লীগ' গড়ে তোলে তখন একটু চিন্তার কারণ হয়েছিল বৈ কি। যুব সংগঠন বিপ্লবীদেরই একচেটিয়া,—সেখানেও কি সাম্যবাদীরা প্রবেশ করল? এই ছিল চিন্তার কারণ। অক্টোবর মাসে কলকাতায় সমস্ত ভারতের মজুর-কৃষক পার্টির প্রথম কংগ্রেস।

পাঞ্জাবের সোহন সিং জোশ প্রেসিডেণ্ট। এলবার্ট হলে সভার অধিবেশন। আমরা কয়েকজন দেখতে গেলাম। ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্ত্তী, নীরোদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পরিচিত বন্ধুরা আদর ক'রে মঞ্চে নিয়ে বসালেন। কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের নাম শুনে আসছি কতকাল ধ'রে। প্রথমেই তাঁর খোঁজ নিই। একজন 'কমরেড' বন্ধু দেখালেন, 'এই ত আপনাদেরই সামনে।' অন্য প্রদেশের কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে তখন তিনি কথায় ব্যস্ত ছিলেন। অনেকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে সেদিন এই কথাই মনে হয়েছিল—এই সামান্য লোকটিই কি অসামান্য বিপ্লবের বার্ত্তা নিয়ে এসেছে এদেশে! সম্মেলনের বক্তারা শ্রমিক কৃষক সংগঠন ও আন্দোলনের কথা এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কথা বলার পর আমাদের নবপ্রতিষ্ঠিত "ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘের" উদ্দেশ্যে তীব্র গালাগালি দিতে থাকেন। বক্তৃতায় বলা হ'য়েছিল, ওই সঙ্ঘ একটি বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান। বুর্জোয়া স্বার্থান্বেষীরা ভাড়াটে সন্ত্রাবাদীদের সাহায্যে বুর্জোয়া স্বার্থ হাঁসিল ক'রে নিচ্ছে। ক্ষুব্ধ চিত্তে বাসায় ফিরে আসি। মজুর সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য সকলের কাছ থেকেই তিরস্কৃত হই। কমিউনিস্টদের নীতি-অনুযায়ী তারা আমাদের নিন্দা ক'রেছে, কিন্তু তাদের সাম্যবাদী নীতি কার্য্যকরী হ'তে এখনও অনেক দেরী। আমরা আমাদের কাজ ক'রে যাব, এইভাবের চিন্তা দিয়ে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিনও আবার ঐ সম্মেলন দেখতে যাই। আমি একাই যাই। সম্মেলনের পর ওঁদের শোভাযাত্রাতেও আমি যোগ দিয়েছিলাম।

কংগ্রেস অধিবেশনের দিন ঘনিয়ে আসছে। পার্ক সার্কাসে কংগ্রেস বসবে। রোজ সেখানে যাই—নানা রকম কাজে যাওয়ার ডাক আসে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা ও বহরমপুর ঘুরে কংগ্রেস অভ্যর্থনা

সমিতির কিছু কিছু সভ্য ক'রে এসেছি। দলীয় বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজও সঙ্গে সঙ্গে দেখাশুনা হয়ে গেল। সর্ব্বত্রই যুবকগণ বিদ্রোহাত্মক কাজ করার জন্য উন্মুখ। ঢাকার যুবকগণ নেতৃত্বের পুরানো ধারায় আর বিশ্বাসী নয়, চায় তারা নূতন কাজের নির্দ্দেশ। ভিতরে ভিতরে পার্টি নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষ জমে উঠেছে—তারও আভাস পেলাম। বরিশালেও ঐ একই কথা, নিরঞ্জন সেন এই খবর আনলো। প্রভাত চক্রবর্ত্তী কুমিল্লা ও অন্যান্য স্থানের পার্টি সভ্যদের সংগ্রামাত্মক কাজের আগ্রহের কথা জানায়। কংগ্রেসের সময় সকলেই কলকাতায় আসে।

ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও অন্যান্য জেলার কতিপয় অনুশীলন পার্টির যুবক মিলে কংগ্রেসের সময় পার্ক সার্কাসে একটি গোপন বৈঠকে আলোচনা করে। কাজ কর্ম্ম সম্পর্কে কি করা যায় এই ছিল আলোচ্য বিষয়। এতদিন নেতারা জেলে ছিলেন, তাঁদের মুক্তিতে আশা জেগেছিল- এবার একটা কাজের হদিস পাওয়া যাবে।" প্রথমে তাঁরা সকল বিপ্লবী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দ্দেশ দিয়ে ধৈর্য্যধারণ করতে বলেন। সে-চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। এখন অবধি কাজের কোনো কথাই নাই। নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সকলেই একমত—নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ধূমায়িত বহ্নি যেন প্রজ্বলিত হ'য়ে ওঠার সুযোগ পেল এই আলোচনার মাঝে। কাজ চাই—কাজ চাই—কাজ। কাজ মানে সশস্ত্র প্রতিরোধ। যুবকদের দুজন প্রতিনিধি আমাকে তাদের আলোচনার বিষয় জানায়। আমি তাদের গোপন আলোচনার কথা গোপন রাখতে বলি এবং নিজেদের সঙ্ঘশক্তি আরও শক্ত ও প্রসারিত করার আবশ্যকতা বুঝাই। নেতাদের দ্বারা আর বিশেষ কিছু হওয়ার ভরসা নাই। জেলের অভিজ্ঞতা থেকে তা পরিষ্কার অনুধাবন করা গিয়েছিল। লাহোর থেকে ভগৎ সিং প্রভৃতি কয়েকজন

হিন্দুস্থান সোশালিস্ট এসোসিয়েশনের বিপ্লবী কর্ম্মী কংগ্রেসে এসে দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাসের সঙ্গে একযোগে কাজ করা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বাঙলা, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব একত্রে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ ক'রলে একটা নূতন অবস্থার সৃষ্টি হবে—এই ছিল পাঞ্জাবী বিপ্লবীদের বক্তব্য। লাহোরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জাতীয় আন্দোলনকারী জনগণের উপর অত্যাচার করায় বিপ্লবীরা তাকে হত্যা ক'রতে গিয়ে ভুলক্রমে এসিস্ট্যাণ্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গুলিতে হত্যা ক'রে কাজ আরম্ভ করেছে। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশীয় বিপ্লবীরা বাঙলার বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা নিরর্থক বুঝে আমাদের সঙ্গেই কাজ করা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলেন। যতীন দাস নূতন ধরনের বোমা তৈরী শিখার জন্য এলাহাবাদ ও লাহোর যায়। ঐ একই উদ্দেশ্যে নিরঞ্জন সেন পরে চট্টগ্রাম যায়।

কংগ্রেসের সময় নিরঞ্জন সেন, দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাস ও বিনয় রায় এবং ঢাকার সতীন্দ্র রায়, ব্রজেন দাস ও অপর কয়েকজন বিপ্লবী কর্ম্মীর সঙ্গে বাঙলাদেশের নিষ্ক্রিয় অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। নিরঞ্জন, যতীন ও তাদের বন্ধুরা আগে থেকেই বৈপ্লবিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়েই ছিল। নূতন কার্য্যভার গ্রহণের জন্য তারা আমাকে উদ্বুদ্ধ করে।

এবারকার কংগ্রেস অধিবেশন বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই সম্পন্ন হয়। ভলাণ্টিয়ারদের কুচকাওয়াজ, জাতীয় পতাকা অভিবাদন, কংগ্রেস নগরে শান্তি রক্ষার সুব্যবস্থা পূর্ব্বের সকল কংগ্রেস অধিবেশনকে ছাড়িয়ে ওঠে। বিপ্লবী যুবক ও নেতারাই হয় জাতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার স্টাফ্।

কংগ্রেস নেতারা স্থির করেন, এবারও স্বাধীনতার দাবী কংগ্রেসে

তুলবেন না। বাঙালার যুবক এতে সন্তুষ্ট নয়, তারা নিষ্ক্রিয়তার দুর্গ ভেঙে চূর্ণ ক'রে দিতে চায় তড়িৎ গতিতে। বিপ্লবী যুবকদের জানিয়ে দেওয়া হ'লো, রাত্রিতে মিটিং হবে। এক ক্যাম্পে প্রায় তিনশ' যুবকের সমাবেশ হ'ল। তাদের দাবী—স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলতেই হবে। কংগ্রেসের মূল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কংগ্রেসে আমাদের সংশোধনী প্রস্তাব হবে—'অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা চাই।' কংগ্রেসী যুবক-নেতা সুভাষ চন্দ্র প্রস্তাব তুলতে নারাজ, ভারতের অন্য কোনো নেতাই তাঁকে সমর্থন করবেন না, তাই তিনি সাহস পান না। বিপ্লবী বাঙলার নব-নেতৃত্বের অবমাননা না করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হ'লো। সতীন সেন ও অন্যান্য বিপ্লবীরা বক্তৃতা দিয়ে তাঁকে উদ্দীপিত করেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি রাজী হলেন। পরদিন প্রকাশ্য কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হ'ল। সম্ভবত এক হাজারের উপর ভোটে 'স্বায়ত্ত শাসনে'র মূল প্রস্তাব পাশ হয়। আমরা প্রায় ৯০০ ভোট পেয়ে পরাজিত হই। বিপ্লবী বাঙলার রুখে দাঁড়াবার শক্তি দেখে গান্ধীজি ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী নেতারা বিস্মিত হলেন।

কলকাতার মজুর নেতাদের পরিচালনায় প্রায় ত্রিশ হাজার মজুরের এক শোভাযাত্রা পার্কসার্কাসে কংগ্রেস অধিবেশনে এসে উপস্থিত হয়। ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে তারা তাদের দাবী জানাতে এসেছিল।

কংগ্রেস নেতারা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আমাদের বিপ্লবী ভলাণ্টিয়ার-গণ তাদের গেট ছেড়ে দেবে না। শ্রমিকরাও প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করার জন্য দৃঢ়-সংকল্প। শেষ অবধি গেট খুলে দিতে হ'লো; সহস্র সহস্র শ্রমিক কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে গিয়ে বসলো। শ্রমিক-নেতারা সংক্ষেপে

তাদের কথা ব'ললেন। গান্ধিজী বক্তৃতায় তা'দের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখবেন বলে আশ্বাস দেন।

এবারকার কংগ্রেসে কমিউনিস্ট সাহিত্যের প্রচুর আমদানী হয়েছিল। তার অধিকাংশই সাম্রাজ্যবাদীদের ও ট্রট্স্কি-পন্থীদের লেখা বই। জিনো-ভিয়েভ, বুখারীনের বইও বিক্রী হয়। 'এ, বি. সি. অফ কমিউনিজ্‌ম্' নামক বইখানি বিপ্লবী দলের কর্ম্মীরা ফ্যাসান হিসাবে তখন কাছে রাখত।

ঢাকার কথা

কলকাতা কংগ্রেসের পরই আমাকে ঢাকায় যেতে হল। সেখানেই কাজ করার নির্দ্দেশ পেয়েছিলাম। ঢাকা জেলায় বাড়ী হ'লেও ঢাকার সঙ্গে আমার পরিচয় খুব কম। ছোটবেলার রাজনীতিক শিক্ষা ও কর্ম্ম-সাধনা মহেশ্বরদী পরগনায় মাধবদী, সাটিরপাড়া, নরসিংদী প্রভৃতি গ্রামেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে এ সকল স্থানের মধ্যবিত্তদের ভিতরে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। তারই মাঝে আমার রাজনীতিক চেতনার উন্মেষ। এর পর স্বদেশী দলের ডাকে ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসা অবধি বাইরে বাইরেই কাটিয়েছি। উত্তর বঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, মালদহ, পরে পূর্ব্ব বঙ্গের বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনায় গুপ্ত বিপ্লবী-সমিতির কার্য্যভার নিয়ে গোপনে ঘুরেছি। প্রায় ষোল বৎসর জেলে ও বাইরে বাস করার পর ১৯২৯ সালে পার্টির নির্দ্দেশে আমাকে ঢাকায় আসতে হ'ল। মনে মনে গর্ব্ব অনুভব ক'রলাম। বিপ্লবী-আন্দোলনের পীঠস্থান এই ঢাকা, বিখ্যাত পুলিন দাসের পরিচালিত অনুশীলন সমিতির কেন্দ্র এই ঢাকা, বিপ্লবী বীর নলিনী ও তারিনীর রক্ত রঞ্জিত এই ঢাকা আমার কর্ম্মস্থল হ'ল।

বাঙলার অনুশীলন সমিতি কলকাতায় শিকড় গাড়তে পারেনি কিন্তু ঢাকায় বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পুলিন দাসের পরিচালনায়

অনুশীলন সমিতিতে পনেরো হাজার যুবকের মিলিটারী ভলান্টিয়ার সংগঠন গড়ে উঠে ১৯০৭ সালে, ঢাকা তখন পূর্ব্ব বঙ্গের রাজনীতিক আন্দোলন ও যুবক সংগঠনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ১৯০৮ সালে অনুশীলন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হ'লে তা গুপ্ত সমিতিতে পরিণত হয় এবং সংগঠন পরিচালনার জন্য সন্ত্রাসবাদী পন্থা গ্রহণ করে। তখন থেকে বৃটিশের দাসত্বের বিরুদ্ধে ঢাকায় বিপ্লবী দল কাজ চলিয়ে এসেছে। সরকারী নিষ্পেষণে যখন বাঙলাদেশের অন্যান্য জেলায় গুপ্ত সমিতির কাজ মন্দীভূত হয়ে পড়ে তখন ঢাকাই অবিরাম গতিতে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগঠন ও আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে গেছে; বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের ধারাকে বজায় রেখে দেশবাসীর কাছে বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জ্জনের আশা ও বিশ্বাস জীইয়ে রেখেছে।

ঢাকায় প্রায় দশ হাজার ছাত্র পড়াশুনা করতো। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের পারিবারিক জীবনের অসাচ্ছন্দ্য, বৈচিত্র্যহীন সামাজিক জীবন ও দাসত্বপীড়িত রাজনীতিক জীবন সহজেই তাদের বৃটিশ-বিরোধী গোপন-সংগ্রামের পথে আকৃষ্ট করতো। স্বাধীনতা সংগ্রামে মৃত্যুর সম্মুখীন হ'তে তারা এতটুকু পিছ-পা নয়। বার বার খানাতল্লাশ, গ্রেপ্তার, জুলুম-অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ড পেয়ে পেয়ে যুবকদের দৃঢ়তা আরো বেড়ে গিয়েছিল।

স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেসে, হোস্টেলে, শহরের অলি-গলিতে বিপ্লবী যুবকদের প্রতিষ্ঠিত বহু ক্লাব, আখড়া, সঙ্ঘ, পাঠাগার এবং গ্রুপ গড়ে উঠে। সরকারী রিপোর্টে ঢাকা-জেলাকে বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদীদের আড্ডা (hot bed of dangerous terrorists) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু ঢাকার লোক বলেই অনেককে সরকারী চাকুরী দেওয়া হ'ত না। অনুশীলন সমিতির ঢাকার কর্ম্মীরাই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে

গিয়ে দলের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ঢাকা থেকে সংগঠক ও পরিচালক প্রেরিত হয়েছে। শহরের উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরানী প্রভৃতি শিক্ষিত শ্রেণীর লোক বিপ্লবী যুবকদের ত্যাগী, স্বদেশ হিতৈষী কর্ম্মবীর ব'লে মনে ক'রতেন ; এরাই যে দাসত্ব পীড়নের বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে রেখেছে তা তখনকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অস্বীকার ক'রতে পারেননি।

আমরা জেল থেকে নূতন ভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার প্রেরণা নিয়ে এসেছি। বাইরে এসে দেখি, আবহাওয়া সংগ্রামাত্মক কাজের বেশ অনুকূলে। যুবকরা উন্মুখ হয়ে আছে শত্রুর বুকে ছুরী বসাবার জন্য। 'দাদা'রা কেবল বলছেন, ধৈর্য্য ধর—ব্যাপক বিপ্লবের অপেক্ষায় ধৈর্য্য ধর। কিন্তু যুবক মনে ধৈর্য্য আর ধরে না। নেতৃবর্গের কথায় তারা আশ্বস্ত হতে পারছে না।

নেতারা এমন কিছু সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থাও দেখাতে পারছে না, যার ভিতর দিয়ে যুবকদের কর্ম্ম-স্পৃহা মূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারে।

ঢাকার অগ্রণী যুবকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আমি আমাদের জেলের পরিকল্পিত আইরীশ ইস্টার বিদ্রোহের মত ছোট একটি বিদ্রোহ প্রচেষ্টার কথাই বলি। যুবকগণ তাদের মনোমত কথা পেয়ে আমার কাছে বেশী ক'রে আনা গোনা ক'রতে লাগল—আমাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে একদল যুবক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা উদ্যোগী হয়ে অনেক যুবককে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়—আমার নির্দ্দেশ মত তারা কাজও করে। এত ছেলে আমার কাছে আসে, আমার নির্দ্দেশ মত চলে এটা ঢাকার নেতারা পছন্দ করেননি। ফলে আমার উপর শুধু জেলা কংগ্রেস অফিসের কাজ করার ভার অর্পিত হ'ল ; ছাত্র-সংগঠনের কাজে আমার যাওয়ার প্রয়োজন হবে না একথাও স্পষ্ট

জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যুবকগণ এতে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। "যখন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে সংগ্রাম করা আবশ্যক, তখন দলের 'দাদা'রা এ কি সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় দিচ্ছেন?"—তখন বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবকদের মুখে মুখে এই প্রশ্ন। বাধা নিষেধ সত্ত্বেও দলের ছাত্র ও যুবক কর্ম্মীরা আমার সংস্পর্শে আসা ত্যাগ করেনি। ওদেরই চেষ্টায় ঢাকা শান্তি-সমিতি, সিলেট জেলায় ঢাকা দক্ষিণ যুবক সমিতি ও আরো দু'তিনটি সমিতির ও পাঠাগারের বাৎসরিক অধিবেশনে আমাকে সভাপতি মনোনীত করা হয়। আমার এই ধরনের প্রভাব বিস্তার হওয়াটা নেতারা আপত্তিজনক মনে করলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে তখন সভাপতি বা বক্তা স্থির করায় নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হ'ল।

ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির অফিস থেকে অসুস্থ অবস্থায় মেডিকেল মেসে ছাত্র-নেতা কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তীর আতিথ্য গ্রহণ ক'রলাম। অসুখ সেরে যাওয়ার পরও সেখানে রয়ে গেলাম এবং কতকটা স্বাধীন ভাবে কাজকর্ম্ম করতে শুরু করি। এ-সময় ঢাকায় বিভিন্ন দলের কর্ম্মীদের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হয়। বরিশাল, ময়মনসিংহ ও অন্যান্য স্থানের অনুশীলন দলের কর্ম্মীরা ঢাকায় এসে আমার সঙ্গে এবং আমার সমভাবের ভাবুক কর্ম্মীদের সঙ্গে কর্ম্মপন্থা নিয়ে আলাপ আলোচনা করে। সকলেরই এক কথা—'একটা কিছু করা চাই, আর বসে থাকা চলে না।' চলতি অবস্থার প্রতি সর্ব্বত্র একটা অসন্তুষ্টির মনোভাব। লক্ষ্যটা ব্যাপক সন্ত্রাসবাদের দিকে।

সন্ত্রাসবাদই তখন বাঙলার যুবজনের চিত্ত আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। রুশিয়ার বিপ্লব-তরঙ্গে তারা আন্দোলিত হয়েছে, উদ্বুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু ঐ মহান বিপ্লবের আদর্শ ও বাস্তব কর্ম্মপন্থা তা'দের মনে কোনো

রেখাপাত করেনি। আয়র্ল্যাণ্ডের ইস্টার বিদ্রোহ ও পরবর্ত্তী স্বাধীনতা সংগ্রাম তারা অনুকরণীয় বলে মনে করতো; প্রতি লাইব্রেরীতে 'সীনফেন ও ইস্টার বিদ্রোহের ইতিহাস' 'ডি ভ্যালেরার জীবনী', ডান ব্রীন লিখিত 'আমার স্বাধীনতা সংগ্রাম' প্রভৃতি বইগুলির চাহিদা বেশী ছিল। সীনফেনদের অনুকরণে ভলাণ্টিয়ার দল গঠনের আওয়াজ ওঠে কলকাতা কংগ্রেসের সময় থেকে। ঢাকায় 'বি. ভি.' (বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার) দল ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গঠনে মনোযোগী হয়। এ-সকল সত্ত্বেও সে-সময়ের বিপ্লবীরা বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন ছিল না। বুর্জোয়া স্বার্থবুদ্ধি তখনো জাগেনি। মানবতার উদার আদর্শে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সাধনায় তারা মগ্ন ছিল, স্বাধীন অবস্থার স্বরূপ কি তা তারা বিশ্লেষণ করেনি; কা'দের স্বাধীনতা, কেই বা লড়াই ক'রে অর্জ্জন ক'রবে তার ধারণা ছিল নিতান্তই অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের শক্ত-শৃঙ্খল ভাঙ্গতে হবে মনের উৎসাহে, হৃদয়ের দুর্জ্জয় আবেগে—এই সহজ সত্যটাই শুধু তারা আঁকড়ে ধরেছিল। এ-সময়ের মধ্যে আরো অগ্রণী এক কর্ম্মীদল স্পষ্টতর লক্ষ্য ও কর্ম্মপন্থা বিশ্লেষণ ক'রে গণ-বিপ্লবের যুক্তিযুক্ত পথে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অগ্রসর হতে আরম্ভ করে। বাঙলার "শ্রমিক-কৃষক পার্টি" এই অগ্রণী কর্ম্মীদের নিয়ে গঠিত। ১৯২৮-২৯ সালে ঢাকার মুষ্টিমেয় কয়েকটি যুবক গোপাল বসাকের সঙ্গে মিলে ঐ পার্টির শাখা গঠনের প্রয়াস পায়। ঢাকেশ্বরী মিলের শ্রমিকদের মধ্যেও তারা প্রচারকার্য্য চালায়, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরা তখনো গণ-সংগ্রামের তাৎপর্য্য বুঝতে পারেনি এবং মজুর কৃষকের দলকে কোনো আমল দেয়নি।

অনুশীলন পার্টির হাতে বোমার খোল (Shell), বোমা তৈরীর ফরমূলা, পিস্তল-রিভলভার যা কিছু ছিল, যুবকগণ তা গোপনে সরাবার

চেষ্টা করে। সন্দেহ হওয়া মাত্র নেতারা ঐ সব জিনিস অন্য জেলায় পাঠিয়ে দেয়—যেখানে মেরুদণ্ডহীন 'দাদা'-ভক্ত ছেলেদের প্রভাব বেশী। বিদ্রোহী যুবকগণ এরই মধ্যে কিছু কিছু জিনিস সরিয়ে ফেলেছিল। নেতাদের প্রতিক্রিয়াশীল মনের পরিচয় পেয়ে নূতন কর্ম্মীরা নিজেরাই উদ্‌যোগী হয়ে কাজ করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হল। সংগৃহীত "ফরমুলার" সাহায্যে যথাযোগ্য লোক দিয়ে বোমা তৈরীর ব্যবস্থা হয়, ঢালাই কারখানার এক যুবক মালিকের সাহায্যে বোমার 'খোল' (সেল) প্রস্তুতেরও আয়োজন হয়। টাকা সংগ্রহের চেষ্টা চলতে থাকে। বরিশাল, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ জেলার কর্ম্মীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য কয়েকজন বেরিয়ে গেল। ঢাকার বি. ভি. দলের সঙ্গেও সংযোগ হয়। কলকাতা থেকে নিরঞ্জন সেন ঢাকায় আসার পর আমরা তা'দের সঙ্গে একযোগে কাজ করার কথাবার্ত্তা চালাই। শ্রীসঙ্ঘের একটি অগ্রণী-অংশ আমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা আলোচনা করে। সমস্ত আলাপ-আলোচনাই গোপনে করা হ'ত। সকল দলের ভিতরই উৎসাহী কর্ম্মীরা পুরানো নেতাদের না-জানিয়ে কাজ করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠে। দলের নেতাদের সঙ্গে কর্ম্মপন্থা নিয়ে সকল রকম তর্ক-আলোচনার পর যখন বোঝা গেল যে, অনতিবিলম্বে ছোট গেরিলা দল তৈরী ক'রে কাজ করার ইচ্ছা তা'দের নাই, তখনই—একমাত্র তখনই আমরা পৃথকভাবে কাজের জন্য মন স্থির করি। অনুশীলন ও যুগান্তর এই উভয় দলের মধ্যেই অন্তর্বিদ্রোহ দেখা দেয়; অন্যান্য গ্রুপের মধ্যেও ঐ একই বিরোধ। বিভিন্ন দলের সংগ্রামোৎসাহী কর্ম্মীরা দলাদলি ভুলে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার আগ্রহে এক হয়ে গেল। একদিকে নেতারা বিপ্লবের নামে নিষ্ক্রিয়তায় নিমগ্ন হল, অপর দিকে কর্ম্মীরা আশু বিদ্রোহের নামে সক্রিয় হয়ে উঠল। উৎসাহী ও মেধাবী কর্ম্মীরা

আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। নেতাদের বিধি-নিষেধ, শাসন ও কড়া নজর কিছুই নূতন উদ্দীপনার গতিরোধ করতে পারেনি।

ঢাকা থেকে মাঝে মাঝে ময়মনসিংহ, বরিশাল, কলকাতা ও অন্যত্র যেতাম। বীর শহীদ যতীন মুখার্জ্জীর স্মৃতি উৎসবের দিনে গেণ্ডারিয়ার এক বাগানবাড়ীতে আমরা বিভিন্ন দলের কর্ম্মীরা গোপনে সম্মিলিত হই।

নরেন সেনের উপদেশ

ঢাকার নরেন সেন অনুশীলন সমিতির পুরানো নেতা—কিন্তু পরে তিনি আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু পার্টির সঙ্গে সংস্রব একেবারে ত্যাগ করেননি; সরকারী নিষ্পেষণ-যন্ত্রের পেষণে তাঁকে কিছুদিন পর পরই পিষ্ট হতে হয়। যখন দলের ভিতর নেতাদের সঙ্গে আমাদের কাজ নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল তখন তাঁর সঙ্গে একদিন আমার কথাবার্ত্তা হয়।

তিনি বলতে লাগলেন, "কি হে সতীশ, তোমরা নাকি দলের ভিতর একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছ? এতে কোনো কাজ হবে না; যদি কিছু করতে চাও সকলে মিলে একসঙ্গে করলেই তা কার্য্যকরী হবে।"

ব'ললাম, "আমরা তো তাই চাই, কিন্তু তা হয় কৈ? নেতারা তো কোনো কাজে এগুতে চান না আর আমরা চাই বলে আমাদের প্রতি তাঁদের ক্রোধ।"

তিনি ব'ললেন, "তোমরাই বা পৃথক হয়ে কতটুকু কি করতে পারবে? দ্বন্দ্ব-বিরোধে তোমাদেরই শক্তি ক্ষয় এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসে দলাদলি, ছাত্র-আন্দোলনে ও শ্রমিক-আন্দোলনে দলাদলি। সন্ত্রাসবাদী দলগুলির বিরোধ তো আছেই। পাশ্চাত্য

দানবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সাধনায় ভেদ-বিভেদ এসে তোমাদের চেষ্টাকে ব্যর্থ ও পর্য্যুদস্ত ক'রে দেয়। যে-শক্রর দেহে আঘাত দিতে চাও সে-শক্রই তোমাকে আঘাত করে। তোমাদের ঐক্য ভেঙে ভেঙে পড়ে।"

ব'ললাম, "হ্যাঁ, আপনার কথা একান্ত সত্য। কিন্তু আমরা তো নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে সুমুখপানে এগিয়ে চলতে চাই। যারা পিছনে পড়ে থাকে, আগে চলতে চায় না, ঐক্য রক্ষার জন্য আমরা কি পিছনে হটে গিয়ে তাদের সঙ্গে দাঁড়াব? প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য হবে কোথায়? কোন্ সূত্রে? বলে দিন। অনুশীলন পার্টির অতীত ইতিহাসেও তো এমন অবস্থা এসেছিল। সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামের ভয়ে ভীত হয়ে তদানীন্তন দলের নেতা মাখন সেন সেবা-ধর্ম্মের ভাঁওতা দিয়ে সন্ত্রাসবাদী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ক্রমে বিপ্লবী-আন্দোলন থেকে সরে পড়েছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে নেতা পুলিন দাস বিপ্লবী-আন্দোলনের অগ্রগতির পথে আপনাদের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারেননি বলে আপনারা পুলিন বাবুকে পিছনে ফেলে রেখেই এগিয়ে এসেছিলেন। আমার মনে হয়, অগ্রগামী দলই প্রকৃত সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী, স্বাধীনতা-সংগ্রামকে তারাই সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারবে। অগ্রবর্ত্তীদের গতির প্রসারতায়, সংগ্রামের তীব্রতায় পশ্চাদ্বর্ত্তী ও নিষ্ক্রিয়ের দল সক্রিয় হয়ে ছুটে আসবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ময়দানে।"

নরেন দা' ব'লেছিলেন, "যা ভাল বোঝ কর; চঞ্চল ও অধৈর্য্য হয়ে কিছু ক'রো না। একতাবদ্ধ হয়ে চলার যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত। দেখো যেন পাশ্চাত্য-দানবের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ভেদ-বৈষম্যে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত না হও। পাশ্চাত্য-দানব-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাচ্যের দেব-শক্তির জয়ের দিন সমাগত। যেমন ক'রে হোক ঐক্য রক্ষা ক'রে চলাই আজকের দিনের কর্ত্তব্য।

নূতন উদ্দীপনা

১৯২১-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পর দেশে ক্রমশ অবসাদ ঘনিয়ে আসছিল। ব্যর্থতা, নিষ্ক্রিয়তা ও সরকারী নিষ্পেষণে সামনে চলার পথ রুদ্ধ ক'রে দেয়। অন্তরের বেদনা পথ খুঁজে পায় না। দেশের কর্ম্মীরা ফাঁসীতে, পুলিসের গুলিতে মরেছে, শত শত বন্দী জেলে পচে মরচে। দেশের জনগণের লাঞ্ছনা, দুর্গতি, অসাফল্য ও জীবনের মর্ম্মবেদনা যেমন ছিল তেমনই আছে। বিদেশের জাতীয় জীবনের অগ্রগতির খবর বাঙলার যুবক চিত্তে দোল দিয়ে যায় : রুশরা গণ-বিপ্লবে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হয়ে আজ পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান নিয়ে জাতি গড়ায় মন দিয়েছে ; চীনের জাতীয় বিপ্লব বিজয়-গৌরবে উদ্ভাসিত ; তুরস্ক অতীতের মলিনতা ও কুসংস্কার ভেঙে আধুনিক মানুষের মতো উঠে দাঁড়িয়েছে ; ক্ষুদ্র আয়র্ল্যাণ্ড অসীম বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। শুধু আমরা ভারতবাসীরাই কি পিছিয়ে পড়ে থাকবো ? কেন আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় ভেঙে ভেঙে যায় ? স্বদেশী আন্দোলন গেল (১৯০৫-৭), যুদ্ধের দুর্দ্দিনে বিপ্লবের সুযোগ হারিয়ে গেল (১৯১৫), অসহযোগ আন্দোলন গেল (১৯২১-২২) ; এতদিনের আঘাতে আঘাতে আত্মবিস্মৃত জাতি আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়েছে—পাঁচ বৎসর অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়তার পর বাঙলার যুবক ধৈর্য্যের চরমে এসে পৌঁচেছে।

১৯২৯ সাল: নূতন কিছু করার উদ্দীপনা তা'দের মনে। পুরানো বিপ্লবী কর্ম্মীরা সব ফিরে এসেছে জেল থেকে। এখন আর ভাবনা কি? এরাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। মরণের ভয় আর নেই। বিপ্লবের অগ্নিশিখা স্বাদেশীকতায় উদ্বুদ্ধ যুবককে আজ হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ভাবপ্রবণ বাঙলার তরুণরা আজ ভেসে যেতে চায়, ফেলে যেতে চায় কিনারায় সব বন্ধন। সত্যই এ-নব অভ্যুত্থিত 'যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবে' কে?

এ-শুধু সাহিত্যের ভাষা নয়, কবিত্বের আবেগ নয়, বাঙলার অগ্রণী যুবকদলের অন্তরের এইটেই তখন আসল রূপ। সে-সময়ের বিভিন্ন যুবক সম্মেলনের বক্তাদের ও সভাপতির বক্তৃতাগুলি পড়লে এ-মনোভাবের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। আয়র্ল্যাণ্ডের ইস্টার বিদ্রোহের কাহিনী ও পরবর্ত্তী বিদ্রোহ-আন্দোলনের সাহিত্য তখন বাঙলায় ছড়িয়ে পড়েছে। ডান ব্রীন-এর "মাই ফাইট ফর আইরীশ ফ্রিডম" বই পড়েনি বা পড়ে উদ্দীপনা পায়নি এমন যুবক কোনো যুব-সঙ্ঘের মধ্যে ছিল না। 'যে-জাতি স্বাধীনতার জন্য রক্ত দান না ক'রে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করে সে-জাতি স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।'—বুকের রক্তে যারা দেশ স্বাধীন করার জন্য ব্যগ্র সেই ভাবুক বাঙালীর ছেলের কাছে আইরীশ বিপ্লবী Lallor-এর ঐ বাণী তা'দের হৃদয়েরই কথা।

ক্ষুদিরাম, কানাইয়ের আত্মদানের সময় থেকে যত শহীদ ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয় গান গেয়ে গেল তা'র সেই বিশ বছরের রক্তমাখা ঐতিহ্য পেয়ে বাঙলার যুবক আর শুধু কথার মাঝে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায় না; রাখতে পারে না। তারা চায় কাজ—প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষমূলক কাজ। শক্তিমান শত্রুর বুকে আঘাত দিয়ে মরবে তাও স্বীকার; তবু নিষ্ক্রিয়তার জড়তা ঘোচাতে হবে। বুকের রক্তে অবসন্ন জাতীয়

জীবনকে প্রাণেস্পন্দনে সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে হবে। এমনই জেদ—এমনই সঙ্কল্প ক'রে বসে আছে বিপ্লবীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি গ্রুপ। কারামুক্ত নেতারা বিপ্লবী যুবকদের, এ-বিপুল আকাঙ্ক্ষার—এ-আকুল আগ্রহের কোনো প্রতিবিধান না ক'রে ধৈর্য্য ধারণ করার উপদেশ দিলেন। তা'দের উত্তরের মর্ম্মটা এই রকম 'ধৈর্য্য ধরে আমাদের উপর নির্ভর ক'রে বসে থাক, সময় এলে আমরা বলবো। আপাতত কংগ্রেস ইলেক্‌শনে, কাউন্সিল ইলেক্‌শনে আমাদের জন্য এবং পার্টির জন্য ভোট সংগ্রহের কাজ কর।' যুবকের চিত্ত এতে সায় দিল না, ভারত-বিপ্লবের গালভরা কথায় তারা আর ভুলতে রাজি নয়। ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাই তাদের এখন কাম্য, ক্ষুদ্র হলেও সে-চেষ্টা হবে তেজোদীপ্ত শক্তিতে উজ্জ্বল, আগুনে উদ্দীপ্ত—আত্মদানের সবল আদর্শ দিয়ে জাগিয়ে তুলবে জনমনে একটা নব চেতনা। যতীন দাস, সূর্য্য সেন, নিরঞ্জন সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং প্রমুখ যুবক নেতারা—যুবকদের কাছে নূতন পথের সন্ধান নিয়ে আসে। স্বাভাবিক প্রগতির পথ যেই রূপ নিল নব-নেতৃত্বের নূতন কার্য্যধারার মধ্যে, অমনি নেতা ও উপনেতাদের এতদিনকার প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়াশীল মন রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ ক'রল।

ভয় দেখান, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া, দল থেকে বিতাড়ন, ছেলেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং পরে প্রকাশ্যভাবে হাসি টিট্‌কারী শুরু হ'ল নূতন সংগ্রাম-প্রয়াসীদের বিরুদ্ধে।

প্রথমে দলের ভিতরে প্রবীণে আর নবীনে বিরোধ-বিতর্ক মন-কষাকষি চলে। পরে ক্রমশ বিভিন্ন দলের নবীন কর্ম্মীরা পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে পড়ে। কিছু করার জন্য নিজ নিজ দলের বা দল-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে প্রস্তুত হয়। যুগান্তর দলের বরিশাল শাখা, চট্টগ্রাম দল, অনুশীলন দলের ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, দক্ষিণ কলিকাতা ও

বহরমপুরের প্রধান অংশ অনতিবিলম্বে সংগ্রাম আরম্ভ করার জন্য আগুয়ান হয়। ঢাকার বি. ভি. দলও সম্মিলিত এই সংগ্রামোন্মুখ দলে যোগ দেয়। সকল দলের যুবকদের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দিল।

রংপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন। পূর্ব্বেই কথা হয়েছিল, সেখানে আমরা মিলিত হয়ে সব পাকাপাকি স্থির ক'রব। নিরঞ্জন সেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী (চট্টগ্রাম), যতীন দাস, বিনয় রায় (দক্ষিণ কলকাতা) এবং আমি—আমরা এই পাঁচ জন রংপুরে বসে কর্ম্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করি। বাঙলা দেশে একটা বিদ্রোহ করা একান্ত আবশ্যক। দলাদলিতে দেশ ডুবে গেছে। বিপ্লবী দলগুলি (ছোট বড় মিলে প্রায় ১০টি) পরস্পর বিরোধ করে। বাঙলার কংগ্রেস সুভাষ বসু ও জে. এম. সেনগুপ্ত এই দুই দলে বিভক্ত—ছাত্র-আন্দোলনও দ্বিধাবিভক্ত (A. B. S. A. ও B. P. S. A.)। শ্রমিক-আন্দোলনে দলাদলি আছে। এই ভেদ-বিভেদ জনগণের প্রাণে নৈরাশ্যের অবসাদ এনে দিয়েছে। তাই তখন দুর্গত বাঙলার রাজনীতিক জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন। একটা বিরাট ধাক্কা না পেলে মোহমগ্ন সুপ্ত বাঙালী জীবন ঐক্যের পথে, স্বাধীনতার পথে সচেতন হয়ে উঠবে না। আমাদের রক্তদানে—২।৩শ' যুবকের জীবন আহুতিতে বাঙলার রাজনীতিক জীবন সজীব হয়ে উঠবে। সন্ত্রাসবাদের পথ (ব্যক্তিগত সংগ্রামের পথ) আমরাই লোকের সামনে খুলে ধরেছি, অন্যান্য প্রদেশে এখনো আমাদেরই প্রবর্ত্তিত সেই পুরানো অকেজো পন্থা আদর্শ হয়ে আছে। আমরা এবার ছোট ছোট বিদ্রোহাত্মক সংগ্রাম ক'রে বিপ্লবী কর্ম্মধারার উচ্চতর পন্থা প্রতিষ্ঠা ক'রব। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে শত্রুর ঘাঁটি আক্রমণ ক'রে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো। হয়তো পরিণামে আমাদেরই বুকের রক্তে বাঙলার রাজনীতিক মরুপ্রান্তর রঞ্জিত হয়ে উঠবে। তার ফলে নিষ্ক্রিয়তার স্থানে শুদ্ধ সক্রিয় এক জাতীয়

আন্দোলন দাঁড়িয়ে যাবে। পরে যারা কাজ ক'রবে তা'দের সামনে আমাদের মরণের একটা সঙ্গতি রেখে যেতে পারবো।

এমনি ছিল তখন সংগ্রামশীল বিপ্লবী যুবকের চিন্তাধারা :

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।'

রবীন্দ্রনাথের ঐ কটি লাইন তখন আমাদের উৎসাহ জুগিয়েছিল।

সম্মিলিত দলের নূতন নেতারা কোনো একটা কিছু করার প্রেরণাকে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারায় নিয়ে যাওয়ার জন্য গোপনে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে সিদ্ধান্তে পৌছেন। রংপুর সম্মেলনের সময় আমাদের মোটামুটি একটা কার্য্যপদ্ধতি স্থির হয়ে যায়। কথা হ'ল, পরিকল্পনা অনুযায়ী সত্বর প্রস্তুতির কাজে লেগে যেতে হবে। অম্বিকা চক্রবর্ত্তী চিঠিপত্র নিয়ে চাটগাঁ চলে গেলেন। বিনয় রায় কলকাতায় এবং ব্রজেন দাস প্রভৃতি ঢাকায় ফিরে গিয়ে গোপনে কাজ আরম্ভ করেন।

তিনটি জেলায় অস্ত্রাগার আক্রমণ করা, ঢাকা ও কলকাতায় ছোট ছোট ঘাঁটি আক্রমণ একই দিনে একই সময়ে অভ্যুত্থান—শুধু এই পরিকল্পনা নিয়ে আরম্ভ, তারপর অবস্থানুযায়ী কতগুলি ব্যবস্থা করার কথা হয়। পরবর্ত্তী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ঐ প্ল্যানেরই একটা অংশ যা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে চরম পরিণতি লাভ ক'রেছে।

দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে এসে একত্রে সম্মিলিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ব'লে এই নূতন কর্ম্মীদের 'রিভোল্ট গ্রুপ' বা বিদ্রোহী দল নামে অভিহিত করা হ'ত, পরে 'এড্ভান্স' অগ্রগামী দল ব'লত।

১৯২৯ সালের মাঝামাঝি আমি ও নিরঞ্জন ময়মনসিংহ ভ্রমণের সময়, একদিন কাগজে পড়ি, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যতীন দাসকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গিয়েছে। এ-সংবাদে আমরা খুবই আঘাত পাই; যতীন দাস মশার পিস্তল ও রিভলভার ইত্যাদি অস্ত্র সংগ্রহের ভার নিয়েছিল। উত্তর ভারতের বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগ রক্ষা করার ভারও পড়ে যতীন দাসের উপরে। যাই হোক, আরব্ধ কার্য্য আমাদের ক'রে যেতেই হবে।

রাজবন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহারের দাবী নিয়ে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা অনশন করে। যতীন ৬৩ দিন অনশনের পর লাহোর জেলে মারা যায়। তার হাত পা সর্ব্বাঙ্গ ক্রমশ অবসন্ন হয়ে পড়ে, তারপর শ্রবণশক্তি লোপ পেয়ে যায়, তারপর দৃষ্টিশক্তি, তারপর বাকশক্তিও যায়। সর্ব্বশেষে জীবনের শেষ নিশ্বাস ফেলে যতীন তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। গভর্নমেণ্ট কিছুতেই রাজবন্দীদের ন্যায্য অধিকার মেনে নিতে রাজী হ'ল না। সেপ্টেম্বর মাসে যতীনের মৃতদেহ কলকাতায় আনা হয়। লক্ষ লক্ষ লোক মৃত শহীদের শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। সেদিন কলকাতার শোভাযাত্রায় বিদ্রোহাত্মক এক ইশ্‌তেহার বিলি করা হয়।

১৯২৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় চটকলের লক্ষ লক্ষ মজুরদের বিরাট ধর্ম্মঘট হয়। এত বড় ধর্ম্মঘট পূর্ব্বে আর হয়নি। বাঙলার মজুর শ্রেণীও তখন নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ, সংগ্রাম ও সংগঠনের পথে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। গভর্নমেণ্ট বাঙলা দেশ থেকে দশজন শ্রমিক নেতাকে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে তখনকার মত শ্রমিক-আন্দোলনকে দমিয়ে দেয়। আমরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মেম্বার রূপে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভায় শ্রমিক নেতা বঙ্কিম মুখার্জি ও রাধারমণ মিত্রকে দিনের পর দিন বক্তৃতার সময় হাসি, বিদ্রূপ ও টিটকারি সহ্য ক'রে নিজেদের বক্তব্য ব'লে যেতে

দেখেছি। কংগ্রেসী যুবক সভ্যগণ বারবার চেঁচিয়ে বলতেন: 'শ্রমিক দাদা, যথেষ্ট বলেছেন, আর কেন, বসুন বসুন।' প্রেসিডেন্ট সুভাষ বসু শ্রমিক নেতাদের বলবার অধিকার দিতেন, কিন্তু তাঁ'দের কথা অপরকে শুনবার সুযোগ দিতেন না। মধ্যবিত্তের জাতীয় দলের গণ্ডগোলে শ্রমিকদের কণ্ঠধ্বনি চাপা পড়ে যেত।

কিছুদিন পর কয়েকজন কংগ্রেসী নাগপুর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে বলে যে, শ্রমিক-আন্দোলনে যে-বিপুল জাগরণ দেখা দিয়েছে তাতে জাতীয় কংগ্রেসের চেয়েও শ্রমিক কংগ্রেস শ্রেষ্ঠতর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। এ-সংবাদে আমরা পুলকিত হয়েছিলাম। বৎসরের প্রথম ভাগে আমি মজুর কৃষক পার্টির আপিসে স্প্রাট সাহেবকে দেখতে যাই—চটকল মজুর ইউনিয়ন আফিসেও গিয়েছিলাম। শ্রমিক কর্ম্মীদের কর্ম্মতৎপরতা ও শ্রমিক কৃষক সম্পর্কিত বইয়ের লাইব্রেরি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু কংগ্রেস কর্ম্মীদের দলাদলি সঙ্কীর্ণতার মতো এ আন্দোলনেও দলাদলি ছিল ব'লে আমরা শুনি। আমরা মনে ক'রতাম, এক দল যুবকের আত্মদানে এ-অবস্থার পরিবর্ত্তন হতে পারে। আমাদের প্রাথমিক কার্য্যসূচী শেষ হয়ে গেলে একটি সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থায় জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। কংগ্রেস ও শ্রমিক আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামে হাতে হাত মিলিয়ে চলবে। এই নিশ্চিত ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই তখন আমরা কমিউনিস্ট পরিচালিত 'ইয়ং কমরেড লীগ'-এর সঙ্গে একত্র হয়ে কাজ করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারিনি।

একটা সশস্ত্র অভিযান করার জন্য—একটা আলোড়ন সৃষ্টির জন্য তখন আমাদের নেশা পেয়ে বসেছিল। আয়র্ল্যাণ্ডের ইস্টার বিদ্রোহ আমাদের আদর্শ—বাঙলা দেশেও অনুরূপ কিছু একটা চাই যুবকগণ

সেই নেশায় মশ্‌গুল, মধ্যশ্রেণীসুলভ রোমাণ্টিক সংগ্রামের মনোবৃত্তি তখন তাদের আচ্ছন্ন করেছিল। দেশের পরাধীনতা ও রাজনীতিক অবস্থা এ-মনোবৃত্তিকে জাগ্রত, সম্প্রসারিত ও পুষ্ট ক'রে তুলেছিল।

নভেম্বর মাসে সূর্য্য সেন, গণেশ ঘোষ কলকাতায় আসেন। মেছুয়া বাজারে নিরঞ্জন সেনের বাসায় আমাদের গোপন পরামর্শ হয়। একবার কাজ আরম্ভ করলে এবং সাহসোচিত সাফল্য দেখাতে পারলে সকল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী দলের কর্ম্মীরাই আমাদের পথে আসবে, এ-বিশ্বাস নিয়েই আমরা আলোচনা করি। বিদেশী শাসন-বিরোধী মনোভাব এত প্রবল যে, দু'চার জন নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী ছাড়া দেশের জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি আমরা পাবই—এ-কথাও জানা ছিল। কিন্তু অস্ত্রের অভাবটা আমরা খুবই অনুভব ক'রতাম। প্রচুর অস্ত্রের সংস্থান হলে কী না করা যায়। তবে অভাব-বোধ আমাদের হতাশ করতে পারেনি; যতটুকু শক্তি তা নিয়েই কাজে নামতে হবে এই সঙ্কল্প করেই চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশাল অস্ত্রাগার আক্রমণের কথা হয়েছিল।

নভেম্বর মাসে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক "লাল ইশ্‌তেহার" বিতরণ ক'রে যুবকদের আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান করা হয়েছিল।

১৮ই ডিসেম্বর শেষ রাত্রিতে মেছুয়াবাজারের বাড়ীতে অকস্মাৎ ঘুম থেকে চোখ মেলে চেয়ে দেখি, সার্জেণ্টদের হাতের টর্চ আমাদের চোখে মুখে জ্বলজ্বল করছে। তা'দের খোলা রিভলভার আমাদের বুকের উপর। 'হাত তোল—হাত তোল' ব'লে চেঁচাচ্ছে। হাত আর তুলবো কি? হাত-পা তো পুলিসের বুটের তলায় চাপা পড়ে আছে। কাগজপত্র, ঠিকানা, লাল ইশ্‌তেহার, বোমা তৈরির ফরমূলা সহ আমি, নিরঞ্জন সেন, রমেন বিশ্বাস ধরা পড়লাম। ভোর হতে না হতেই পূর্ব্ব কথানুযায়ী

সুধাংশু দাশগুপ্ত বোমা ও রিভলভার নিয়ে সেই বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হয়। সুধাংশুকে পুলিস বহু অত্যাচার ক'রে ও ভয় দেখিয়ে তার মুখ থেকে কোনো কথাই বের করতে পারেনি। পর পর খানাতল্লাশীতে আরো কয়েকটি বাড়ী থেকে বোমা তৈরীর সরঞ্জাম সহ যুবকগণ ধৃত হয়। বরিশালের যুবক কর্ম্মী মুকুল সেন, শচীন কর, জগদীশ চ্যাটার্জী, খুলনার নির্ম্মল দাস প্রভৃতি অনেক যুবক ধরা পড়ে। বিভিন্ন জেলার ৩২ জন যুবককে গ্রেপ্তার ক'রে মেছুয়াবাজার বোমার ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়।

১৯৩০ সালে আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে আমি ও নিরঞ্জন ৭ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হই। সুধাংশু দাশগুপ্ত, রমেন বিশ্বাস ও অন্য কয়েক জনের ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আমাদের ধরা পড়ার পর চট্টগ্রামের দল খুব কর্ম্মতৎপর হয়ে তাড়াতাড়ি কাজের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। তা'দের আশঙ্কা হয়, পাছে পুলিস তা'দেরও ধ'রে ফে'লে সকল চেষ্টা পণ্ড ক'রে দেয়। আমাদের ধরা পড়ার দিন থেকে ঠিক চার মাসের মধ্যে ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে সূর্য্য সেন, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি বিদ্রোহী বীরগণ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ করে এবং বহু পিস্তল, বন্দুক, কামান হস্তগত করে। শহরে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে দেয়। সেইদিনই বাঙলার সমস্ত বিপ্লবী দলের নেতাদের পুলিস ধ'রে ফেলে। কর্ম্মীরা সকলে চাটগাঁর প্রদর্শিত সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর যে সংগ্রামের উদ্দীপনা আসে তাকে বাধা দেওয়ার শক্তি ছিল না নেতাদের।

সেদিন জালালাবাদের পাহাড়ে মেশিনগানের গুলিতে নিহত স্বদেশ-হিতৈষীর বুকের রক্তে স্বাধীনতার পথের রেখা রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। বাঙলা বিপ্লবী দলের প্রতিটি যুবক স্বাধীনতার এই বীর যোদ্ধাদের সেদিন

রক্ত-অভিবাদন জানিয়েছিল। নূতন কর্ম্মপ্রবাহের এই দুর্নিবার গতি কেউ রোধ করতে পারেনি। সংগ্রামোন্মুখ বাঙালী যুবকদের এখন আর থামায় কে! সারা বাঙলায় সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। বাঙলা দেশের 'ইন্সপেক্টার জেনারেল অফ পুলিস' বিপ্লবীর গুলিতে নিহত ও ঢাকার 'পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট' সাহেব আহত হ'লেন। মেদিনীপুর জেলার তিনজন ম্যাজিষ্ট্রেট পর পর নিহত হ'ল। কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এ কারাগারসমূহের ইন্সপেক্টার জেনারেল নিহত হন। বাঙলার দু'জন গভর্নর পর পর বিপ্লবীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ও পরিপোষক "স্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকার সম্পাদক, ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক, ঢাকার পুলিস সাহেব, রাজ-শাহীর জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, আলিপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের জজ সাহেব, ইত্যাদি অনেক রাজকর্ম্মচারী সন্ত্রাসবাদীদের কোপে পড়ে। দু'টি স্কুলের ছাত্রী পিস্তলের গুলিতে কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে হত্যা করে। কলকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেবের গাড়ী লক্ষ্য ক'রে বোমা নিক্ষেপ করা হয়।

বাঙলার বিপ্লবীরা ক্রমাগত পাঁচ বৎসর সন্ত্রাস-উৎপাদক কার্য্যকলাপ দ্বারা বাঙলা গভর্নমেণ্টকে সন্ত্রস্ত ক'রে রাখে—নিজেরাও ফাঁসীতে, গুলিতে মরে, দ্বীপান্তরে যায়। চাটগাঁর দল, ঢাকার শ্রীসঙ্ঘ ও বি. ভি. দল এবারকার সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। অনুশীলন দলের কর্ম্মীরা ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে দল গঠন ক'রতে গিয়ে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হয়।

দু'বৎসর ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন ক'রে কংগ্রেস দুর্ব্বল হয়ে পড়ে; সন্ত্রাসবাদীরা ১৯৩৫ সালের 'গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট' পাস না হওয়া অবধি তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায়।

যে-সকল বড় ও ছোট নেতারা বিগত দু'বছর ধ'রে যুবক আন্দোলনের স্বাভাবিক সংগ্রাম-প্রবণতাকে বাধা দিয়ে এসেছেন—প্রগতির পথ রোধ ক'রে প্রতিক্রিয়ার দুর্গ সুদৃঢ় রাখতে চেষ্টা করেছেন—সরকারী নিষ্পেষণের নির্ম্মম পীড়নে তাঁরাও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। এঁরা নূতন বিপ্লবীদের সমর্থন করেননি, নিজেরাও বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার কোনো প্রকৃষ্ট কর্ম্ম-পদ্ধতি গঠন করে যাননি। বিপ্লবের কোনো নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনাও তাঁদের ছিল না। গান্ধীবাদী অহিংস নীতির প্রতি মোটেই বিশ্বাস রাখতেন না, কিন্তু তবু তাঁরা বিনা প্রতিবাদে অহিংস আন্দোলনের মাঝে নিজেদের সশস্ত্র বিপ্লবী সত্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ধরা পড়ার পূর্ব্বে কংগ্রেসের অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে তাঁ'দের বলার কিছু ছিল না। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ ও দখল ক'রে তরুণ বিপ্লবীরা রক্তের অক্ষরে অহিংস সংগ্রামে স্বাধীনতা অর্জ্জনের ব্যর্থ প্রয়াসের জবাব দেয়। প্রগতিশীল বিপ্লবী আন্দোলনে ত্যাগ ও বীরত্ব দেখিয়ে যারা সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন ক'রেছিল, সকল সংগ্রামাত্মক কাজে যাদের উদ্যোগ ছিল তারা এত দিনে গতানুগতিক ধারায় ভেসে গেল। মনে প্রশ্ন জেগেছে—তাঁ'দের যা দেওয়ার তা দেওয়া শেষ হয়ে গেছে কি? প্রথম যুগের বিপ্লবী নেতারাও এমনি করেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে গেছে। বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিন দাস, এমন কি সর্ব্বজনবরেণ্য নেতা অরবিন্দ ঘোষের দানও আজ ম্লান, নিষ্প্রভ। দ্বিতীয় যুগের বিপ্লবী কর্ম্মীরা প্রায় বিশ বৎসরের কঠোর সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় যে-নেতৃত্বের অধিকারী হয়েছিল ১৯২৯-৩০ সালের সংগ্রামের অভিনবত্বে তা হারিয়ে গেল। তখন যারা সংগ্রামের অগ্রগতির পথে এসেছিল তারা জেল থেকে বেরিয়ে এসে দশ বছর পরে ১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। প্রগতির পথে

চলতে গিয়ে তারা বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক পথের সন্ধান পায়। যারা তাদের পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল তারা সেই যে-পথ হারিয়েছিল সে-পথের সন্ধান আর পেল না। প্রাতক্রিয়া বাসা বাঁধলো তা'দের মজ্জায় মজ্জায়—শুরু হ'লো দলে দলে বিরোধ,—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মত-পার্থক্য। নিজের মনের মধ্যেই দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি। ভাবপ্রবণতায় তৈরী উজ্জ্বল জীবনের কি বিস্ময়কর পরিণতি!

১৯২৮-২৯ সালে বাঙলায় যাঁরা বিপ্লবী নেতা এবং খাঁটি জাতীয় আন্দোলনকারী হিসাবে সুপরিচিত ও সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে দেওয়া হ'ল; তাঁদের ত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং সাম্রাজ্যবাদের কারাগারে কঠোর কারাদণ্ড ও অশেষ লাঞ্ছনার মাঝেও অচল অটল থাকার সাধনা অতুলনীয়: নরেন সেন, ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, রমেশ আচার্য্য, ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জ্জি, সুরেন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন দত্ত, সতীশ চক্রবর্ত্তী, পূর্ণ দাস, বিপিন গাঙ্গুলী, জ্যোতিষ ঘোষ, অনিল রায় প্রভৃতি।

মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় বন্দী

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে আমরা ৩০।৩২ জন আলিপুর জেলে আছি বিচারাধীন বন্দীরূপে। আলিপুর বিশেষ আদালতে আমাদের নামে মেছুয়াবাজার বোমার মামলা রুজু করা হয়েছে। প্রতিদিন আমরা সশস্ত্র পুলিস ও সার্জেণ্ট পরিবৃত হয়ে কয়েদ-গাড়ীতে শ্লোগান দিতে দিতে কোর্টে যাই, আবার জেলে আসি। জেলের ভিতর আমাদের সোয়াস্তি ছিল না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর সোম মোটেই সুবিধার লোক নন; দিন দিন অসুবিধা সৃষ্টি করাই তাঁর কাজ। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর অখাদ্য খেতে হয়। প্রতিকার প্রার্থী হলেই তিনি চ'টে যান। চিঠিপত্র দেওয়া এবং পাওয়ার গণ্ডগোল হচ্ছে; তিনি বলেন, can't help (উপায় নেই)। মাথার তেল চাই—can't help (উপায় নেই); ময়লা কাপড় কাচার সাবান চাই—can't help (উপায় নেই); খবরের কাগজ চাই;—can't help. (উপায় নেই)। আবার নিয়মমত সারবন্দী দাঁড়ানো,সাহেবকে সেলাম ঠুকা, সন্ধ্যার আগেই নিজের নিজের ঘরে ঢুকেই সেপাইকে তালাবন্ধ করার সুযোগ দেওয়া—এসবের একটুও ত্রুটি তিনি সহ্য ক'রতে পারেন না। ক্রমশ বুঝা গেল, সমস্ত রাজবন্দীর উপরই তিনি খড়্গহস্ত।

একদিন সকালবেলা অকস্মাৎ পাগলাঘণ্টি বেজে উঠল। আমরা অবাক হয়ে ভাবলাম, 'কি এমন হ'ল!' চারিদিকে প্রাচীর পরিবেষ্টিত। কোনো ইয়ার্ড থেকে কিছু বুঝবার উপায় নেই। ছেলেরা চঞ্চল হয়ে দেখ্‌ছে কোথায় কি হ'ল। সামনের ইয়ার্ডের ৮।১০ জন রাজনীতিক বন্দী—এর মধ্যে জে. এম. সেনগুপ্ত, আর সুভাষ বসুও আছেন। এঁরাও কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছেন, অকস্মাৎ একদল সশস্ত্র সেপাই ও সার্জেণ্ট সহ মেজর সোম আমাদের ইয়ার্ডে প্রবেশ করেন এবং ছেলেদের উপর লাঠি চার্জ শুরু হ'ল। আমরা সেখানে ছুটে যাই; তখন তারা আমাদের সকলের উপরেই লাঠি, বেটন এবং বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে। মেজর সোম কতগুলি দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির পাঠান কয়েদীকেও সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন। তারা নির্ম্মম ভাবে আমাদের মুখে ঘাড়ে পিঠে কিল ঘুষি মারতে লাগলো। আমাদের কারুর মাথায়, কারুর পিঠে, কারুর বা হাতে লাঠির আঘাতে কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। সুভাষ, সেনগুপ্ত, নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য গুপ্ত এবং আরো ৫।৬ জন রাজবন্দী পাশের ইয়ার্ডের সিঁড়ি থেকে এ-দৃশ্য দেখছিলেন। তাঁরা চিৎকার ক'রে জেলকর্ত্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতি সহানুভূতিসূচক ধ্বনি দিতে থাকেন। নিশাকান্ত, নিরঞ্জন সেন, নির্ম্মল দাশ, শচীন কর, সুধাংশু দাশ, জগদীশ চট্টোপাধ্যায়, আমি এবং আরো ৫।৬ জন বেশী রকমআহত হই। মারতে মারতে আমাদের সেলে ঠেলে দিয়ে তালাবন্ধ করে দেয়। তারপর পাশবিক উত্তেজনায় সার্জেণ্ট ও সেপাই দল মেজর সোমের পেছন পেছন পাশের ইয়ার্ডে গিয়ে প্রেমসিং প্রেম নামে এক শিখ যুবককে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করে। প্রেমসিংহ আমাদেরই বন্ধু। যতীন দাসের অনশনে মৃত্যুর পর শোভাযাত্রা করায় গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সুভাষ বাবু, সেনগুপ্ত ও নৃপেনবাবুকেও সার্জেণ্টরা

ঘুষি মেরে ধাক্কা দিতে দিতে সেলে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে। দুপুর বেলা রক্তাক্ত দেহে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় আমাদের আলিপুর কোর্টে নিয়ে যায়। জেলগেট, কোর্টগৃহ; কোর্টের প্রবেশপথ লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। জেলের লাঠি চার্জের খবর বাইরে রটে যায়। মামলা স্থগিত রেখে সেদিন জেল হাঙ্গামা সম্পর্কে কোর্ট আমাদের বিবৃতি নেয় এবং আহত স্থান দেখে। অপরাহ্নে জাতীয় পত্রিকাগুলি জেলের বিবরণ সম্বলিত বিশেষ সংখ্যা বের করে। রটে গিয়েছিল—রাজবন্দীদের কেউ কেউ লাঠির আঘাতে মরে গিয়েছে। কয়েদী গাড়ীতে বিকাল বেলা ফিরবার সময় জেল গেটে সহস্র সহস্র লোকের ভীড় দেখতে পাই। শত শত সিপাই—বন্দুক ঘাড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। জেলের ভিতরকার অত্যাচার চঞ্চল শহরবাসীকে আরো বেশী চঞ্চল ও উত্তেজিত ক'রে তুলেছে। তখন মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডি মার্চ আরম্ভ হয়েছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংবাদ এসেছে। এমনই সঙ্কট সময়ে কলকাতার বুকের উপর আলিপুর জেলে এই ভয়াবহ অত্যাচারের ঘটনা ঘটে।

মেছুয়াবাজার বোমার ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় সাজা হ'ল। আলিপুর জেলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী রূপে আছি। আইন অমান্য আন্দোলনের কয়েদীতে জেল ভর্ত্তি; রাত্রিতে তালাবন্ধ করা হয় না। কয়েদীরা সকলেই ঘুরে বেড়ায়, জেলে মহোৎসব। বোমা-ইয়ার্ডের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র, এখানে বোমার দলের সাংঘাতিক কয়েদীরা থাকে; তালাবন্ধ সার্জেণ্টের পাহারা, কঠোর বিধি-বিধান—সবই আছে। এরই ফাঁক দিয়ে সার্জেণ্টকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দু'চারজন বেরিয়ে আসে, দু'চারজন ভিতরে এসে দেখা করেও যায়। মজুর-কৃষক পার্টির নেতা হালিম আসতেন প্রায়ই। দেখাশোনা, মেলামেশা, দু'চারটে গণ-আন্দোলনের কথা, মজুর-কৃষক পার্টির কথা ব'লে চলে যেতেন। সুভাষবাবুও জাঁদরেল গোছের কোনো সার্জেণ্টকে

হাত ক'রে মাঝে মাঝে আমাদের আঙিনার দিকে চলে আসতেন। দেখাশোনা, মেলামেশা করতেন; দু'চারটে রাজনীতির কথা, বিপ্লবীদলের কথা বলে চলে যেতেন। সুভাষবাবু নিজেই দয়া ক'রে আসতেন। হালিমকে আমরা ডেকে আনতাম। সতীশ দাসগুপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অনুমতি নিয়ে আমাদের কাছে গীতাপাঠ ক'রতে আসতেন। আমাদের আপত্তি ছিল না। প্রাচীর পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে আমরাই শুধু কয়েকটি প্রাণী থাকি—এর বাইরে থেকে কেউ এলে আমরা সাদরে তাঁকে গ্রহণ করতাম। সতীশবাবু আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনকারী যুবকদের ত্যাগ, সাহস ও স্বদেশহিতৈষিতা সন্ত্রাসবাদী স্বদেশহিতৈষী যুবকদের চেয়ে কম নয়। কাঁথি সমুদ্রতীরে লবণ জ্বাল দেওয়ার সময় পুলিসের বর্ব্বর আক্রমণের কথা তিনি উল্লেখ ক'রতেন; কর্ম্মীরা জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে পুলিস আক্রমণের বিরুদ্ধে কেমন বিক্রমের সঙ্গে তপ্ত কড়াইয়ের চারপাশ ঘিরে রক্ষা করেছেন সে-সব সতীশবাবু মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করতেন। আমরা ছিলাম প্রায় ২০জন বোমার দলের বন্দী—অধিকাংশই তরুণ বয়সের বিপ্লবী। সুস্থ সবল দেহ, বলিষ্ঠ মন, সতেজ দৃষ্টি; পুরানো প্রতিক্রিয়াশীল দলের নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। অনেকের ধারণা পুরানো নেতারা আর কিছু করবে না, এই নূতন বিপ্লবী দলই ভবিষ্যতে উঠে দাঁড়াবে। সুভাষবাবু তাই আমাদের সঙ্গে খাতির জমাতে চান। আমরা সকলে তাঁকে ঘিরে বসলে তিনি একদিন বললেন—"স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং মুসোলিনীর ফাশিস্ট ডিসিপ্লিন ও সংগঠন—এই তিনটি হবে আমার ভবিষ্যতের কার্য্যধারা। আশা করি এই পদ্ধতিতে আমরা একসঙ্গে কাজ ক'রতে পারব।" আমরা স্পষ্ট কিছু না বলে এ বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করি।

কথাপ্রসঙ্গে সুভাষবাবু বলেছিলেন, ভারতের বিশিষ্ট ধারায় গড়ে উঠবে ভারতীয় স্বাধীনতা; রুশিয়া থেকে আমরা নেব গণতন্ত্র, মুসোলিনীর কাছ থেকে নেব দুর্দ্ধর্ষ ফাশিস্ট পার্টির নিয়ম-শৃঙ্খলা (ডিসিপ্লিন) ও সংগঠনের কায়দা। তখনো হিটলারের নাৎসীশক্তি তেমন প্রকট হয়ে ওঠেনি, ইটালীর ফাশিস্ট নেতা ও ফাশিস্ট পার্টির শক্তিমত্তায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ব'লতেন, ভারতের মত ভেদ-বৈষম্যপূর্ণ দেশে মুসোলিনীর মত শক্ত নেতা ও শক্তিশালী দল তৈরী না হলে চলবে না। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ ও ফাশিস্টবাদ —এই তিনটির কিছু কিছু অংশের তিন মিশালী দিয়েই সুভাষবাবু স্বাধীন ভারতের বনিয়াদ গড়তে চেয়েছিলেন, তখনকার নবজাগ্রত শ্রমিক আন্দোলনকারীদের খুশী করার জন্য তিনি রুশিয়ার কথা বলতেন—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তুষ্টির জন্য ইতালীর যুব-সংগঠন, মিলিটারী ডিসিপ্লিন ইত্যাদির কথা বলতেন; সকলকে খুশী করার জন্য বলতেন ভারতে উদ্ভূত ভারতের নিজস্ব স্বাধীনতার কথা।

একদিন তিনি আমাদের দু'জনকে চুপি চুপি আড়ালে ডেকে ব'ললেন, কিছু অস্ত্রের সন্ধান বলে দিতে পারেন? তা হলে বাইরে খবর দিয়ে কিছু কাজ করান যেতে পারে। গান্ধীজীর অহিংস পথে কিছুই হবে না। আমরা সুভাষবাবুর কথায় উৎফুল্ল হয়েছিলাম। বাঙলাদেশে সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে সহযোগিতা না ক'রে কোনো নেতাই নেতৃত্ব ক'রতে পারতেন না।

মেছুয়াবাজার বোমার ষড়যন্ত্রকারী নূতন বিদ্রোহী দলের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের মূলে ছিল সুভাষবাবুর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

জে. এম. সেনগুপ্ত রাশভারী লোক, তিনি নিজে কখনো আসতেন না। হালিমকে আমরা আমাদের বিশেষ বন্ধু মনে করতাম। তিনি

কমিউনিস্ট পার্টির নানারকম দেশী-বিদেশী পুস্তিকা, মাসিকপত্র গোপনে আমদানী ক'রে আমাদের পড়তে দিতেন। আমরা সেগুলি অতি আগ্রহের সঙ্গে পড়তাম। তখন থেকেই আমাদের কমিউনিস্ট হওয়ার ইচ্ছার উন্মেষ হয়। সেদিন ছিল এসব ভবিষ্যতের কথা, সে সাতবৎসর পরের কথা—কে জানে কবে মুক্তি পাব; সেনগুপ্ত বলেছিলেন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ক'রেই আমাদের প্রথম কাজ হবে আপনাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া। আমরা কিন্তু সাত বৎসর জেল খাটার পরও মুক্তি পাইনি। সেনগুপ্ত বা কংগ্রেসী দল বাঙলায় মন্ত্রিত্বও পাননি।

আগস্ট মাসে রাজসাহী জেলে নিয়ে আমাকে এক ক্ষুদ্র সেলে ফাঁসীর আসামীর জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পৃথক ক'রে রাখে। আর কোনো রাজবন্দীর সঙ্গে আমাকে মিশতে দিত না। জেল থেকে পালাব এই সন্দেহে তারা আমাকে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে। বিশ্বের সকল সংস্রবের বাইরে আলো-বাতাসহীন নির্জ্জন কক্ষে একাকী প্রায় এক বৎসর থাকি। প্রথম প্রথম খুবই কষ্ট হ'ত। একখানা বই অবধি সঙ্গী হিসেবে পাইনি। 'রেপ কেসে' (Rape case) শাস্তি প্রাপ্ত এক মণ্ডলভীকে পাশের কক্ষে আমার সাথী হওয়ার জন্য দেয়। লোকটি জেলার সাহেবের গুপ্তচর বলে সকল কয়েদীর ঘৃণ্য ছিল। যেমন ক'রেই হোক, সকল দুরবস্থার মাঝে সব কিছু জয় ক'রে আমি একটা পরিপূর্ণ আনন্দের অনুভূতিতে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। কোনো দুঃখ বোধই ছিল না। শরীর মন সব যেন সবল হয়ে উঠেছিল।

"মন আমার ভরে ছিল কোন গন্ধে
হৃদয় আমার নেচেছিল কোন আনন্দে"—

সেদিনের কথা স্মরণ করে এ-কথাই আমার আজ মনে পড়ে। প্রায় এক বৎসর পরে অন্য ওয়ার্ডে অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে মিলিত হই।

সকলের সংস্রব থেকে আমাকে পৃথক ক'রে রাখার সময়টুকুর মধ্যে অনেক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেছে দেশে ও বিদেশে। গোলটেবিল বৈঠকে গিয়ে বিলাত থেকে ভারতের নেতারা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভের আশ্বাস নিয়ে এসেছেন। কারামুক্ত কংগ্রেস নেতৃবর্গ দিল্লীতে বড়লাটের সঙ্গে সন্ধির আলাপ আলোচনা ক'রে গান্ধী-আরউইন চুক্তি পত্র সই করেন। অহিংস সংগ্রামের সৈনিকগণ হাজারে হাজারে মুক্তি পেতে লাগলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সশস্ত্র সংগ্রামের সৈনিক ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসী হ'ল। করাচী কংগ্রেসে এবার এই প্রথম মজুর-কৃষকের কতকগুলি সাধারণ দাবী স্বীকৃত হ'ল। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কমিউনিস্ট সৈনিকদের বিচার তখনো চলেছিল। বাঙলার বিপ্লবী বন্দীরা—দণ্ডপ্রাপ্তই হোক আর নির্ব্বিচারে বন্দীই হোক—জেলে ও ক্যাম্পে আটক হয়েই রইলেন। মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সন্ত্রাসবাদীর গুলিতে নিহত হলেন।

যে আইন-অমান্য আন্দোলন ব্যাপকতর ও তীব্রতর হয়ে কৃষক ও গণশ্রেণীকেও বৃটিশের বিরুদ্ধে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে তা দমে শান্ত হয়ে গেল।

একদিন খবর এল হিজলী বন্দী ক্যাম্পে মিলিটারী পুলিসের গুলিতে অনেক রাজবন্দী হতাহত হয়েছে। বিপ্লবী নেতা সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নিহত হন। ন্যায্য দাবীর ফলে বৃটিশ-শাসিত কারাগারে আটক বন্দীদের প্রতি এই অমানুষিক অত্যাচার পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। এই ব্যাপারে আমরা খাওয়া বন্ধ ক'রে দিই বলে পরে শাস্তি ভোগ করতে হয়।

১৯৩১ সালের শেষ ভাগে হাজারীবাগ জেলে আমাকে বদলী ক'রে দেয়। নতুন অবস্থায় নতুন অসুবিধা অনেক ভোগ ক'রতে হ'ল। ১৯৩২

সালের প্রথমেই দ্বিতীয়বার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। এবার আন্দোলনের আগেই নেতারা সব জেলে। বিহার ও উড়িষ্যায় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ হাজারীবাগে সরকারী অতিথি হয়ে এসেছেন। সকলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হয়। সহিংস ও অহিংস আন্দোলন নিয়ে বাদানুবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, গান্ধীবাদ নিয়ে একটু আধটু আলোচনা —এই সব হ'ত। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন: "গান্ধীবাদ সকলের প্রতি সকলের প্রীতি সৌহার্দ্দ্য জাগিয়ে দেয়; সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের নীচ্ মনোবৃত্তিগুলি উস্‌কিয়ে তোলে।" যাই হোক রাজেন্দ্র বাবুকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করতাম। মনে হ'ত, এঁর মত ত্যাগী একনিষ্ঠ নেতা বাঙলার কংগ্রেসে থাকলে কংগ্রেস আরো শক্তিশালী হ'ত—দলাদলি দূর হ'ত। শ্রীকৃষ্ণ সিং শ্রেণীসংগ্রাম চান না, কিন্তু আমন সভার জমিদার গুলির দোষে শ্রেণী-সংগ্রাম এসে পড়বে বলে তিনি শঙ্কিত। আবদুল বারী সাহেব আমাকে লাপিডাসের "পলিটিক্যাল ইকনমি" পড়তে দেন, আরও কিছু সমাজতন্ত্রবাদমূলক সাহিত্য পড়তে দেবেন বলে ভরসা দেন। মুঙ্গেরের নেতা নিরাপদ মুখার্জী আমাকে খুব প্রশংসা করেন। দুঃখ ক'রে বলেন, আমার ছেলেটা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, সে যদি আপনাদের দলে যেত তবু সুখী হতাম!...তাঁর ছেলের নাম সুনীল মুখার্জী, বর্ত্তমানে (১৯৪৬) বিহার প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী।

ডাঃ খান সাহেব ও তাঁর ভাই গফ্‌ফর খাঁ (সীমান্ত গান্ধী) এ জেলে 'স্টেট প্রিজনার' হয়ে আছেন। তাঁরা দু'ভাই আমাদের বাঙলার বিপ্লবীদের খুব প্রশংসা করেন। সীমান্তের পাঠানরা নাকি আমাদের খুব শ্রদ্ধা করে। তাদের ধারণা, কলকাতায় ইংরেজেরা আমাদের গুলির ভয়ে রাস্তায় বের হতে পারে না। আব্‌দুল গফ্‌ফর খাঁন তাদের বলেন: 'ঐ বিপ্লবীরা তো হিন্দু।' পাঠানরা নাকি উত্তর দেয়: 'তা কখনো হতে পারে না—তারা

বাঙালী।' হিন্দু বলতে পাঠানরা সুদখোর ধনী ও বেনেদেরবোঝে। আবদুল গফ্‌ফর খান স্বয়ং আমাকে এ গল্প বলেন। পুরুলিয়ার নিবারণ দাসগুপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ব'লে সকলের শ্রদ্ধা পেতেন। তিনি আমার ঘরে এসে প্রায়ই হেগেলের দর্শনতত্ত্ব বুঝাতেন। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদে (ডায়ালেক্‌টিক) আর মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদে রাতদিন তফাৎ। ধনতন্ত্রবাদী পীড়নে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিতর মার্ক্‌সীয় দ্বন্দ্ববাদ সম্প্রতি দেখা গেলেও ভারতের আগামী সভ্যতার উচ্চ মান হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ ভিত্তি ক'রে দাঁড়াবে এই তাঁর মত। নিবারণবাবু পরম গান্ধীভক্ত। চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা সূর্য্য সেনের গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদে তিনি মর্ম্মাহত হন এবং আমাকে বলেন: 'এত বড় একটি স্বদেশপ্রাণ কর্ম্মীর গ্রেপ্তারে আজ খেলাধূলা বন্ধ রাখা ভাল মনে করি। আমিও এতে আপনাদের সঙ্গে থাকব।' স্বয়ং রাজেন্দ্রপ্রসাদ যেখানে আছেন সেখানে হিংসাপন্থী একজনের জন্য এত দরদ দেখাবার সাহস অন্য কোনো কংগ্রেসী নেতার ছিল না। উড়িষ্যার নবকৃষ্ণ চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী মালতী দেবী ঐ জেলেই বন্দী। তাঁদের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়। উড়িষ্যার ছেলে ও মেয়ে সংগঠন নিয়ে ওঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হ'ত। সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে কথা হলে নবকৃষ্ণ বাবু বলতেন, এসব আইডিয়া মন্দ নয়। পরে তাঁরা স্বামী স্ত্রী উভয়েই কঠোর সমাজ-তন্ত্রবাদী হন। হরেকৃষ্ণ মহাতব বাঙলার যুবক আন্দোলনের নীতি-পদ্ধতিও কৌশলে লিখে দেওয়ার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করতেন। বাঙালী বিপ্লবীর মত একনিষ্ঠ ত্যাগী ও সাহসী কর্ম্মীদল উড়িষ্যায় গঠন করার জন্যই তিনি আমার কাছ থেকে আমাদের কর্ম্মধারা নোট করে নেন। অধ্যাপক আবদুল বারী, বেনীপুরী, কিশোরী প্রসাদ, ধনী যুবক নেতা মিছির প্রভৃতির সঙ্গে আমার সদ্ভাব হয়। তাঁরা তখন সমাজতন্ত্রবাদের বুলি আওড়াতেন। মতিহারী জেলার প্রজাপতি মিশ্র খাঁটি গান্ধীবাদী হলেও স্বভাবগুণে

আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। আচার্য্য কৃপালনী বলতেন: "আপনাদের মতবাদ ভাল। আমিও বিশ্বাস করতাম। গান্ধীজির মতবাদ এসে সকল মত ও পথ ডুবিয়ে দিয়েছে।" আন্দামান যাওয়ার সময় তিনি আমার নামে ২০৲ টাকা জমা দিয়েছিলেন। বলে দেন: 'কোনো বিপদে টাকার দরকার হলে সিন্ধু দেশে আমার বাড়ীতে লিখবেন।' এই আচার্য্য কৃপালনী ফেরারী বিপ্লবী নলিনী বাগচীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বিহার প্রদেশের বিপ্লবী বন্দীরা আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনার ফলে সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে কমিউনিজ্‌মের পক্ষপাতী হয়ে উঠে। ওখানে তাদের ঝগড়া বিরোধ মেটাবার জন্য, হিংসা অহিংসা মতের সমস্যা সমাধানের জন্য, ক্লাস ক'রে রাজনীতিক আলোচনার জন্য আমাকে ডাকত। তখন আমি সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে কমিউনিজ্‌মের দিকে দৃষ্টি দিয়েছি মাত্র এবং কমিউনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে আমার ধারণা তখন ছিল নিতান্তই অস্পষ্ট। হাজারীবাগ জেলে রাজবন্দী মহলে অহিংসারই প্রবল প্রভাব। যখন খবর এল যে, কলকাতা রাইটার্স বিলডিংস্-এ কারাগার সমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল গুলিতে নিহত হয়েছেন তখন অনেকেরই চোখে মুখে পুলক ভাব। বিনয় বসু ও দীনেশের প্রতি প্রশংসাসূচক উক্তিও শোনা গেল। বিনয় ও সুধীর গুলি ক'রে পরে আত্মহত্যা করে। দীনেশ ফাঁসীতে মরে। দীনেশের ফাঁসীর দিনে কলকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিকের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের প্রথম লাইনে লেখা হয়:

Dauntless Dinesh Dies at Dawn

জেলের ভিতর গোপনে ঐ কাগজটুকু দেখে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম। এরকম লেখা কি চলে! তবে সত্যিই কি দিন ফিরেছে? ঐ সময় বিভিন্ন জেলে রাজবন্দীদের উপর অত্যাচার চলছিল, তার জন্যই ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের উপর গুলি হয়।

বিহার উড়িষ্যার নেতাদের রাজনীতিক জ্ঞান বাঙালী নেতাদের চেয়ে কম; আমি সাধারণ ভাবে এ কথাটা বলছি। প্রথোমক্ত নেতৃবৃন্দের রাজনীতিক সারল্য, গান্ধীবাদের প্রতি একনিষ্ঠা, ঐকান্তিক ধর্ম্মবিশ্বাস ও মধ্যযুগীয় মনোভাব দেখে আমার এমন ধারণা জন্মে। আইন অমান্য আন্দোলনে অনেক বিহারী কৃষক হাজারীবাগ জেলে আসে। রাজেন্দ্র প্রসাদকে দেখা মাত্র তারা ফাইল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে। সেদিন আমিও রাজেন বাবুর পায়চারি করার দলে ছিলাম। মথুরা প্রসাদ গর্ব্বভরে বলছিলেন: "দেখেছেন সতীশ বাবু, বিহারের কৃষক-প্রজারা নেতাদের কেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখে! দূর থেকে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে দেখা মাত্র সমস্ত কয়েদী কেমন নত মস্তকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। এখানে আপনাদের সমাজতন্ত্রবাদের কোনো প্রয়োজন নাই। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এত মধুর যে, কৃষক শোষিত হচ্ছে ব'লে মনেই করে না।" —একটু পূর্ব্বেই শ্রেণী-সংগ্রামের কথা হয়; নেতারা এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। তাই সুযোগ পেয়ে মথুরা বাবু শ্রেণী-সমন্বয়ের এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়ে দিলেন। মুচকি হেসে তাদের অনুসরণ করলাম। রাজেন্দ্রপ্রসাদ নীরব ছিলেন। সকল নেতারই অল্পবিস্তর জমিদারী আছে, মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার মধ্যে তাঁদের রাজনীতি সীমাবদ্ধ ছিল। আমি কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবী মতাবলম্বী হলেও ঐ জেলে সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করেছিলাম। অহিংস-পন্থী নেতারা আমাদের বিপথগামী ব'ললেও আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যে ত্যাগ ও সরল বিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ করতেন না।

আন্দামান দ্বীপের কারাকক্ষে

১৯৩৩ সালের প্রথম ভাগে হাতে হাতকড়া ও পায়ে পাঁচ সের ওজনের বেড়ি প'রে হাজারীবাগ থেকে আন্দামান দ্বীপে নির্ব্বাসিত হওয়ার জন্য যাত্রা করি। জেলের সমস্ত রাজবন্দীরা মালা দিয়ে বিদায় দেয়। বেড়ী প'রে আলিপুর জেলে পৌঁছি। আন্দামানের যাত্রীদের একে একে সবাইকে এখানে এনে জড়ো করা হচ্ছে। নিরঞ্জন সেন, ডাক্তার নারায়ণ রায় ও ডাক্তার ভূপাল বসুকে আমার পূর্ব্বেই বোম্বাই ও পাঞ্জাবের জেল থেকে আনা হয়েছে। বর্দ্ধমান থেকে হরেকৃষ্ণ কোঙার নামে একটি উনিশ বছরের ছেলেও আন্দামানের যাত্রী হয়ে আসে। স্বদেশী কাজে সবেমাত্র ব্রতী হয়েছিল সে। আমাদের সকলেরই অপরিচিত। স্বদেশী সমস্যা জানার আগ্রহে সকলের প্রীতির পাত্র হয়ে ওঠে। একটি যুবকবন্ধুর ছোট্ট একটুকরা চিঠি একদিন দেখলাম আমার নিভৃত কক্ষে: "দাদা, আপনার মতামত কি, আন্দামান যাওয়ার পূর্ব্বে লিখে জানিয়ে দিয়ে যান। আপনি কি আমাদের পুরানো পার্টিকে সমর্থন করেন না? নূতন মতবাদ নিয়ে যে কথা উঠেছে তাতে আপনার মত কি? আমরা আপনার উত্তরের জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে আছি।" আমি শুধু লিখেছিলাম: "নূতন মতবাদ আমি পড়ি ও পছন্দ করি। পুরানো যে-পথ ছেড়ে অনেক দূর

এগিয়ে এসেছি আর সেখানে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাও নাই—ইচ্ছাও নাই। আমি ক্রমশই সমুখপানে চলেছি। তোমরাও পড়াশুনা, আলাপ আলোচনা ক'রে নূতন যুগের নূতন বিপ্লবী হবে—এইটাই আশা করি। আগামী যুগ গণ-আন্দোলনের যুগ।" এর বেশী কিছু তখন আমার বলার ছিল না।

আলিপুর জেল থেকে আমরা ১৬ জন সরকার প্রদত্ত ছেঁচা লোহার এক এক জোড়া বেড়ী পরে সাগর-তরঙ্গে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য যাত্রা করলাম। সিপাই শান্ত্রীরা বন্দুক নিয়ে এসেছে দলে দলে—জাহাজে চড়ে সাগরের বুকে নাচতে নাচতে আমরা যাব কালাপানি—আন্দামান দ্বীপে, যেখানে কলকাতা থেকে মাসে একদিন একখানা জাহাজ কয়েদী নিয়ে যায়। অমৃতবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল : "সমুদ্রের ওপরও কি বন্দীদের পায়ে বেড়ী দেওয়ার প্রয়োজন আছে? যদি বৈশাখের ঝড়ে জাহাজ ডুবে যায় তা হ'লে বাঁচার চেষ্টা করারও কোনো উপায় তাদের থাকবে না। জাহাজ ডুবলে বাঁচার চেষ্টা করা যদি অবৈধ না হয় তবে হতভাগ্য বন্দীদের সে সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।" "মহারাজা" স্টীমার ডায়মণ্ড হারবার ছেড়ে হতই দক্ষিণে সাগরাভিমুখে যেতে থাকে ততই মনে অভূতপূর্ব্ব পুলক, বিস্ময় ও কৌতূহল হচ্ছিল। কোথায় কোন্ অজানা-রাজ্যে যাচ্ছি! গেল যুদ্ধের সময় যারা আন্দামানে ছিল তাদের বন্দীজীবন বড় আরামে কাটেনি—নিদারুণ লাঞ্ছনার ভিতর তারা রাজবন্দীর মাহাত্ম্য বজায় রেখেছিল। ভারতের জনসাধারণের কাছে আন্দামান বন্দীশালা একটা অত্যাচারের প্রত্যক্ষ নিদর্শন বলে সরকার ওখানে স্বদেশী-বন্দী রাখা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। এখন আবার সে অন্ধকূপের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। সাময়িক উদারতার ভান করে আমাদের সাম্রাজ্যবাদী রাজ আবার নিজের স্বাভাবিক মূর্ত্তি

ধারণ ক'রেছে। তাই আমাদের "বিপজ্জনক বন্দীদের" ভারতের বাইরে —দূরে—দ্বীপান্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা। রুশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেণ্ট বরফের দেশ সাইবেরিয়ায় রাজবন্দীদের নির্ব্বাসনে পাঠাত। ইংরেজ পাঠায় দ্বীপান্তরে—যেখানে স্বাস্থ্য নাই, খাদ্য নাই, বিশ্বজনের সঙ্গে সংযোগ নাই।

দুস্তর জলরাশির মাঝখানে বন্দী স্টীমারেও আমরা বন্দী—ডেকের একটি তালাবন্ধ প্রকোষ্ঠে আমাদের স্থান। শোয়া খাওয়া এখানে। মলমূত্র ত্যাগের ঝঞ্ঝাট কম নয়, বেড়ির উপরে আবার হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বাঁধা চাই। সিপাই দড়ি ধরে নিয়ে যাবে। সকালে বিকালে সকলকে উপরে নিয়ে যেত হাওয়া খাওয়ার জন্যে। বিশাল সমুদ্রের কূল কিনারা কিছুই দেখা যায় না। চারদিকে গোলাকার হয়ে আকাশ ঢলে পড়েছে সমুদ্রের গায়। দক্ষিণ সাগরের দিকে তাকিয়ে কল্পনার মানচিত্রে দূর মেরু সাগর চোখে ভাসে। বিস্মিত হয়ে ভাবি—সে কত দূর! সন্ধ্যাবেলা রাঙা সূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবে যায় অগাধ জলরাশির মাঝখানে, সমুদ্রের সুন্দর দৃশ্য আঁধারে হাহাকার ক'রে উঠে; আমাদের টেনে নিয়ে যায় সিপাইর দল। ভোরে উঠে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হই উপরে ওঠার আশায়। সমুদ্রের বুক থেকে প্রকাণ্ড সূর্য্য লাল হয়ে ধীরে ধীরে ওঠে। তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকি। ভুলে যাই বন্দীজীবনের কথা। সিপাইর দল আবার টেনে নিয়ে যায়—ডেকে—আলোবাতাসহীন গরম প্রকোষ্ঠে। প্রতিদিন বিপদসঙ্কেত (Alarm) পড়ে। চারটে বয়া বুকে কাঁধে বেঁধে লাইন করে দাঁড়াই, ক্যাপটেন সাহেবও গলায় কি একটা সুন্দর জিনিস লাগিয়ে আসে পরিদর্শন ক'রতে। পরে জানলাম, ক্যাপটেন সাহেবের গলায়ও বয়া। জাহাজ ডুবলে ওতে ভর করেই সাহেব মরণের বিরুদ্ধে লড়বে। আমাদের গলার বয়া এত বিশাল কদাকার কেন? ভাবলাম

মরণেরও শ্রেণীভেদ আছে নাকি? চারদিনের পর আন্দামানে পৌঁছলাম।

সশস্ত্র পুলিস পরিবেষ্টিত হয়ে ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে আমরা ১৬ জন পোর্ট-ব্লেয়ার সেলুলার জেলে প্রবেশ করি। কয়েক মাস পূর্ব্ব হতেই প্রতি জাহাজে বাঙলা থেকে বন্দীদের আনা হচ্ছিল। প্রথম দল জেল গেটে পৌঁছলে আন্দামানের ডিপুটি কমিশনার সাহেব বলেছিলেনঃ দেখ খুব শান্ত ভাবে থাকবে গোলমাল কর তো কঠোর শাস্তি; এ বাঙলা নয়—আন্দামান, এখানে অনেক বাঘকে আমরা পোষ মানিয়েছি। সাহেবের উদ্ধত বাক্যের প্রতিবাদ করেন কয়েক জন: আমরা বাঘ নই, বাঙালী বিপ্লবী; বিপ্লবীরা কখনো পোষ মানে না—মারে অথবা মরে; ন্যায় ব্যবহার পেলে তারা ভদ্রতার পরিচয় দিতে জানে।

বাঙলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের সেরা বিপ্লবীদের এখানে এনে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে রাখা হ'য়েছিল। বাঙালী ছিল শতকরা নব্বুই জন। তিন শ' রাজবন্দীকে নির্ব্বাসন দিয়েও একত্রে থাকার সুযোগ না দেওয়াতে মনটা দমে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে আমরা বিভক্ত—দেখা করা বা সংবাদ আদান প্রদানের সুযোগটুকু অবধি নাই। কবুতরের খোপের মত সারবাঁধা ছোট ছোট খোপ, তারই একটিতে গিয়ে প্রবেশ করলাম। বাতি নাই ভিতরে। পায়খানার কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রস্রাবের জন্য একটি মাটির টোপা আছে। খেলা বা ব্যায়ামের ব্যবস্থা নাই। জাল বুনার এবং নারকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি প্যাকানোর কাজ আছে। তিনটে বাজার পরেই জমাদার এসে "মুশাক্কৎ" "মুশাক্কৎ" বলে চেঁচাতে থাকে। মানে যার যার খাটুনি নিয়ে এস। আমরা কঠোর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী। খবরের

কাগজের অভাবটাই আমাদের বড় লাগে, —এ দিকে নিষ্প্রদীপ, সাপ্তাহিক স্টেট্‌স্‌ম্যান ওভারসি' সংস্করণ পড়তে পাই বটে, তা ছিল ক্ষীণ আলো দিয়ে নিষ্প্রদীপের দুর্নাম ঢাকার চেষ্টা মাত্র। বিকালে ৫টা বাজতেই নিজ নিজ সেলে (cell) গিয়ে তালা বন্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার ঘণ্টা বাজে। গ্রীষ্মকালের বেলা তখনও অনেক বাকি থাকে। পরদিন সকাল প্রায় ৭টায় তালা খুলে দিত; দীর্ঘ ১৪ ঘণ্টা তালা বদ্ধ আলোবাতাস-হীন ক্ষুদ্র কক্ষে দিনগুলি কাটত। লেখার কোনো বিধান নাই ব'লে খাতাপত্র পাওয়া যায় না। পড়াশুনার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বিলাতী নভেল কিছু কিছু ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল—কিন্তু তার পাঠক ছিল না। স্বাস্থ্যের কথা—মশা আছে, মশারী নাই, ম্যালেরিয়া বেশ আছে। পানীয় জল খারাব, কাজেই আমাশয় লেগেই আছে। বিষাক্ত পোকা, মাকড়, বিচ্ছু, তেঁতুল বিছেতে সেলগুলি ভরা। ঘর ধুয়ে ঝেড়ে কিছুই প্রতিকার হয় না, পুরানো দেয়ালের মাঝে তাদের বাসা। সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকি। জলের অভাব নিদারুণ। অনেক দিন স্নান না ক'রে অথবা মাথায় খানিকটা জল দিয়ে রয়েছি, তাও বহুক্ষণ বসে থাকার পর সুযোগ পাওয়া যেত। কোনদিন খাওয়ার জল নাই, কোনদিন বা জল না-পাওয়ায় রান্না হতে দেরী হয়ে যেত। এ নিয়ে জেল কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ লেগেই থাকত। তারা মনে করত, কয়েদীর আবার এত দাবী-দাওয়া কেন? চৈত্র মাসের রোদে আমরা হাঁপিয়ে উঠতাম একটু জলের জন্য। খাবার তরিতরকারী ভাল নয়। আলু মাসে একবার আসে কলকাতা থেকে, সুতরাং দুষ্প্রাপ্য। ওখানে ভাল চাল হয় না, কাজেই ভাত ভাল জুটবে কোত্থেকে? সমুদ্রের বড় বড় মাছ পাওয়া যেত; তা দেখে খাওয়ার রুচি থাকে না, খেলেও স্বাদ লাগে না। তৃতীয় শ্রেণীর বন্ধুদের খাদ্য

মানুষেব খাওয়ার উপযোগী ছিল না। ফ্যানের মত ভাত, ঘাসের তরকারী, অসিদ্ধ বিস্বাদ ডাল আর তেতো আটার রুটি। তাতে স্বাস্থ্য কেউই ভাল রাখতে পারেনি। আবেদন, নিবেদন ও নালিশের পর অনশন করাই স্থির হয়। ১৯৩৩ সালের মে মাস। সমগ্র ভারতের রাজনীতিক নেতারা জেলে বন্দী। আইন অমান্য আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, শ্রমিক-আন্দোলন সরকারী নিষ্পেষণে সবই দুর্ব্বল। এমনি সঙ্কটের সময়ে আন্দামান সেলুলার জেলে শুরু হ'ল অনশন ধর্ম্মঘট। খাদ্যাভাব, শিক্ষা ও সংবাদের অভাব, স্বাস্থ্যাভাব, এত সব অভাব দুর্গতি নিয়ে তিল তিল ক'রে মরণের চেয়ে জীবনের সাধনায় এমনি ক'রে একবার মরাই ভাল, এমনি দৃঢ়তা নিয়ে সকলে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজবন্দীব দুর্ব্বহ জীবনযাত্রা পরিবর্ত্তনের চেষ্টায় যতীন দাস লাহোব কারাগারে জীবনাহুতি দিয়েছে। যতীন দাসের আত্মদান ব্যর্থ হতে দেব না। বন্দীর জেল-সংগ্রাম স্বাধীনতা-সংগ্রামেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ। এখানেও আমরা সংগ্রাম-পথযাত্রী। সুতরাং এ বিষম অবস্থায় অনশনই একমাত্র সংগ্রামের উপায়। অনশনকারী দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের জামা-কাপড় কেড়ে নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়ে দেয়। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী, আমাকেও অনশন করামাত্র তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়ে দেয়। সারা দিন-রাত এক-একজনকে এক-এক কুঠরীতে তালাবন্ধ ক'রে রাখে। যাতে আমরা মরে না যাই সেজন্যে জোর করে রবারের নল দিয়ে পেটে দুধ প্রবেশ করিয়ে দিত। সীমান্তের দীর্ঘকায় দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির পাঠান কয়েদীরা আমাদের দু-পায়ে দু-হাতে, মাথায় ও বুকে চেপে ধরত; ডাক্তার দীর্ঘ একটি নল নাসারন্ধ্র দিয়ে পেটের মধ্য অবধি প্রবিষ্ট করিয়ে নলের মুখে দুধ ঢেলে দেয়। একটু মাথা নাড়লেই ব্যথা পাই। ডাক্তারের তাড়াহুড়াতে কতজনের

নাসারন্ধ্রে ঘা হয়ে যেত। এমনি নিষ্ঠুর ভাবে খাওয়ানোর ফলে আমাদের তিনটি বন্ধু একে একে মারা যায়—মোহিত মৈত্র, মোহনকুমার দাস এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার মহাবীর সিং। তাদের মৃত্যুর পর অনশনকারীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। সরকারী অবহেলায় তিনটি স্বদেশপ্রাণ যুবকের জীবন শেষ হয়ে গেল। কেউ জানল না, কেউ তাদের পবিত্র দেহের সৎকার করল না, বিদেশে বিভুঁইয়ে কালাপানির কালো জলে তারা ডুবে গেল। মুক্তি-সংগ্রাম-বিজয়ের দিনে বীর শহীদের বেদীমূলে এদের আত্মদান অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আন্দামান জেলে তিনজন রাজবন্দীর মৃত্যু-সংবাদে ভারতে বিপুল আন্দোলন হয়। ভারত গভর্নমেণ্ট তদারক করার জন্য লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল বার্কারকে পাঠান। এরই মধ্যে আমাদের উপর অত্যাচার চরমে ওঠে। অনশনের মধ্যে একবার দুবার জল পান করতাম। কারুর বা দেড়মাস, কারুর বা একমাস অনশনে থাকার পর সরকারী নির্দ্দেশে জল দেওয়া নিষিদ্ধ হ'ল। নিরঞ্জন সেন ও সুখেন্দু দাসের নাড়ী পাওয়া যাচ্ছিল না ব'লে তাদের চিকিৎসার নামে পৃথক স্থানে নিয়ে যায়। হীরামোহন চ্যাটার্জী নামে বরিশালের একটি ছোট্ট ছেলেকে নীরব ও নিস্পন্দ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ডাক্তার সাহেব নাড়ী পরীক্ষা ক'রে জিজ্ঞাসা করেন : 'কেমন—এবার অনশন ছাড়বে ?' হীরামোহন উত্তর দেয়, : 'কেন ? জল বন্ধ করেছেন ব'লে মরণও বন্ধ করতে পারবেন কি ?' আমি নিজেও তখন জীবনের আশা ছেড়ে দিই। কিন্তু ধর্ম্মঘট শেষ অবধি জয়যুক্ত হবে—এ বিশ্বাস খুবই ছিল। প্রায় দু'মাস পর কর্নেল বার্কার সাহেবের বিবেচনার প্রতিশ্রুতিতে আমরা অনশন 'ভঙ্গ করি। এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের প্রায় সকল দাবীই পূর্ণ করে দেওয়া হয়। তিনটি অমূল্য জীবনের বিনিময়ে রাজবন্দীর মহার্ঘ্য

দাবী আদায় করা সম্ভব হয়। এরপর স্বাস্থ্যরক্ষার ও জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধির প্রসারের পথ উন্মুক্ত হ'ল সুদূর দ্বীপান্তরের কারাগারে। শাস্তির আগার নবচেতনার শিক্ষাগারে পরিণত হ'ল—আঁধার ঘরে জ্বললো আলো। নিরঞ্জন সেন, ডাক্তার নারায়ণ রায়, লাহোরের ধন্বন্তরী, জয়দেব কাপুর প্রমুখ কয়েকজন মার্ক্‌সিস্ট সাহিত্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দ্বারা আন্দামান বন্দীজীবনে এক নূতন প্রেরণা সঞ্চার করেন। ডাঃ নারায়ণ রায়ের সুন্দর শিক্ষা-প্রণালী, জটিল ব্যাপারকে সরল ক'রে বুঝাবার অপূর্ব্ব ক্ষমতা এবং জীববিদ্যার ও শরীরবিজ্ঞানের ব্যাখ্যান যুবকদের মার্ক্‌সবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। তাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শেষ অবধি আন্দামান জেলের শতকরা নব্বই জন রাজবন্দী 'কমিউনিজ্‌ম্' মতবাদ গ্রহণ করে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার সকলেই ক্রমে ক্রমে এ-মতে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। এখানে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন (জেলের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন) গঠিত হয়।

যাই হোক, বন্দীজীবনের দুর্ভাগ্য-লাঞ্ছনার শেষ কিন্তু হয়নি। আমাদের একদিকে যেমন সুবিধা হয়, আবার নিত্য নূতন অসুবিধা সৃষ্টি করাই ছিল চীফ কমিশনার সাহেবের কাজ। জেল কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে খুঁটিনাটি বিরোধ লেগেই থাকত। সময় সময় কর্ত্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে অনশন করতে হ'ত। শাস্তিও ভোগ করতে হ'ত। একবার এক জনকে ১০ ঘা বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়। অসুখ হলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। ৩।৪ জন পাগল হয়ে যায়। ভারতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে একমাত্র সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী' পড়তে পেতাম; তারও অনেকাংশ কাঁচি দিয়ে কেটে দিত। বন্দীদের কৌশল-বুদ্ধিতে মার্ক্‌সীয় সাহিত্য জেলের ভিতর যা এসে পড়েছিল তা কম নয়। আন্দামানের বন্দী-জীবনের কাহিনী বিচিত্র।

কেন কমিউনিজ্‌মের প্রতি অনুরক্ত হলাম—ইংরেজ গভর্নমেণ্টের অনুকম্পায় চারবার ধরা প'ড়ে অনেক বৎসর জেল খাটার পর চল্লিশ বৎসর বয়সে কমিউনিস্ট হওয়ার মতি হ'ল কেন ? পুরানো বন্ধুরা কেউ কেউ এরকম প্রশ্ন করেছিল। উত্তরে বলেছি, যে-কারণে আপনারা অতীত নীতি-পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে নূতন সমাজতন্ত্রের মতবাদ গ্রহণ করেছেন, সেই কারণেই আমি অতীত নীতি-পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে সমাজ-বিপ্লবের যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছি। আপনারা যেখানে এসে থেমেছেন সেখানে আমার নূতন চিন্তার উন্মেষ। প্রথম বয়সে দেশের দুঃখ ও দাসত্ব মোচনের জন্যে বোমা পিস্তল নিয়ে জীবনের পথে বের হয়েছিলাম ; সেদিন মৃত্যুগর্জ্জন শুনেছিলাম সঙ্গীতের মত। 'দেশের দুঃখ মোচন' কথাটার কোন সংজ্ঞা ছিল না, মৃত্যুবরণ করারও কোনো সংজ্ঞা ছিল না। একজন বীরপণার রোমান্স দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিল, আর একজন হয়তো গভীর প্রেরণা ও মানবতার অনুরাগে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। একজন ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসানই সকল দুঃখের অবসান ব'লে মনে করত, অন্যজন বুঝেছিল দেশের প্রতিটি নর-নারীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সাম্য ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার ভিতর দুঃখ মোচনের উপায়। সুস্পষ্ট কোন আদর্শ না থাকায় বিভিন্ন বিপ্লবী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আদর্শের কল্পিত ছাঁচ তৈরী ক'রে নিজেকে চালিত করত। সেই জন্যেই এক পথের পথিক হয়েও মাঝপথে এসে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি ; বিভিন্ন খাতে আমাদের বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। আমার পথ চলেছে সুদূরপ্রসারী গণমুক্তির সাধনায়—আপনাদের পথের দৃষ্টি ওখানে ঝাপ্‌সা হয়ে যায়।

মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় দীর্ঘকাল কারাজীবন যাপন করার সময় বহু চিন্তা ও আলোচনার ভিতর দিয়ে কমিউনিজ্‌মের প্রতি কেমন

ক'রে অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম তা এখন আর মনে পড়ে না; যা মনে পড়ে তাও বিশদ ভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজনীয়তা দেখি না। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল অবধি ছয় বৎসর দেশে ও বিদেশে ইতিহাসের কত রূপান্তর ও ভাবান্তর ঘটে গেছে তারই উপর ভিত্তি ক'রে আমার সামাজিক ও রাজনীতিক চিন্তাধারা কমিউনিজ্‌মের প্রতি একান্ত ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বিশেষ ক'রে বাঙলার অস্পষ্ট অবৈজ্ঞানিক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন—যা শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আকৃষ্ট করেছিল, বর্ত্তমানে যা অচল, সেই অকেজো অতীত আদর্শ ও কর্ম্মধারার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

বিদেশে রুশিয়ার গণ-বিপ্লব, স্বদেশে গান্ধীজীর পরিচালিত পর পর দুটি বিরাট জাতীয় আন্দোলন আমাদের ক্ষুধার্ত্ত শোষিত জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় চেতনা বিকাশের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। কল্পিত উজ্জ্বল আদর্শে বুকের রক্ত দিয়ে দেশজননীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করলেই দেশের দুর্গত জনগণের দুর্গতি আর ঘোচে না; চাই নূতন গণতান্ত্রিক আদর্শ, নূতন কর্ম্মপদ্ধতি, নূতন গণ-সংগঠন—বিপ্লবের বাস্তব লক্ষ্য ও গণসমষ্টির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সুপরিকল্পিত কর্ম্মসূচী। জেলে, কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পে এবং বাইরের বিপ্লবী কর্ম্মী-মহলে আসন্ন পরিবর্ত্তনের ধারা নিয়ে তুমুল আলোচনা, বাদানুবাদ চলতে থাকে; জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজ্‌ম—প্রধানত এই তিন রকম মতবাদই ছিল আলোচ্য বিষয়। এ নিয়ে বিভিন্ন গ্রুপ গ'ড়ে উঠে সর্ব্বত্র। একদল প্রগতিশীল যুবক কমিউনিজ্‌মের আদর্শ পথে বিপ্লবের সফল পরিণতি দেখে। দ্বিতীয় দল জনসাধারণের সুখ সুবিধার দিকে কিছুটা দৃষ্টি রেখে প্রথম বিপ্লব সমাধা ক'রে দ্বিতীয় বিপ্লবের জন্য প্রতীক্ষা করতে চায়। তৃতীয় দল জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐতিহ্য ব্যতিরেকে আর কোনো দিকে দৃষ্টি

দেওয়া সমীচীন মনে করে না। আন্দামানে বসে মার্ক্সীয় সাহিত্য পড়ায় মনোনিবেশ করি। পড়তে পড়তে পড়ায় অনুরাগ বেড়ে যায়। একা এক মনে পড়েছি—ডাক্তার নারায়ণ রায়ের ক্লাসে পড়েছি—অপরকে পড়িয়েছি। মার্ক্সীয় দর্শন, মার্ক্সীয় অর্থনীতি, বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদ আলোচনা ক'রে বুঝতে চেষ্টা করেছি;—নিভৃত কক্ষে রাত্রি জেগে চিন্তার দ্বারা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি। বদ্ধমূল কতকগুলি ধারণা এ-বয়সে ছেড়ে দিতে আমার মন প্রথমে কিছুতেই সায় দিতে চায়নি। পুরানো চিন্তা ও বুদ্ধির বিরুদ্ধে নূতন যুক্তি-বুদ্ধি অবিরত যুদ্ধ করেছে, হেরেছে, জিতেছে, আবার হেরেছে, জিতেছে। এমনি ক'রেই মনের ঘাত-প্রতিঘাত মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর আমার জ্ঞান-বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করেছে, শাণিত করেছে। বহু দিনের শান-বাঁধানো-পথ ছেড়ে সহজে নূতন পথে যাইনি। আর্থনীতিক বিপ্লবের পথ গ্রহণ করতে বেগ পেতে হয়নি। বিত্ত সম্পদ এক জনের না হয়ে দশ জনের হবে, কলকারখানার স্বত্ব পরশ্রমভোগী মালিকের না হয়ে উৎপাদনকারী শ্রমিকের হবে, জমির মালিক জমিদার না হয়ে কৃষক হবে—এক কথায়, ব্যক্তিগত মালিকানা-সম্পত্তির পরিবর্ত্তে সমাজের সমস্ত বিত্ত সমাজের গণ-সমষ্টির অধিকারে আসবে—এ তো একান্তই কাম্য। সমাজ-ব্যবস্থার এ-পরিবর্ত্তন একমাত্র শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারাই কার্য্যকরী হতে পারে।

যত কিছু না বুঝার গলদ তা রয়ে গেল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিতর। গতি ও দ্বন্দ্বের ছন্দে গড়া "দ্বন্দ্ববাদ" সাধারণ ভাবে বুঝা যায়। কিন্তু বস্তুবাদ মাথায় ঢোকে না ব'লে সব গুলিয়ে যেত। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ মাথায় চেপে বসে আছে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ধর্ম্মাদর্শে, গীতার আধ্যাত্ম্য সাধনায় যাদের

রাজনীতিক কর্ম্মজীবনের শৈশব দোলাখানি দুলেছিল, তারা অতি-প্রাকৃতের ধারণা (idea of a supernatural being) সহজে ভুলতে পারে না ;—আমি তাদেরই একজন। সমবয়সীদের দল ছেড়ে, শতাব্দীর প্রথম দশকের সহযাত্রীদের সঙ্গ ছেড়ে, মনের সঙ্গে বুদ্ধির, সংস্কারের সঙ্গে যুক্তির তীব্র লড়াই ক'রে তবে আমাকে নূতন পথের যাত্রী হওয়ার মনোবল অর্জ্জন করতে হয়েছিল। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিশ্বাসী না হ'লে অন্য যা কিছু করা যাক 'কমিউনিজম্'-এর আদর্শে গণবিপ্লব করা যায় না ; ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তির প্রাধান্য, সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার অস্বীকার করা যায় না : সমাজের চিরাচরিত কাঠামো ভেঙে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা আনয়ন করার সাহস হয় না ; সমাজ-জীবনের নীতি-আদর্শ, সত্যাসত্য, ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না। বস্তুবাদ বোঝার জন্য ডাক্তার নারায়ণ রায় ও ডাক্তার ভূপাল বসুর সঙ্গে কথা বলে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। ডাক্তার বসু বস্তুবাদে বিশ্বাসী নন—তা হলেও তাঁর কাছে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ ক'রে ডাক্তার রায়ের সঙ্গে আলোচনা দ্বারা নিজে একটা সিদ্ধান্তে পৌছেছি। ইলেকট্রন প্রোটন থেকে stellar system, solar system-এর ওপর দিয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে আমাদের পৃথিবী-গ্রহে নেমে এসেছি। পৃথিবীতে 'এমিবার' জন্ম থেকে Evolution theory ও Mutation theory অতিক্রম ক'রে ক্রমবিকাশের পথে বর্ত্তমান যুগে এসে পড়েছি। তারপর অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সমাজের বিকাশ ও পরিবর্ত্তনের কথা চিন্তা করেছি, আলোচনা করেছি। Tribal communism, Authoritarianism, Feudalism, Industrial capitalism—এই সমাজ-গতিধারার যৌক্তিক পরিণতি যে কমিউনিজ্‌ম্ তা বুঝতে কোথাও ঠেকেনি। ডাঃ ভূপাল বসু ও ডাঃ নারায়ণ রায়—এঁরা ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার ষড়যন্ত্র মামলায়

যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে প্রেরিত হন। উভয়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-বি, পাস—সুশিক্ষিত এবং সুমার্জ্জিত বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন। কিন্তু এঁরা আন্দামান বন্দীশালার রাজনীতিক চিন্তাজগতে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করেন। একজনের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও জেলখানায় অর্জ্জিত দার্শনিক চিন্তাধারা তাঁকে প্রগতিপন্থী মার্ক্স্‌বাদী ক'রে তোলে। দেশের কোটি কোটি দুঃস্থ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের ভিতর তিনি ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রসার দেখেন—জীবনের জয় ঘোষণা করেন। অপর জনের চিন্তা, বুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ উল্টা খাতে প্রবাহিত। মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের প্রগতি তিনি চান না। ভারতের অতীত গৌরব ও ভারতের বৈশিষ্ট্যের প্রতি তিনি একান্ত আস্থাবান। তরুণ সন্ত্রাসবাদী বন্দীদের মার্ক্সীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বাংলার সন্ত্রাসবাদী দলের যুবকদের শিক্ষা এতো অসম্পূর্ণ, ভাসা ভাসা এবং এতো অবৈজ্ঞানিক ও অপ্রগতিশীল ছিল যে, মার্ক্সীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা তাদের কাছে এক নূতন জ্ঞানালোক নিয়ে আসে। জেলের ভিতরে এই নূতন চিন্তার ব্যাপক ও গভীর উৎস তাদের কাছে বিপ্লবের সুদূরপ্রসারী রূপ ধরে দেয়। ফলে আন্দামান জেলের তরুণ বিপ্লবী বন্দীদের শতকরা ৯৫ জন কমিউনিস্ট হয়ে পড়েন। ভূপাল বাবুর মত ও পথ তারা গ্রহণ করেনি। স্বস্ব দলের প্রতি আনুগত্যের দোহাই দিয়ে—দলের পুরানো প্রবীণ নেতাদের দোহাই দিয়ে তিনি কিছুকাল যুবকদের আকৃষ্ট ক'রে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেষ অবধি বালির বাঁধের মত সব ধ্বসে যায়। দুই ডাক্তারের জীবনধারা এমন বিপরীত খাতে প্রবাহিত হ'ল কেন, মনোবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণে তার কারণ নির্ণয় অসম্ভব নয়।

ভারত মহাসাগরের বুকে আন্দামানের পাষাণ বালি চড়ায় শিক্ষা ও

সাধনার মাঝে কমিউনিজ্‌মের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস গ'ড়ে উঠল। তবু মনের পুরানো বন্ধন কাটতে চায় না। পুরানো দল ছেড়ে এবং দলের বন্ধুদের জন্মের মত ছেড়ে আসতে যেন বাধ-বাধ ঠেকে। দলের কর্ম্মপন্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েই জেলে এসেছি—আমাদের দলও আমাকে বিদ্রোহী ব'লে স্বীকার ক'রেছে। নেতৃত্বের লোভে দল ছেড়েছি—এরূপ প্রচার ক'রে কেউ কেউ আমার বিপ্লব-প্রচেষ্টার অমর্য্যাদা করেছে। সবই তো অতীতের কথা—এখন তো সেই পার্টি আবার আমাকে ফিরে পেতে চায়। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ত্রৈলোক্য "মহারাজ" স্নেহ-প্রীতির আকর্ষণে আবার আমাকে টানেন। আমার অন্তরে গভীর দ্বন্দ্ব চলেছিল। হীরামোহন ছোট্ট ছেলে। আমার প্রতি দলীয় আনুগত্য ছিল প্রচুর, আমার কাছে মার্ক্‌স্‌বাদী সাহিত্য পড়ে অতি সহজেই সে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার সঙ্কল্প নিয়েছিল। যখন আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সীমা পেরিয়ে যেতে পারিনি, হীরু তখন সকল দ্বিধা সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিজের পার্টি ব'লে গ্রহণ করে ফেলেছে। অতীত জীবনের সংস্কার আমাকে পিছন দিকে টানে—নব বিপ্লব-আদর্শের প্রেরণা আমাকে সামনের দিকে ডাকে। শেষ অবধি কমিউনিস্ট পার্টির জয় হ'ল। গণ-বিপ্লবের মহান আদর্শের অনুপ্রেরণায় ভারতের লাঞ্ছিত গণ-মানবের মুক্তি-সাধনায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকেই আমি বেছে নিলাম। একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লব-প্রচেষ্টাই ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে—এই বিশ্বাস দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হওয়ার পর আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম।

ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের পথে পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল; ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের সুখ শান্তি আসেনি; বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি পরিচালন-ব্যবস্থার অপপ্রয়োগে শোষিত জনমানব

নিঃস্ব ; মুষ্টিমেয় ধনিকের রাক্ষসী ক্ষুধায় মানব-সভ্যতা ক্লিষ্ট, ভেদবিভেদে ধ্বংসোম্মুখ। ভারতবর্ষ স্বভাবতই ব্যর্থ ধনতন্ত্র দিয়ে নূতন ভারতে অকল্যাণ ডেকে আনতে ইচ্ছুক হবে না। তা ব'লে অতীতের হস্ত-শিল্প ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে সুখী ও স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাও বৃথা। পঞ্চায়েতী শিল্পোৎপাদন এবং পঞ্চায়েতী শাসন উভয়ের সমন্বয়ে যে-সমাজ গ'ড়ে উঠবে স্বাধীন ভারতে সেই সমাজতান্ত্রিক কাঠামোই হবে আমাদের জীবনের জয়যাত্রা পথের ভিত্তি। বাস্তব সত্যকে খুঁজে বার করার চেষ্টা না ক'রে আমরা কল্পনা দিয়ে আমাদের সুখের স্বপ্নরাজ্য গ'ড়ে তুলেছিলাম। এখন কমিউনিজম্-এর সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি-সঙ্গত আদর্শে সমাজ গড়ার বুদ্ধি ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা বিপ্লবী পথে জোর কদমে চ'লে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল ও সার্থক ক'রে তুলতে পারব।

আমরা বিভিন্ন প্রদেশের লোক আন্দামান সেলুলার জেলে জমায়েত হই। একমাস দু-মাস পর পর নূতন বন্দীদল এসে আমাদের নূতন খবর দিত। সাগরের মাঝেও আমরা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কতকটা ওয়াকিফহাল ছিলাম। দেশে নাকি তখন নূতন নূতন সমাজতান্ত্রিক দল গজিয়ে উঠেছিল। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত কর্ম্মীরা ধরা পড়ার পূর্ব্বে কর্ম্ম-পন্থা নিয়ে, সন্ত্রাসবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে বাদানুবাদ করে। কলকাতায় জওহরলালের 'সোশালিজম্' সম্বন্ধে বক্তৃতা প'ড়ে আমরা উল্লসিত হই। কেবল বন্দীশালায় নয়, সমগ্র দেশেই নবচেতনার উন্মেষ হয়েছে ভেবে আমাদের উল্লাস। গান্ধীবাদ, সন্ত্রাসবাদ আর টিকছে না। বর্ত্তমান সময় যুগ-পরিবর্ত্তনের সময়, এমন ধারণা জন্মে।

তিন নম্বর ওয়ার্ডের তিন তলার বারান্দায় ব'সে দুটি বন্ধুর কথা হচ্ছিল। একজন বলে :

ওরা সব ফাশিস্ট ; বাইরে গিয়ে এরাই গড়বে ফাশিস্ট দল।

—কেন, ওরা তো বলে আমরা সোশালিজ্‌ম্‌ চাই।

—তা বলুক, এ একটা ভ্রান্ত ধারণা; আসলে ফাশিজম্‌ ও কমিউনিজমের মাঝে আর কিছুই নেই।' হয় মুষ্টিমেয় ধনীর ধনতন্ত্র, নয়, গরীব জনসাধারণের গণতন্ত্র।

অদূরে ব'সে আমি দূর সাগরের পানে চেয়ে দুই বন্ধুর কথা শুনছিলাম। তখন বেলা শেষ—সন্ধ্যা ঘনায়মান। আমি ওদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বলি: 'কেন, কমিউনিজ্‌ম্‌ না হ'লেই কি ফাশিজ্‌ম্‌ হবে?'

'হ্যাঁ দাদা, তাই। ধনতন্ত্র-মিশ্রিত যে গণতন্ত্র—বুর্জোয়া গণতন্ত্র, বিজ্ঞানের উন্নতিতে উৎপাদন-প্রণালী ও যানবাহনের অভিনব বিকাশে তথাকথিত সে-গণতন্ত্র আর বাঁচে না; গণকে বঞ্চিত ক'রে ধন আজ ফেঁপে উঠছে সঞ্চিত সম্পদের উত্তাপে। ধনিককে উপেক্ষা ক'রে দরিদ্র বেকার জনগণ মেতে উঠেছে ঐক্য ও চেতনার উদ্দীপনায়'।

কে কাকে থামায়? স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে ধনশক্তির ফাশিজ্‌ম্‌কে আশ্রয় করা ছাড়া উপায় নেই।

আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে গণশক্তিকেও কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনে সংহত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ফাশিজ্‌ম্‌ ও কমিউনিজ্‌ম্‌—এ দু'য়ের মধ্যবর্ত্তী যে-অবস্থা তা সমস্যা সমাধানের অবস্থা নয়—"টাগ অব ওয়ার" বা টানাটানির অবস্থা। ধনী মালিক তার সঞ্চিত ধনসম্পদ কায়েম করার চেষ্টায় একদিকে টানে—বঞ্চিত শোষিত শ্রমজীবী জনসমষ্টি তাদের নিজেদের হাতে তৈরী ধনসম্পদ সমষ্টিগত ভাবে ব্যবহারের চেষ্টায় আর একদিকে টানে। সমাজের ধনসম্পদ মাঝ পথে রাখা যায় কোন বিধানে? ভোগীর দল আর বঞ্চিতের দল যে-রশি ধ'রে টানে তা যদি ক্ষণেকের তরেও স্থির থাকে, সে হবে যুদ্ধের

মাঝে ক্ষণস্থায়ী সন্ধির মত। মনের কোনো পরিবর্ত্তনেই শোষক আর শোষিতে পাকা সন্ধি হবে না। ধনতন্ত্র ফাশিজ্‌মের স্বেচ্ছাচারিতাকে আশ্রয় ক'রে দাঁড়াতে চায়। গণতন্ত্র সাম্যবাদের (কমিউনিজ্‌ম্) আশ্রয়ে মুক্তি পেতে চায়। মধ্য পন্থা নাই।

কথাবার্ত্তার সময় সিপাই চাবী হাতে উপস্থিত অর্থাৎ এখন আমাদের আপন আপন খোপে ঢুকতে হবে।

তালাবন্ধ নির্জ্জন কক্ষে বসে দেশের স্বাধীনতার কথা, লোকের দুঃখ দুর্গতি মোচনের কথাই ভাবছিলাম। কিশোর বয়সে মনে জিজ্ঞাসার উদয় হ'ত—'এ-জীবন নিয়ে কী করব'। দীর্ঘকাল পরে আজ আবার সেই একই প্রশ্ন—'এ-জীবন নিয়ে কী করব।' মানবের দুঃখ-অশান্তি-কুসংস্কার দূর করবার জন্য যুগে যুগে কত ভাবে কত পথে মানুষ তপস্যা ক'রে গেছে। মহা-মানবের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ ক'রে আমরাও জন-কল্যাণের সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেছি। ভারতবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য, ভারতের পরাধীনতা কিশোর বয়সেই আমাকে সংগ্রামের পথে টেনে নেয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম্মপথ ছেড়ে বিপ্লব-সংগ্রামের পথে আসার পূর্ব্বেও ভেবেছিলাম—'এ জীবন নিয়ে কী করব ?' কোন মতে, কোন পথে জীবন-সাধনা সার্থক হয়ে উঠবে। পরবর্ত্তী কালে জীবন-সংগ্রামের পথে বার বার এই কথাটাই নিভৃত মনের কোণে আঘাত করেছে—আসবে কি সর্ব্বমানবের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ আমাদের অর্জ্জিত স্বাধীন ভারতে ? কোনো সদুত্তর পাইনি। কমিউনিজ্‌ম্ যেন জীবন-সমস্যার একটি বাস্তব সমাধান দিয়েছে। ক্রমশ যেন নতুন মতবাদের নতুন আলোকে গণ-মানবের কল্যাণের প্রশস্ত রাস্তাটি চোখে ভেসে ওঠে। মানবমঙ্গলের এই পরশপাথরই কি সন্ধান করছিলাম এতদিন ? যেখানে বিশেষ প্রভু কেউ থাকবে না, গোলাম কেউ থাকবে না, শোষক ও শোষিত থাকবে না, যেখানে 'সকলে আমরা সকলের

তরে, প্রত্যেক আমরা পরের তরে।' তবু অন্তরের প
প্রশ্ন থেকেই যায়—'কেন এ-জীবন', 'কেন এ-সংসার', 'ে
চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি—সে ১৯৩৩ সালের ক
১৯৩৬ সালের জুন মাসে অন্তরের কথা বন্ধুদের প্রকাশ
কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করব। মুক্তির
ডিসেম্বর মাসে তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত ভারতে
বঙ্গীয় শাখার সভ্য হওয়ার গৌরব ও সম্মান লাভ ক
আবার জেল। এবার কমিউনিস্ট বন্দী। জেল ও অ
বৎসর কাটিয়ে এসে আবার কাজ আরম্ভ করি। ি
বেরিয়ে সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর পথ চলেছি—আজো প
গণ-মানবের মুক্তির সম্ভাবনায় রাতের আঁধার কেটে য
সমাগত। বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির জয় হোক।

প্রায় ৪০ বৎসর জীবনের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসে
ঘটে গেছে, কিন্তু মূল লক্ষ্য পথের সাধনায় আমরা আজ
তারই জন্য নানাবিধ পরিবর্ত্তনের পরও আসল অবস্থ
দেখি না; একটি অপরিবর্ত্তিত পুরানো একঘেয়ে দুর্গ
সমাজদেহ আচ্ছন্ন ক'রে আছে। ১৯০৬-০৬ সালে ে
আজ ১৯৪৭ সালেও সেই পরাধীনতা; তখন যে ......
সংগ্রাম ছিল, আজও সেই একই সংগ্রাম। স্বাধীনতা তখনও কাম্য ছিল, আজ চল্লিশ বৎসর পরও সে-স্বাধীনতা কাম্য বস্তুই রয়ে গেছে। কোন অতীতে (১৯০৫) রব উঠেছিল স্বাধীনতা আসছে, তারপর কতবার স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবিত আশায় দেশবাসী আশান্বিত হয়ে উঠেছে, উদ্দীপনা পেয়েছে। কেবল শুনি—'সে যে আসে, আসে, আসে'; কিন্তু স্বাধীনতা আসেনি আজো।

আন্দোলনের তীব্রতা ও প্রসারতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশ আমরা উপলব্ধি করেছি, টেররিস্ট অন্দোলনের কর্ম্মসূচীকেও অবস্থার সঙ্গে পরিবর্ত্তন ক'রে নেওয়ার কল্পনা করেছি। সর্ব্বশেষে টেররিজ্‌মের নীতিকেই বরবাদ ক'রে বৃহত্তর ও উচ্চতর গণ-সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করেছি।

বাংলার সংগ্রামের ইতিহাসের বিকাশ-পথে স্বাধীনতার ধারণার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, স্বাধীনতার সংগ্রামের ধারার পরিবর্ত্তন হয়েছে, সেই সংগ্রামের সংগঠনের পরিবর্ত্তন হয়েছে।

শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথমটায় যা ছিল দৈহিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, তাই বর্ত্তমানে উজ্জ্বল আদর্শে বৈজ্ঞানিক নীতি-পদ্ধতির সচেতন কর্ম্মপথে রূপান্তরিত হয়ে মুক্তি-সংগ্রামে জয় সুনিশ্চিত ক'রে তুলেছে।

সশস্ত্র-বিদ্রোহপ্রয়াসী যুবকদল বুকের রক্তে জাতীয় স্বাধীনতার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে—মৃত্যুভীত জাতিকে জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার পথ দেখিয়েছে। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল অবধি বাংলা ও ভারতের ইতিহাস টেরোরিজমের রক্তরঞ্জিত ইতিহাস বই আর কি? দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কতবার আমাদের পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে—বাস্তব সত্যের গতিপথে সে-বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, কোনো বাধা টেকেনি। প্রথম যুগে কথা উঠেছিল গুপ্ত-সমিতি ও সশস্ত্র সংগ্রামের পথ আমাদের পথ নয়। ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ, এখানে ধর্ম্মপথেই স্বরাজ আসবে। রামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য বহু সাধু-সংগঠন ও ধর্ম্মাশ্রম তখন বাংলায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। ত্যাগী ও চরিত্রবান যুবকেরা তখন এ-সকল আশ্রম ও ধর্ম্মসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করতেন। কত নেতৃস্থানীয় যুবক সশস্ত্র বিপ্লবী দল ছেড়ে সাধুসঙ্ঘে যোগ দিয়ে জনসেবায় আত্মনিয়োগ

করেছেন। অরবিন্দ ঘোষও গ্রেফ্‌তারি পরোয়ানা এড়িয়ে পণ্ডিচেরীতে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন ক'রে যোগ-সাধনায় মগ্ন হন।

প্রবলপ্রতাপ বৃটিশ সিংহের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে বিড়ম্বনাও দেশবাসীর নিকট বিপ্লবীদের কম ভোগ করতে হয়নি। প্রথম দশ বৎসর উক্ত রূপ আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে এবং ফাঁসী ও কারাদণ্ড বরণ ক'রে প্রথম বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় বার ১৯২১-২২ সালে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা আন্দোলনের বন্যায় গান্ধীজির কথিত 'হিংসা' বা 'ভায়োলেন্সে'র ধারণা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সশস্ত্র বিদ্রোহপন্থীদের সেদিন লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। যুদ্ধোত্তর যুগের নূতন সম্ভাবনায় সমগ্র জাতি তখন বিশ্বাসবান হয়ে ওঠে—সশস্ত্র রুশ বিপ্লবের সত্যফল এদেশে বুদ্ধ-নানক-নিমাইয়ের অতীত আদর্শে রূপায়িত হ'য়ে উঠল গান্ধীজির প্রভাবে। ১৯৩০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় অহিংসার প্রভাব অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়। তখন প্রশ্ন ওঠে কোন পথে ভারতের মুক্তি আসবে—চট্টগ্রামের পথে, না, ধরসনার পথে। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে সাফল্যের পথ কী? চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার আক্রমণ করে, ধরসনার অহিংস সত্যাগ্রহীরা লবণ-গোলা আক্রমণ করে।

১৯৩০-৪০—এই দশ বৎসরে আমাদের চিন্তাধারায় বিপুল পরিবর্ত্তন আসে। বিদেশী ইংরেজ রাজত্বের অবসানে ভারত স্বাধীন হ'তে পারলেই সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে না, বিদেশী ধনিক শাসনের পরিবর্ত্তে স্বদেশী ধনিক শাসন প্রবর্ত্তিত হ'বে মাত্র। সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত ধনিক-বণিকের শাসন ও শোষণের অবসান হবে না, রাজা-জমিদারের মধ্যযুগীয় বর্ব্বর নীতির শেষ হবে না।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লবী দলের যুবক এবার নূতন অবস্থার সম্মুখীন। বিদেশে রুশিয়ার গণ-বিপ্লবের প্রভাব, স্বদেশে বিক্ষুব্ধ গণশক্তির নব চেতনার উন্মেষ তাদের আকুল ক'রে তোলে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের বাঁধা পথে আর এগোনো চলবে না, জনসাধারণকে সঙ্গে নিতে হবে, জনসাধারণের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে। যাদের গভীর বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণা আছে, নিপীড়িত গণ-মানবেব মুক্তিতেই যারা সামাজিক কল্যাণ ও সুখ-শান্তির নিশ্চিত সম্ভাবনা বুঝেছে, তারা, একমাত্র তারাই, কমিউনিস্ট মত ও নীতিকে গ্রহণ ক'রে নিল—কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নিজেদের সংযোগ স্থাপন ক'রে নিল। আর যাদের চিন্তা-বুদ্ধির দৌড় বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারল না, তারা সোশালিজ্‌ম্-এর মধ্যপথে আপোস ও কল্পিত সামঞ্জস্যের মাঝে সান্ত্বনা খুঁজে নিল। অতীত যুগের মত এ যুগেও আমাদের সম্মুখে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবতারণা করা হয়— 'কমিউনিজ্‌ম্'এর পথ ভারতের পথ নয়। রামমোহনের যুগ থেকে আজ অবধি বাধার পর বাধা এসে নতুন পথের গতি রোধ করার চেষ্টা করেছে—প্রতিবারই বাধার বাঁধ ভেঙ্গে প্রগতির দুর্নিবার গতি এগিয়ে চলেছে জনজীবন বিকাশের পথে, জীবন-সমস্যার সমাধানের পথে।

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনে বাধা, সমাজসংস্কারে বাধা, রাজনীতিক কর্ম্মপথে বাধা। গতানুগতিক পথে চলায় কোন বাধা পড়েনি। ভারতের প্রথম ও প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'কংগ্রেস'কেও একদিন বিদেশের অনুকরণ ব'লে বিদ্রূপ করা হ'ত।

ভারতের নিজস্ব বিশিষ্ট পথে চলার নীতি উপেক্ষা ক'রে আমরা সর্ব্বান্তঃ করণে কমিউনিস্ট মত ও পথ গ্রহণ করলাম। কমিউনিজ্‌ম্ আমাদের কাছে এল একটি বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থা রূপে যা বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে। ইতিহাসের পথে বর্ত্তমান

সমাজ যেখানে যে-সমস্যায় এসে পৌঁছেছে, কমিউনিজ্‌ম্‌ই তার একমাত্র সমাধান। তাই আমরা কমিউনিস্ট—আমাদের বিপ্লবের রূপ শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লব।

আমরা বুঝেছিলাম ঃ 'কমিউনিজ্‌ম্‌' একটা বাধা-ধরা বিধান নয়, 'অন্ধ শাস্ত্রবাক্য নয়', অথবা যার বিধানগুলি নির্ব্বিচারে বিদেশ থেকে আমদানি ক'রে ভারতের জনসমাজে প্রবর্ত্তিত করতে হ'বে। কমিউনিজ্‌ম্‌কে দেখেছিলাম বিজ্ঞানরূপে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন হয়—দেশ-কাল-পাত্র ভেদে তার রূপান্তর ও ক্রমবিকাশ ঘটে। মানবকল্যাণের মূল নীতি ও লক্ষ্য অবলম্বন ক'রে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে উন্নতির পথে, সাম্য ও স্বাধীনতার পথে চলতে হয় কমিউনিস্টদের। ডাঃ রাধা-কৃষ্ণাণের ভারতীয় দর্শন ও গান্ধীজীর মতবাদ সম্বলিত গ্রন্থাদি প'ড়ে আমরা কমিউনিজ্‌মের সমাজ-আদর্শের সঙ্গে তুলনা ক'রে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

মার্কস্‌-এঙ্গেল্‌স্‌ এক বৈজ্ঞানিক আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা মানবজাতির কাছে তুলে ধরেছিলেন, তাঁদেরই প্রবর্ত্তিত পথে চলেছিলেন লেনিন। তারপরও ১৯ বৎসর অতীত হয়ে গেছে। স্টালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কত উন্নতি ঘটেছে, সোভিয়েটের আদর্শে পৃথিবীর গণ-আন্দোলনের শক্তি কত সুদৃঢ় হয়েছে, গণতান্ত্রিক চেতনার কত সম্প্রসারণ হয়েছে। আগামী ভারতীয় বিপ্লব আরো কত সুন্দর কত মহান উচ্চতর জীবন-ধারা নিয়ে আসবে, তা ভেবে আমার কারাকক্ষে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছি। ১৯১৭ সালের গণ-বিপ্লব মানব-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চির-স্মরণীয় স্থান পেয়েছে। ধনতান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়নের গভীর আঁধারে প্রজ্জ্বলিত মশালের মত এ-বিপ্লব মানবজাতিকে মুক্তি-পথের সন্ধান

দিয়েছে। আমাদের সম্মুখে আজ উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের কল্পনা—মানব-জাতি আর দুঃখের মাঝে ডুবে থাকবে না, দিন আগত ঐ।

সাগরবুকে আন্দামান দ্বীপ। দ্বীপচরের মাঝে এক পাহাড়ের উপর সেলুলার কারাগার। জেলের পাশেই পাহাড়ের গায়ে ফেনায়িত ঢেউগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে। কি তার তর্জ্জন গর্জ্জন! কবুতরের খোপের মত সার-বাঁধা ক্ষুদ্র কক্ষের একটিতে বসে আমি চেয়ে থাকতাম দূর সাগরের পানে। দিনের পর দিন ভগবানকে খুঁজতাম আঁতি পাঁতি ক'রে। দক্ষিণ সাগরের অসীমের পানে চেয়ে বিশ্বাতীত মূল বস্তুর সন্ধান করতাম। চোখের দৃষ্টি থেমে গেছে সাগরের নীল জলে—যেখানে ঢলে-পড়া আকাশ মিশে আছে সাগরের গায়ে; মনের দৃষ্টি ভেসে গেছে দক্ষিণ সাগরের অসীমে। খুঁজেছি, কেবল খুঁজেছি—বস্তু-বাদ ও অধ্যাত্মবাদের মাঝে প্রকৃত সত্য কোথায় নিহিত আছে। জীবন-মৃত্যুর বাইরে কোথাও কিছু পাইনি।

কিশোর বয়সে ভাবের আবেগে অন্তরে জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছিল—'এ জীবন নিয়ে কী করব?' সেই জিজ্ঞাসার একটা উত্তর পেলাম এই সাগর-দ্বীপে—"সংসার-জীবনযাত্রার পথে ভগবানের কোনো স্থান নেই।" বিজ্ঞান ছেড়ে বৃথাই আমরা অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেছিলাম। সুসংগঠিত, সমষ্টিগত প্রীতিময় সাম্যময় সমাজজীবন সাধনাই মানবের মুক্তি-সাধনা। কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থায় তার যথার্থ পরিণতি। এই নব বিপ্লবই সত্যিকার বিপ্লব।

সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামে যেমন মৃত্যুর গর্জ্জন শুনেছিলাম সঙ্গীতের মত, 'কমিউনিজম্'-এর পথেও মৃত্যুকে তেমনি ক'রেই বরণ ক'রে নিতে হবে—নইলে মুক্তি সুদূর-পরাহত।

মরণের রক্তরঞ্জিত পথেই বিপ্লবের রক্তপতাকা উড্ডীন হয়।

ইতিহাসের গতিপথে কমিউনিজ্‌ম্‌ এক নূতন অবদান। ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর সুখ-শান্তির জন্য এই নববিধান আবশ্যক। নিজের শ্রেণী-স্বার্থ ত্যাগ ক'রে, মধ্যশ্রেণীসুলভ মানসিকতা বিসর্জ্জন দিয়ে, মজুর কৃষকের স্বার্থে, দরিদ্র বঞ্চিত জনগণের স্বার্থে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে আমাদের অতীত বিপ্লবী ঐতিহ্য।

প্রথমে বাড়িঘর ছেড়ে, তারপর 'অনুশীলন-সমিতি' ছেড়ে, বর্ত্তমানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছি। অসংখ্য ভুল-ত্রুটি-বিচ্যুতির মাঝে আমার জীবনের চলার পথ রচিত হয়েছে। কমিউনিজ্‌ম্‌ গ্রহণ করা উচিত ছিল আরো অনেক পূর্ব্বে—দেরীতে গ্রহণ ক'রেও গ্রহণ করতে পারার আনন্দ আমার আছে। দেশের, জাতির ও জনগণের ভবিষ্যৎ গঠিত হবে যে-নীতি ও কর্ম্মধারায়, আমি তারই বেদীমূলে আশ্রয় নিয়েছি। দীর্ঘ একুশ বৎসর জেল খাটার পর এই সত্য পথই হ'ল আমার পথ।

টেরোরিজ্‌ম্ থেকে কমিউনিজ্‌ম্

বাংলা, বিহার ও আন্দামান জেলে এবং অখ্যাত পল্লীতে অন্তরীণ থেকে প্রায় দশ বছর পর ১৯৩৮ সালের শেষ ভাগে মুক্তি লাভ করি। দশ বছরে দেশের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। নিজ বাড়ীর অসচ্ছল অবস্থাও বেড়ে গিয়েছে; ধনী দরিদ্রের পার্থক্যটা আরো প্রকট হয়ে উঠেছে দেশের সর্ব্বত্র। স্পেনে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ব্যর্থতা, জার্মানিতে ধনতান্ত্রিক ফাশিস্ট দানবের অভ্যুত্থান সমগ্র পৃথিবীটাকেই যেন ধনী ও দরিদ্রের দুটো সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীতে ভাগ ক'রে দিয়েছে। গণ-বিপ্লবের নূতন পথে চলার যৌক্তিকতা ও প্রেরণা মনকে ক'রে তুলছে ইস্পাতের মত শক্ত। বাড়ীর দারিদ্র্যের চিন্তাও সমস্যা সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করেছিল গণ-বিপ্লব।

কাজেই বাইরে এসে পরিচিত কংগ্রেসকর্ম্মীদের সঙ্গে দেখা না ক'রে, নিজের পুরানো বিপ্লবী দলের প্রিয় বন্ধুদের নিকট না গিয়ে, সোজা বাংলা দেশের কমিউনিস্ট পার্টির স্বনামধন্য নেতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কাছে উপস্থিত হ'লাম। আমার মত ও পথ পরিবর্ত্তনের কথা স্পষ্ট ভাবে তাঁকে জানালাম। তিনি আমাকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অল্প কথায় কমিউনিস্ট পার্টির কাজে যোগদানের অনুমতি দিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন বে-আইনী গুপ্ত সমিতি। পূর্ব্বেও

গুপ্ত সমিতিতে ছিলাম ; মুক্ত সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুক্তি-আন্দোলন করার সুযোগ সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত দেশে হয় না। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামের পথ ছেড়ে গণ-বিপ্লবের পথে পা বাড়ালাম। আমার মত আরো শত শত বাঙালী বিপ্লবী যুবক এ-সময় জেল থেকে বেরিয়ে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লব পরিহার ক'রে গণবিপ্লবের পথে আসেন। জেল জীবনের চিন্তা, আলোচনা ও শিক্ষা আমাদের নতুন বিপ্লবের সন্ধান দেয়। কমিউনিস্ট নেতারা আমাদের সাদরে গ্রহণ করেন। তখন কমিউনিস্ট পার্টির কর্ম্মীদের অবস্থা খুবই খারাপ। থাকা-খাওয়ার সংস্থান তেমন কিছুই ছিল না—রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল না। অভাব ছিল, অখ্যাতি ছিল—সব চেয়ে কঠিন ছিল মজুর-শ্রেণীর চেতনা জাগানো ও সংগঠন গড়া। পুলিসের উৎপাত, মালিকের নির্য্যাতন ও মজুর শ্রেণীর ঔদাসীন্যের মাঝে যখন পার্টির মুষ্টিমেয় কর্ম্মীরা কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন, তখন আমরা পার্টিতে যোগ দিই। লাভের আশা কিছুই ছিল না, লাঞ্ছনার আশঙ্কা ছিল প্রচুর। টেরোরিস্ট বিপ্লবী কর্ম্মী, কংগ্রেস কর্ম্মী এবং ঐ সকল মুক্ত বন্দী সমাজে যে সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ করতেন কমিউনিস্ট কর্ম্মীদের বা মুক্ত বন্দীদের কারো তেমন মর্য্যাদা লাভের সৌভাগ্য হয়নি। রাজনীতিক চেতনা সম্পন্ন মধ্যবিত্ত সমাজে কমিউনিস্টদের সমাদর ছিল না। শুধু কমিউনিজ্‌ম্-এর নীতি ও পথে, গণ-বিপ্লবের যৌক্তিকতায় এবং বিজ্ঞানসম্মত পরিণতি সম্বন্ধে একান্ত আস্থাবান ছিলাম ব'লেই আমরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছি। সংগঠিত মজুর শ্রেণীর পরিচালিত সংগ্রাম ব্যতিরেকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার কোন উপায় আমরা খুঁজে পাইনি। তাই আমরা অনেকে জেলে থাকতেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ায় সঙ্কল্প করি।

কলকাতায় এসে দেখি দলে দলে টেরোরিস্ট আন্দোলনের বন্দীরা মুক্তি পেয়ে পার্টিতে যোগদান করছেন—বাইরেরও ভাল ভাল কর্ম্মীরা পার্টিতে আসছেন। ১৯২৯ সালের উদ্দাম সন্ত্রাসবাদী উদ্দীপনার মত দশ বৎসর পর আবার আরো ব্যাপক কমিউনিজ্‌মের উদ্দীপনা সারা বাংলার কর্ম্মীদলের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে। এমন সময় পার্টির ভিতর একটি স্বতন্ত্র গ্রুপ থাকার কথা জানতে পারলাম। পরে পার্টির রাজনীতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টে এ-সময়ের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল, চক্রস্তর ছাড়িয়ে পার্টি-স্তরে আমরা উঠছি, কিন্তু চক্রগত অভ্যাস ও দুর্ব্বলতা তখনও রয়ে গেছে। মুক্তির পর কলকাতায় গিয়ে আমি তা স্পষ্ট অনুভব করি। কমিউনিস্ট পার্টির বাইরে লেবর পার্টি, বেঙ্গল, নামে একটা আলাদা দল গঠিত হয়েছিল। এই দলের নেতা ছিলেন নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার। ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে দত্ত-মজুমদার তাঁর সমস্ত দল সহ, অবশ্য সন্দিগ্ধ লোকদের বাদ দিয়ে, কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও তিনি একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী ধারার সঙ্গে তিনি কিছুতেই খাপ খাইয়ে চলতে পারছিলেন না। লেবর পার্টি ছিল "অর্থনীতিবাদ"-এর পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেও দত্ত-মজুমদার 'অর্থনীতিবাদ'কে ছাড়িয়ে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর রাজনীতিক চাল-চলন কমিউনিস্ট পার্টির শৃঙ্খলায় বাধছিল। তাই নিয়ে বেধে ওঠে গোলমাল ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। দত্ত-মজুমদার মনে করেছিলেন পার্টি থেকে তিনি বহিষ্কৃত তো হ'বেনই, যদি একটা বড় রকমের ভাঙন ধরিয়ে বহিষ্কৃত হতে পারেন সেটাই হবে তাঁর পক্ষে ভালো। শেষ পর্য্যন্ত ১৯৩৯ সালে তার কয়েকজন সঙ্গী সহ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে তিনি বহিষ্কৃত হয়েও যান। তাঁর অধিকাংশ সঙ্গীই অবশ্য পরে তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং ভুল স্বীকার ক'রে তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে এসেছেন।

কলকাতায় যখন আমি ফিরে আসি তখন এ-সব কিছু আমার জানা ছিল না। দত্ত-মজুমদারের উপদল নানান যুক্তি-তর্কের অবতারণা ক'রে আমায়, শুধু আমায়ই বা কেন, অন্য অনেককেও বোঝাতে লাগলেন যে তাঁরাই আসল কমিউনিস্ট, অন্যেরা সব ভুয়ো। আদর-যত্নও আমায় খুবই তাঁরা করলেন। নতুন দলে নতুন এসে এই অবস্থায় প'ড়ে অস্বস্তি বোধ যে করিনি তা নয়। মনে মনে ভাবি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ যেদিকে আছেন সেদিকই ঠিক। আব্‌দুল হালিমকে দশ বৎসর পূর্ব্বে থেকেই জানি, হালিমও নেতা মুজফ্‌ফরের সঙ্গে আছেন, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার কর্ম্মীরাও এদিকে। সত্যিকার কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার সংগ্রামের পথে এঁরাই দাঁড়িয়ে আছেন এবং দাঁড়িয়ে থাকবেন—তাঁদের সম্বন্ধে এমন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। মনে পড়ে, নতুন দলে নতুন ভর্তি হতে এসে এ-পরিণত বয়সেও যুক্তির চেয়ে ভক্তিটাকেই বড় ক'রে নিয়েছিলাম। ভক্তির পরি-প্রেক্ষিতে যুক্তিকে বিচার করেছি, পরে বুঝা গেল ভুল করিনি।

১৯৩৯ সালে পার্টি থেকে ঢাকায় প্রেরিত হই। ঢাকায় তখন সন্ত্রাস-বাদের বদলে সমাজতন্ত্রবাদের কথা চলছে; কমিউনিস্ট পার্টি মজুর-কৃষক সংগঠন সবে মাত্র শুরু করেছে। অপর সকল দল বা গ্রুপ কমিউনিস্ট পার্টির নিন্দায় মুখর। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর প্রচার-বিভাগের কপ্‌চানো বুলি তাদের মুখে মুখে: "কমিউনিস্টরা পরিবার মানে না, ধর্ম্ম মানে না, নীতি মানে না, নৈতিক চরিত্রের কোন মর্য্যাদা দেয় না।"

ছাত্র ও যুব সংগঠনে, কংগ্রেস কমিটি গঠনে, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে প্রতিপক্ষ এই সকল কুৎসার অস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করত। তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে আমরাই ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকি। আমি তখন কমিউনিস্ট পার্টির ঢাকা জিলা কমিটির সভ্য হিসাবে কাজ করি। তরুণ বিপ্লবী রণেশ দাশগুপ্তের সহায়তায় 'ঢাকা জেলা প্রগতি

লেখক সঙ্ঘ' গঠন করি। বিপ্লবী শহীদ সোমেন চন্দও আমাদের সঙ্গে প্রগতি সাহিত্যের প্রসার ব্রতে যোগ দেয়। সাহিত্যে তার অনুরাগ ছিল। ফাসিস্টবিরোধী সম্মেলনে লাল পতাকা হাতে শ্রমিকদের শোভাযাত্রা পরিচালন ক'রে যাওয়ার সময় বিরুদ্ধবাদী দলের প্রতিক্রিয়াশীল গুণ্ডাদের নৃশংস আক্রমণে সোমেনের জীবনান্ত ঘটে। প্রিয় সাথী বীর বিপ্লবী সোমেনের মৃত্যু-সংবাদে আমি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা অনুভব করি। কলকাতা 'সোভিয়েট সুহৃদ সঙ্ঘে'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তার মৃত্যুবার্ষিকী সভায় আমি যে-বক্তৃতা দিই এবং পরে যা "পরিচয়" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরিশিষ্টে তা লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে ঢাকা জেলা কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলন হয়। যুদ্ধ সময়ের 'অর্ডিনান্স' অমান্য ক'রে সভাপতিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে উক্ত সম্মেলন পরিচালন করার অপরাধে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করি। এই মামলায় গোপাল বসাক, নেপাল নাগ, ব্রজেন্দ্র দাস, জ্ঞান চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ১৬।১৭ জনের কারাদণ্ড হয়। এইবার নিয়ে আমার পাঁচ বার জেল-বাস হ'ল। সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব থাকা অবধি আমাদের জেল-বাসের যোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোন কারণ দেখি না। ছয় মাস জেল খেটে বাইরে পা-বাড়াতেই পেলাম পুলিস প্রহরীর সাদর অভ্যর্থনা। তাদেরই হেফাজতে সোজা বাড়ী গিয়ে বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে আটক থাকার নির্দ্দেশ পেলাম। পূর্ব্বেও একবার বাড়ীতে আটক ছিলাম।

১৯১১ সালে প্রথম জেলে যাই— '৪১ সালেও সেই জেল, অন্তরীণ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামে বাংলায় ১৯০৫ সাল থেকে কারাদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি উৎপীড়নের অধ্যায় উত্তরোত্তর বেড়ে চলছে!

বাড়ীতে আটক থাকাকালেই আমার এক বোনের বিয়ে হয়েছিল। বর

কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী জেল-ফেরতা স্বদেশী কর্ম্মী। তখন কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছে। বিয়ের রাত্রিতে বাড়ীর চারপাশে পুলিস গুপ্তচরের আনাগোনা; বন্ধুরা মনে করল বিয়ের দিনে দলের কে কে আসে চরেরা তার সন্ধান নিতে এসেছে।

রাত্রি ভোর হ'তে জেগে দেখি, নতুন বরের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়া পুলিস বাড়ী ঘেরাও করেছে। মা-বাবা বিষণ্ণ মুখে বললেন: "স্বদেশী ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে এ-দুর্গতি।" বর পক্ষ থেকে কথা উঠল: "স্বদেশীওয়ালার বাড়ীতে বিয়ে করতে গিয়েই এ-দুর্ভোগ।" পুলিসী শাসনের বিরুদ্ধে উভয় পক্ষই তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছিল। বিয়ের লৌকিক অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ-ই রয়ে গেল। পুলিসের হেফাজতে বর, বধূ ও বরযাত্রী দল বাড়ী ফিরে গেল। পুলিস কৃষ্ণপদকে বিশেষ আইনে বাড়ীতে আটক থাকার নির্দ্দেশ দিয়ে যায়। স্বেচ্ছাচারী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কলকাতার জাতীয় পত্রিকাগুলি কঠোর মন্তব্য করেছিল।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ ঘোষিত হওয়ার পর মুক্তি পেয়ে কলকাতা আসি।

শতাব্দীর প্রথমে স্বাধীনতার অরুণালোকে জাতীয় জীবনের উচ্ছ্বাস বৈধতা ও ভীরুতার সীমা ছাড়িয়ে অগ্নিযুগের সৃষ্টি করেছিল। দাসত্ব, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সুন্দর মনোহর এক কল্পিত স্বাধীনতা তখন কাম্য। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বোমা-পিস্তলের সাহায্যে দুর্জ্জয় অভিযানই তখন মনে হ'তো অত্যাচার প্রতিকারের উপায়। "পরাধীনা শৃঙ্খলিতা ভারত জননীর দুঃখ-মোচনের উদাত্ত আহ্বান" এসেছিল সে-দিন মধ্যবিত্ত যুবকের মনের দুয়ারে; সর্ব্বত্যাগী মরণজয়ী যুবকের দল এগিয়ে এল যুগের আহ্বানে, ফাঁসী, গুলি, কারাদণ্ড, নির্ব্বাসন পুলিসের অমানুষিক নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা বরণ ক'রে নিল অম্লান বদনে।

আত্মবিস্মৃত জাতি চোখ মেলে চাইল "নূতন উষার নূতন সূর্য্যের পানে।" স্বাধীনতা-সংগ্রামের রোমান্স ও স্বাদেশিকতার আবেগ অতীতের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনার অমোঘ পরিকল্পনায় পরিপ্লুত হয়ে রুদ্ধ পঙ্কিল জাতীয় জীবনকে অগ্রগতির পথে প্রবহমান ক'রে তুলেছিল অগ্নিদিনের আলোকচ্ছটায়। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও লোকমান্য তিলকের আশীর্ব্বাদ ছিল এই অগ্নিযুগের বিদ্রোহীদের ওপর। মুষ্টিমেয় যুবকের সাহসিক ক্রিয়া-কলাপ ও আত্মদান আত্ম-বিহ্বল জাতির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

বছর দশেক কঠোর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে কঠোরতর সংগ্রাম করার পর প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় ১৯১৫ সালে তাঁরা বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হ'ন। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সত্যসত্যই ভারতব্যাপী একটা বিদ্রোহ করার আয়েজন হয়। সে-চেষ্টার ব্যর্থতা এবং ইংরেজের যুদ্ধ জয় সন্ত্রাসবাদী চিন্তাধারার মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল।

পনেরো বৎসরের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ও সংগঠনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তারা জাগিয়ে তুলেছে। এবার আরো ব্যাপক বিপ্লবী-সংগঠন আবশ্যক মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই স্বাধীনতা ও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে কল্পনা এবার সমষ্টিগত সন্ত্রাসবাদ আশ্রয় ক'রে দাঁড়াল। ভীত ইংরাজ-রাজ রাউলাট সাহেব নির্দ্দেশিত বে-আইনী আইনের নিষ্পেষণ-যন্ত্রে জাতির জাগ্রত জীবনী শক্তিকে পিষে মারার জন্য উদ্যত হ'ল। যে-অত্যাচার মানুষকে নুইয়ে দিতে চায়, সে-অত্যাচারই মানুষকে রুখে দাঁড়াবার শক্তি জোগায়। দাম্ভিক আমলাতন্ত্রের অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজী প্রতিবাদ করলেন।

প্রতিবাদের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে "জালিয়ানওয়ালাবাগ"

হত্যাকাণ্ডের” অনুষ্ঠান হয়। গান্ধী-পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে সমগ্র দেশের জনসাধারণ ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ করে। এ-আন্দোলন অবসানের পর সশস্ত্র বিদ্রোহ পন্থার প্রতি লোকের আস্থা ফিরে আসে। ভীত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী আবার দমননীতির আশ্রয় নেয়। বিপ্লবী বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার অভিসন্ধিতেই সরকার ১৯২৪ সালে অর্ডিনান্স জারী ক’রে বাছা বাছা বিপ্লবী কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার ও আটক ক’রে ফেলে। তিন-চার বৎসর বন্দী-জীবন যাপন ক’রে বাইরে আসার পরই বাংলার বিপ্লবী শক্তি আরো দুর্দ্ধর্ষ হয়ে ওঠে—তারা ১৯৩০ সালে চাটগাঁর অস্ত্রাগার দখল ক’রে সারা বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ শুরু ক’রে দিল। দেশের জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি তারা পেয়েছিল।

মুষ্টিমেয় অগ্রণী যুবকের দল যে-সংগ্রাম শুরু করেছিল, প্রবলপ্রতাপ সাম্রাজ্যবাদী শাসক পাশবিক শক্তির আঘাতে তাকে বার বার ব্যর্থ ও পর্য্যুদস্ত করতে চেষ্টা ক’রেও এর গতি রোধ করতে সমর্থ হয়নি; বরং শোষণপীড়িত নর-নারী আরো বেশী ক’রে সাড়া দিয়েছে দেশকর্ম্মীর সংগ্রামের ডাকে।

ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনগণের মধ্যে। ধীরে ধীরে শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবী শ্রেণী নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে স্বাধীন ভারতে তাদের ন্যায্য অধিকার পাওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আগুয়ান হয়। শোষণ ও দারিদ্র্যের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের আত্মরক্ষার চেতনাও প্রখর হয়ে ওঠে। রুশিয়ার গণ-বিপ্লব, উন্নততর সমাজব্যবস্থা ও সুখের জীবনযাত্রা ভারতের দরিদ্র জনগণের সংগ্রামের পথে আশা ও উদ্দীপনা জাগায়। সোভিয়েট রুশিয়ার

কমিউনিস্ট সমাজ গড়ার আদর্শ এ-দেশের শ্রমিক-কৃষকের লক্ষ্য পথের প্রেরণা যোগায়। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের ধনতান্ত্রিক সমাজ-আদর্শ এবং পার্লামেণ্টারী রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি ধনীদের ও পুরানো কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের অনুকরণীয় হলেও নবজাগ্রত ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী তা থেকে সুখী ও স্বাধীন জীবনের কোনই আশা ও উৎসাহ পায় না।

পূর্ব্বের সংগ্রাম ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ভারত প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, পাশ্চাত্য দানবের বিরুদ্ধে প্রাচ্য মানবের মুক্তি-সংগ্রাম।

এশিয়ার জনশক্তির অভ্যুত্থানের ফলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যভোগীরা প্রাচ্যের রাজা-জমিদার এবং ধনী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের শোষণের অংশীদার করার নীতি গ্রহণ ক'রে নিজেদের স্বার্থ ও প্রভুত্ব বজায় রাখার অপকৌশল অবলম্বন করেছে। দেশীয় ধনী মালিকেরা বিদেশীর পৃষ্ঠপোষিত এই স্বাধীনতাতেই সন্তুষ্ট আর সংখ্যাধিক দুঃখ-পীড়িত জনসাধারণের কাছে এ-স্বাধীনতা দাসত্বের নূতন নাগপাশ ব'লে মনে হয়। তাই সাম্রাজ্যবাদীব শোষণ-কৌশল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শোষিত জনগণের মুক্তিসংগ্রামের কৌশলেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে। সংগ্রাম আজ শুধু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়; যারা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সহায়ক, লুঠের ব্যবসায়ে অংশীদার হয়ে যারা স্বেচ্ছাচারী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ কায়েম ক'রে রাখছে, সংগ্রাম আজ তাদের সবারই বিরুদ্ধে—জমি, খনি, ব্যাঙ্ক ও শিল্প-কারখানার মালিক সাম্রাজ্যবাদের এই অনুচরদের বিরুদ্ধে। ধনতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার সংগ্রাম। গণ-শক্তির এই মুক্তি-সংগ্রামে ডক, রেল, খনি, কল-কারখানার শ্রমিক, গ্রামের চাষী এবং সাম্রাজ্যবাদী পীড়নে পীড়িত সেনাবাহিনী প্রধান উদ্যোগী।

সংস্কৃতি, সভ্যতা, ত্যাগ ও মানবতার অবদান নিয়ে অগণিত দরিদ্র বঞ্চিত মানবের দল আজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরোভাগে। জয় তাদের হবেই।

পরিশিষ্ট

সোমেন চন্দ

মহৎ কর্ম্মপ্রেরণায় আত্মদান বৃথা যায় না। বিশ্বমানবের কল্যাণে ইংলণ্ডের তরুণ বিপ্লবী সাহিত্যিক রালফ্ ফক্স-এর আত্মদান গণ-মানবের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বছর চারেক আগের কথা। ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে বসে তরুণ যুবক সোমেনের সাথে এই কথাই হচ্ছিল। আগ্রহ-ভরা গভীর প্রাণে সোমেন ভাবছিল,—স্পেনে জনগণের জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস—আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী—বৃটেনের গণ-সাহিত্যিক, বৃটেনের বিপ্লবী কমিউনিস্ট রালফ্ ফক্সের স্পেনের আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীতে যোগদান—স্পেনের জনগণের ধনসম্পদের মালিক ফাশিস্টদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম—বিদেশী কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও রাজনীতিক কর্ম্মীদের জীবন উৎসর্গ—এই সব টুক্‌রা টুক্‌রা কথাগুলি একত্রে মিলিয়ে সোমেনের মনে এক অপূর্ব্ব ভাব, বিস্ময় ও পুলকের সঞ্চার হলো। সোমেন জিজ্ঞাসুভরা প্রাণে বলে উঠ্‌লো,—সাহিত্যিকও মরণের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লো? আমি বল্‌লাম: অত্যাচার যখন চরমে উঠে, মানবতার বিকাশ যখন রুদ্ধ হ'য়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন কলম ছেড়ে তরবারী ধরতে হয়—বুকের রক্তে তখন নূতন সাহিত্য-

তৈরী হয়। ধন-শোষণ-মদমত্ত ফাশিস্ট বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার রক্ষার সংগ্রামে কবি ও সাহিত্যিকগণ তাই স্পেনের আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীতে ছুটে গিয়েছিলেন। সাহিত্য সাধনায় লাঞ্ছিত গণ-মানবের মর্ম্মকথা ফুটিয়ে তোলার যে-প্রেরণা সেই প্রেরণাই লেখককে গণ-মানবের মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি দিয়েছে। সোমেন চুপ ক'রে শুনে একটু পরে বল্‌লো: 'এঁরাই সত্যিকার সাহিত্যিক।' রাত্রিতে আমরা ফিরলাম। সোমেন তার গুটি দুই তিন লেখক বন্ধুদের নিয়ে নূতন সাহিত্যের কথা বল্‌তে বল্‌তে বাড়ী গেল।

এরা সবাই ছোট ছেলে—২০।২২ এর বেশী বয়স কারও নয়। সবে মাত্র কলেজের পড়া ছেড়েছে। কেউ গল্প লেখে, কেউ কবিতা, কেউ বা একটা আধটা প্রবন্ধ। একে অন্যকে পড়ে শুনায়। স্থানীয় মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে প্রকাশ করার সুযোগও পায়।

ঢাকা শহরে ছোটবড় অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের তথাকথিত রাজনীতিক বিপ্লব-সঙ্ঘ আছে। এরা কোন দলেই যায়নি। সোমেন একদিন বলে: দলের টানাটানি আমাকে অনেক সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে যাইনি—কেবল মারামারি রেশারেশি তাদের কাজ,—আমার ভালো লাগে না।

আন্দামান ফেরতা, টেররিস্ট বিপ্লবী দলের পুরানো কর্ম্মী ব'লে সে প্রথমটায় আমার দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রথম দিনের পরিচয়েই আমি তাকে বলি,—সাহিত্য রচনার পথেও বিপ্লবের কাজ হয়। তুমি দেশের দারিদ্র্যপীড়িত দুঃখী জনগণের আশা-উদ্যমহীন জীবনের কথা দিয়ে জীবন্ত গণ-সাহিত্য তৈরী কর—তা হলে তোমার ঈপ্সীত স্বাভাবিক কর্ম্মপথেই ভবিষ্যৎ গণ-বিপ্লবের পথ প্রস্তুতের সহায়ক হতে পারো। লেখার দিকেই তার বেশী টান এইটে বুঝেই ঐ কথা বলেছিলাম। সোমেন সব কথাই

মনোযোগ দিয়ে শোনে, কিন্তু কিছু বলে না। তবু তার আগ্রহটা বোঝা যায়।

১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি সোমেন তার দক্ষিণ মৈশণ্ডি পাড়ায় আমাদের কমিউনিস্ট পাঠ-চক্রে যোগ দেয়।

গোপনে ক্লাস হতো। সে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে শুনতো—বেশী প্রশ্ন করত না। কৃষক শ্রমিকের জীবন কথা, কোটি কোটি দরিদ্র জনগণের মর্ম্মব্যথা, তাদের সংগঠন, জাগরণ, মার্কস্-লেনিন প্রদর্শিত সংগ্রামের পথে সাম্যবাদের নবজীবন তাকে নূতন প্রেরণা দিলো। একদিন ক্লাসের পড়ার পর তার বাসায় গেলাম। নূতন কী লিখছো জিজ্ঞাসা করায় সে একটি গল্প পড়ে শুনালো। দেখ্‌লাম গল্পে আমার ক্লাসের পড়ার ছাপ পড়েছে। বেকার মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখ অশান্তি, তারই পাশে মুসলমান গাড়োয়ানদের দুর্গত বস্তী জীবন, অপরদিকে বাড়ীওয়ালা মহাজনের ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ প্রাসাদ—ধনীর নিদারুণ ঔদ্ধত্যপূর্ণ জীবনে দাম্ভিকতার ছবি ফুটেছে সোমেনের লেখায়। চাকা ঘুরছে, লেখকের বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গী আর পূর্ব্বের মতো নেই। রসবোধ নূতনতর, গল্প সৃষ্টি ও লেখনভঙ্গী আগে থেকেই সুন্দর। বেশ ভালো লাগলো সোমেনকে। শান্তস্বভাব, সরল, কিন্তু গভীর ভাবের উদ্দীপনা জেগেছে প্রাণের পরতে পরতে। সোমেন কমিউনিস্ট পার্টিতে ভিড়ে পড়লো। আগ্রহশীল বিশ্বস্ত কর্ম্মীর প্রশংসমান দৃষ্টি তার উপর। পুলিসের খাতায় এখনও নাম ওঠেনি, কাজেই 'দক্ষিণ মৈশণ্ডী প্রগতি পাঠাগার' পরিচালনের ভার পড়লো সোমেনের উপর। সোমেনের অমায়িক স্বভাবে পাড়ার ছেলেরা তার গুণ-মুগ্ধ। 'প্রগতি পাঠাগারে'র সাপ্তাহিক বৈঠকে সোমেনের গল্প ও প্রবন্ধ হতো সবচেয়ে ভালো।

তখন ঢাকায় ৬।৭টি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র ছিল। মধ্যযুগীয় ভাব-

ধারা মিশ্রিত আধুনিক বুর্জোয়া মতের গল্প, প্রবন্ধ, আর্ট ও অস্পষ্ট রাজনীতি ছিল ঐ কাগজগুলির উপজীব্য। প্রগতিশীল নূতন লেখকগণ অজ্ঞাত কুল-শীল ও অপাঙক্তেয় ছিল—তেমন লেখন-প্রতিভাও তাদের ছিল না। এই লেখকদের সংগঠন ক'রে প্রতিক্রিয়াশীল বড় বড় সাহিত্যিকদের মাঝে একটি নূতন সাহিত্য-চক্র দাঁড় করানোই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। নূতন গণ-সাহিত্য সৃষ্টির কাজে রণেশ দাশগুপ্তের উৎসাহ, রচনা-ক্ষমতা, জ্ঞান বুদ্ধি যথেষ্ট প্রখর। এই যুবক মেধাবী লেখকের জোরেই আমরা "ঢাকা প্রগতি লেখক সঙ্ঘ" গঠনের কাজে অগ্রণী হলাম। বিভিন্ন পাড়ায় অজানা লেখকদের সঙ্গে সঙ্ঘ গঠনের কথা-বার্ত্তা চল্‌লো। সোমেনের খুব উৎসাহ। মনের মতো কাজ পেয়েছে। সনাতনী সাহিত্যের গোঁড়ামি এবার ভাঙবে। সে তার পরিচিত অজানা অচেনা যুবক লেখকদের প্রগতি লেখক সঙ্ঘে টেনে আন্‌লো। বড়দের বাধা ঠেলে একত্রে দাঁড়াতে পারবে ব'লে নূতন লেখক দলের সকলেরই আগ্রহ, উৎসাহ খুব প্রবল। কমিউনিজ্‌ম্ বা শ্রমিক কৃষকের কথা আমরা কিছুই উল্লেখ করলাম না, কারণ তা সাম্রাজ্য-বাদী শাসক ও দেশীয় বুর্জোয়া উভয়েরই রুচি-বিরুদ্ধ। ভারতীয় ঐতিহ্য-প্রণোদিত চিরাচরিত রসাভিব্যক্তির স্থানে প্রগতিশীল মনোভাব, নূতন রসবোধ, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও তার নব অভিব্যক্তির প্রতি তীব্র আকর্ষণ পুরানোর বিরুদ্ধে নূতনের বিদ্রোহ সূচনা করতো। আমরা সেই বিদ্রোহী নবীন বুর্জোয়া লেখকদের নিয়ে নবযুগের সমাজতান্ত্রিক প্রগতির পথে নূতন সাহিত্য সৃষ্টির আশায় সঙ্ঘ গঠনে মনোযোগ দিলাম। এ সময়ে দরিদ্র জন-গণের প্রতি দরদ দিয়ে গল্প লেখার রেওয়াজ যুবক লেখকদের মধ্যে দেখা দেয়; প্রবীণেরা একে বিদ্রূপ করতেন, নিন্দা করতেন। আমরা নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ যুবক লেখকদের নিয়ে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' গঠন করলাম। সপ্তাহে একদিন সঙ্ঘের বৈঠক হতো। কবিতা, গল্প, সমালোচনামূলক প্রবন্ধ পাঠ করা হতো এবং সাহিত্য বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা হতো।

মিটিং-এর ব্যবস্থা করা, সকলকে খবর দেওয়া, নূতন সভ্য সংগ্রহ করার কাজে সোমেনের উৎসাহ থাকায় তারই উপর এ-সকল কাজের ভার পড়লো। সে প্রত্যেক সভায় উপস্থিত থাক্তো, প্রায়ই গল্প লিখে নিয়ে আস্তো। ক্রমে তার লেখার ধারা ভাবাবেগ সিঞ্চিত বেদনার অভিব্যক্তি থেকে রূঢ় বাস্তবের চেতনায় রূপায়িত হয়ে বিপ্লবী খাতে প্রবাহিত হল, যা কিছু জড়, অনড়, সনাতন, যা কিছু গতানুগতিক, প্রগতি বিরোধী সবেরই মূলে সে করলো কুঠারাঘাত। ফ্যাশিস্ট স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সে লিখবে এবং নিপীড়িতজনগণের বিপ্লবী সঙ্ঘ গঠন করবে এমনই তার সঙ্কল্প। পরে সে 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র সম্পাদক হয়।

সোমেন গল্প লিখ্তো। ঢাকার মাসিক ও সাপ্তাহিকে মাঝে মাঝে তা বের হতো। শ্রীহট্টের একটি মাসিকপত্রে এবং কলকাতার কোনো কোনো মাসিকপত্রেও তার গল্প প্রকাশিত হতো। অনেক গল্প খাতাতেই থাক্তো—অজানা লেখকের লেখা কেই বা নেবে ?

সোমেনের বন্ধুরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, নারী-জীবনের মাধুর্য্য এবং অজানার সুন্দর পরিকল্পনা নিয়ে কবিতা ও সাহিত্য রচনা করতো, পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ লিখ্তো। প্রগতি লেখকদের দলে ভিড়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন হলো, লেখন প্রতিভার স্ফুরণ হলো,—তারা ক্রমে ক্রমে বাস্তববাদী হয়ে উঠ্লো—আত্মগত ভাব সৃষ্টির স্থানে বস্তুগত ভাব প্রকাশের দ্যোতনা এলো তাদের মনে। সমাজমনের সত্যিকার পরিচয় রূপায়িত হয়ে উঠ্লো তাদের নূতন লেখায়—নূতন ভাবধারায়, নূতন চিন্তায় ও আলোচনায়। এক কথায় সকলেই গণ-মানবের দরদী সাহিত্যিক হয়ে পড়লো। সোমেনের চেষ্টায় ও আগ্রহে আমরা তার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলাম—ক্রমশ তারা

রাজনীতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাবে এসে পড়লো। সোমেন ঐ দলের অগ্রণী কর্ম্মীরূপে তাদের আগে আগে চলেছিল।

সোমেনকে ঢাকার একজন প্রবীণ সাহিত্যিক বলেছিলেন,'কি হে, তোমরা নাকি একটা প্রগতি লেখকদের দল বেঁধেছো ? সাহিত্যের আবার প্রগতি পশ্চাদ্‌গতি কী ? সাহিত্যের রস সৃষ্টি করতে পারলেই তা প্রকৃত সাহিত্য হয়।' সোমেন সৌজন্যের সঙ্গে উত্তর দেয়—'রসবোধও যে সকলের সমান নয়, তাইতেই যত দ্বন্দ্ব বিরোধ। সেকালের জমিদারের প্রতাপ-ঐশ্বর্য্য, শাসন-শোষণ দিয়ে পল্লী-গাথা রচিত হতো, একালে পল্লীবাসী প্রজার দারিদ্র্য, অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে স্বাধীন:প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ফুটিয়ে তুলে সাহিত্য প্রাণবন্ত ক'রে তুল্‌তে হয়। প্রবীণ চায় জমিদারের প্রতিষ্ঠা, নবীন চায় জনগণের প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা। বুদ্ধিমান কোনো লেখক হয়তো দুই বিবাদমান পক্ষের মধ্যে একটা মধ্যম পন্থার মীমাংসা দিয়ে সাহিত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন।' প্রবীণ ব্যক্তিটি উষ্ণভাবে বলে উঠ্‌লেন, 'তোমাদের সেই এক কমিউনিজ্‌মের বুলি।' 'এ শুধু আপনার মনের কথা—আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা'—এই বলে সোমেন চলে এলো।

১৯৪০-৪১ সালে ঢাকার অনেক কমিউনিস্ট জেলে গেল—অনেকে গোপনে কাজ করার জন্য ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লো। সোমেন তখন বৈপ্লবিক কাজে আরো তৎপর হয়ে উঠ্‌লো। সাহিত্য-চর্চ্চার অবসর বড় একটা রইলো না। সে ঢাকা রেলওয়ে মজুর ইউনিয়নে যোগ দিয়ে কাজ করতে লাগ্‌লো ; মজুরের বস্তিতে, কারখানার গেটে, ইঞ্জিন সেডের কাছে কয়লার ধোঁয়ার নীচে দাঁড়িয়ে শোষিত শ্রমক্লান্ত মজুরদের সঙ্গে কথা কয়—ইউনিয়নের লাল পতাকার তলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহ দেয়। রেল মজুরেরা তাদের তরুণ নেতা সোমেনকে বিশ্বাস করতো—ভালোবাসতো। ফ্যাশিস্ট বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার

উদ্দীপনা তারা পেয়েছিলেন তাদের নেতা কমরেড্ সোমেনের কাছ থেকে।

সোমেন আগে একবার ঢাকেশ্বরী মিলে কিংবা নারায়ণগঞ্জের পাটকলে গিয়ে মজুরের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু লেখক সঙ্ঘ থেকে তাকে ছাড়া যায়নি। পার্টির স্বার্থে আমরা তাকে লেখক সঙ্ঘে রাখা অপরিহার্য্য মনে করেছিলাম। লেখক সঙ্ঘের স্বার্থেও ফ্যাশিস্ট বিরোধী বিপ্লবী সাহিত্যিকের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল।

সে মাঝে মাঝে ঢাকা শহরের আশে পাশে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ একঘেয়ে জীবনের সন্ধান নিতো। মজুর-কৃষকের লাঞ্ছিত অনাদৃত জীবন থেকে সে গণ-সাহিত্য রচনা করার প্রেরণা পেয়েছিল। 'সাহিত্যিককে শ্রমিক বিপ্লবের সহায়ক হতে হবে, ফ্যাসিজ্ম্ ও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে।'—আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিস্ট সঙ্ঘের বিশ্ব-বিখ্যাত সম্পাদক ডিমিট্রভের লেখকদের প্রতি এই নির্দ্দেশ সোমেনের জীবনে প্রতিফলিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

রেলওয়ে মজুর-সঙ্ঘ গঠনের কাজে সোমেন এমন কৃতিত্বের পরিচয় দেয় যে তাকেই ইউনিয়নের সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত করা হয়।

প্রথম থেকেই সোমেনের লেখার দিকে ঝোঁক ছিল বলে প্রগতি লেখক সঙ্ঘে তার ডাক পড়ে সবার আগে। সেও তার সাহিত্য সাধনার স্বাভাবিক কর্ম্মপথে আগ্রহভরা প্রাণে যোগ দিয়ে নিজের লেখন-প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে নেয়। রাজনীতিক কর্ম্মপ্রেরণা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল,—বিপ্লবী গণ-আন্দোলনকে বাদ দিয়ে শুধু সাহিত্য-সাধনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে সে পারেনি। ফ্যাশিস্ট দানবের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষা প্রচেষ্টায় সকল শক্তি দিয়েই অগ্রসর হওয়া তার কাম্য ছিল—তার জন্যেই সে সাহিত্য ছেড়ে শ্রমিক সংগঠনে

লেগে যায়। তার লেখক বন্ধুদেরও সোমেন প্রথম টেনে আনে নূতন লেখক সঙ্ঘে। পরে তাদের কমিউনিজ্‌মের বিপ্লবী রাজনীতিতেও আকৃষ্ট করে তোলে। এই খানেই বাইশ বছরের যুবকের প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয়। লেখা দিয়ে ভাব-বিপ্লব আর কাজ দিয়ে হয় রাষ্ট্র-বিপ্লব—সোমেন তা শিখেছিল।

তার অন্তরের প্রেরণা সাহিত্যে রূপ নেওয়ার আগেই ফ্যাশিস্ট ঘাতকের ছুরি তার বক্ষ বিদীর্ণ করে দিল। প্রতিক্রিয়াশীল বর্ব্বর ফ্যাশিস্টবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল উন্নত গণতন্ত্রবাদের সংগ্রামে তরুণ বিপ্লবী সাহিত্যিক সোমেন চন্দই এদেশে প্রথম জীবন উৎসর্গ করলো। মুক্তি যুদ্ধের অগ্রণী সৈনিক তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ মৃত্যু বরণ করে হলো স্পেন, সোভিয়েট ও চীনের আত্মদানকারী গণ-সাহিত্য-স্রষ্টাদের সাথের সাথী।

ঢাকা জেলা ফ্যাশিস্ট-বিরোধী সম্মেলনে রেল-মজুরদের একটি প্রসেশন নিয়ে আসার সময় প্রকাশ্য রাজপথে ফ্যাশিস্ট রাজনীতিক গুণ্ডাদল সোমেনকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করে। তারা তাকে ভোজালী দিয়ে আঘাত করেছিল—মাথায় লোহার ডাণ্ডা মেরেছিল—চোখ উপড়ে দিয়েছিল। লাল পতাকা হাতে নিয়ে সে এসেছিল—লাল পতাকার নীচে দাঁড়িয়েই সে মরেছে। সোমেনের বুকের রক্তে লাল পতাকা উজ্জ্বল রঙীন হয়ে রইল। পৃথিবীর লাল ঝাণ্ডা উড্ডীন রাখতে গিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে যত লোক মৃত্যুর কোলে শুয়েছে সোমেন তাদের পাশেই ঘুমিয়ে পড়ল। স্পেনে আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীর নিহত রাল্‌ফ ফক্স ও অন্যান্য শহীদের আদর্শে যে-জীবন আরম্ভ, তাদের মরণ-পথেই সে-জীবনের অবসান। ভারতে তার তুলনা মেলে না।

সোমেনের সাহিত্য-প্রতিভা ছিল কিন্তু তা বিকাশের সময় হল না—গণ-সংগঠনের বিপ্লবী কর্ম্মকুশলতা ছিল কিন্তু তা প্রকাশের সময় হল না।

বিপ্লবের শত্রুর নির্ম্মম আঘাতে তরুণ বয়সেই তার জীবনান্ত হয়ে গেল। তবু এ-জীবনের রক্তরেখায় বিপ্লব এগিয়ে চলবে উদ্বুদ্ধ গণ-জীবনের পথে।

সোমেনের শান্ত অমায়িক স্বভাব সকলকে আকৃষ্ট করেছিল—কারুর সঙ্গে তার শত্রুতা ছিল না। ঘটনার কয়েক মাস পরে শান্তভাবে আলাপ করতে করতে ফ্যাসিস্ট দলের এক সরল যুবক অসতর্ক মুহূর্ত্তে আমাকে বলেছিল, সোমেন বাবুকে মারা ঠিক হয় নি, তার প্রতি আমাদের কোনো আক্রোশ ছিল না বরং তার শান্ত স্বভাবের জন্য আমরা তাকে ভালই মনে করতাম।

বিপ্লবী সোমেন, কমিউনিস্ট সোমেন, ভারতের স্বাধীনতাকামী সোমেন ফ্যাশিস্ট বিরোধী সংগ্রামে আন্তর্জ্জাতিক জন-যুদ্ধের বীর সৈনিক রূপে ২২ বছর বয়সে আত্মজীবন উৎসর্গ ক'রে গণ-মানবের উদ্বুদ্ধ চেতনাকে সংগ্রামমুখী করে রেখে গেল। তার অস্পষ্ট অর্দ্ধস্ফুট সাহিত্য ফুটে উঠবে, স্পষ্ট হয়ে উঠবে নূতন বিপ্লবী সাহিত্যে—নিপীড়িত গণ-মানবের মন-বেদনার দুর্জ্জয় হিংসার অভিব্যক্তিতে।

ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের (বর্ত্তমানে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ') উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'সোমেন-স্মৃতি সভায়' বক্তৃতা। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত।